লাইফ ইন্সিওর করিতে হইলে
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডে
পত্র লিখুন।
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

পঞ্চম বর্ষ। কার্ত্তিক, ১৩২১। ৭ম সংখ্যা।

আর্য্যাবর্ত্ত

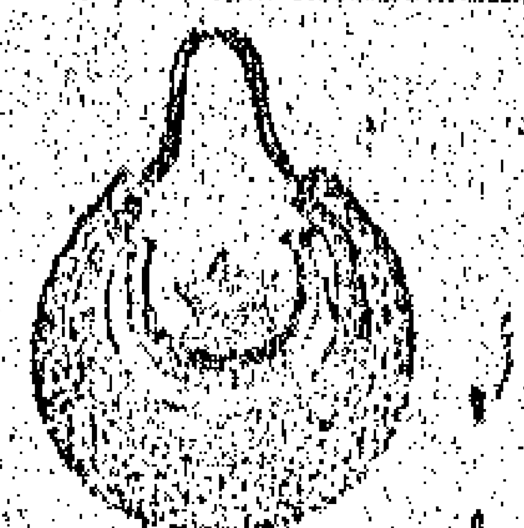
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত

সূচী।

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত।
৯০।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রতি সংখ্যা ।৵০ আনা। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

সেট এণ্ড কোং
জুয়েলার্স
বিনা পানে
গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার-
নির্ম্মাতা



আসল গিনি সোণা
পাশি মাকড়ি
প্রতি জোড়া
১০৲ দশ
টাকা।

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

EASY
PAYMENT

Telegrams
Carnobis' Calcutta

গ্রামোফোন

কিনিবার পূর্ব্বে আমাদের দোকানে
একবার শুভাগমন আকাঙ্ক্ষা করি ঃ—

ক্রমশঃ সহজ
শোধের
বন্দোবস্ত আছে।

মফঃস্বলবাসিগণের জন্য যথাসম্ভব আয়োজন। সচিত্র ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

"Mona rch" Gramophone
Rs. 112-8.

কার এণ্ড মহলানবিশ

গ্রামোফোন ওডিয়ন ও বেকা কোম্পানীর
ক্ষমতাপ্রাপ্ত এজেণ্ট

১-২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।

Telephone No. 1410.



বসুমতী প্রেস।] ঘাটে।

কোথা যাও ?

BENGAL LIBRARY 13 Nov 1913

কোথা যাও, হে গোবিন্দ, হে সুন্দর— নটবর,
তরুণ-অরুণ-আঁখি, নব শ্যাম জলধর ?
যেথা রাধা বিরহিণী
আছে বসি একাকিনী
তাহারে ভুলা'বে বুঝি, আজি, রাধা-মনোহর !
তাই কুঞ্জে চলিয়াছ, রাধা-পদ্ম-দিবাকর !

সারা রাত আঁখিধার ঝরিয়াছে রাধিকার,
প্রভাতে হয়েছে ম্লান রজনীর গাঁথা হার।
চন্দ্রাবলী-কুঞ্জে, হরি,
আনন্দে রজনী হরি'
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে এলে চিত্তচোর তা'র।
মানিনী ক'বে না কথা, তুলিবে না আঁখি তার।

আঁচলে আনন ঝাঁপি' মানিনী রহিবে বসি'—
অকাল জলদে ঢাকা পূর্ণিমার পূর্ণশশী—
আঁখিনীরে আঁখিভাসে,
কাঁপে তনু দীর্ঘ শ্বাসে,
গোরোচনা গ্রীবাপরে কবরী পড়িছে খসি',
কেমনে দেখাবে মুখ আজি কুঞ্জমাঝে পশি' ?

পূরবের মেঘ-দ্বার খুলিতেছে তমোহর ;
নীরব বিহগকণ্ঠে বাজিয়া উঠিছে স্বর ;
শ্রীরাধার কম কুঞ্জে
ফুটে ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে,
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জে, ভুঞ্জে মধু মধুকর।
এখন রাধারে মনে পড়িল কি মনোহর ?

তুমি তা'রে ছিলে ভুলি' সুদীর্ঘ বিরহরাতি,
সে ছিল তোমারি আশে জ্বালায়ে প্রণয়বাতি।
চাঁদ চাহে, শত ফুলে
শত নির্ঝরিণীমূলে
কুমুদ চাঁদেরে যাচে হৃদয়-আসন পাতি'।
পশে না হৃদয়ে তা'র তপনতাবকাভাতি।

দণ্ড অতীত রাতি—দীর্ঘ রাতি বেদনার,
তবু ত এসেছ তুমি, তুমি বঁধু রাধিকার!
পশ তবে কুঞ্জে আসি',
রাধিকার দুখ নাশি'
রাধা নামে সাধা বাঁশী ঢালুক অমিয়ধার।
মানিনীর মান শুধু বাড়ায় প্রণয় তা'র।

তোমার বাঁশরীস্বরে শান্তি সব যাতনার,
তব আঁখি-আলো টুটে হৃদয়ের অন্ধকার।
মিলনে বিরহ-জ্বালা
সকলি ভুলিবে বালা,
বিকশিবে শতদলে হৃদিপদ্ম গোপিকার,
তুমি কাম্য—তুমি সিদ্ধি নিখিলের সাধনার।

অশ্রু।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

যে সকল মহিলা স্বজনের সুখের জন্য স্বাতন্ত্র্য এমনই ভাবে বিসর্জ্জন করেন যে, শেষে আপনাদের স্বতন্ত্র সুখ ত দূরের কথা, স্বতন্ত্র ইচ্ছার সত্তাও অনুভব করিতে চাহেন না, স্বজনের সুখকেই আপনার সুখ এবং স্বজনের ইচ্ছাকেই আপনাদের ইচ্ছা বলিয়া মনে করেন, মা তাঁহাদিগের অন্যতমা। আবার পতি জ্ঞানবান্, দৃঢ়সঙ্কল্প, প্রবল স্বামীর স্নেহস্নিগ্ধ ব্যবহারে কখনও কোন অভাব অনুভব করিবার অবকাশ না পাইয়া, তাঁহার সেই স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যহীনতাই তাঁহার সকল কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিত। তাই অশোকের বিবাহসম্বন্ধেও তিনি কোন দিন একটু দৃঢ়ভাবে কথা কহেন নাই--পাছে সে অসুখী হয়। মেজ জ্যেঠাইমা'র কথায় মা'র পক্ষে নূতন চিন্তারাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তিনি যেন সম্মুখে নূতন পথ দেখিলেন। সত্যই ত তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহিরে সন্ধান করিয়াছেন! সত্যই ত অশ্রুকে নহিলে তাঁহারও চলে না—অশোকেরও চলে না! অশ্রু যে তাঁহার পক্ষে দেবতার দান—অতর্কিত ঘটনার স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার সংসারে নূতন আনন্দ—আলোক বিকশিত করিয়াছে। তাহাকে আরও নিকটে পাইবার—আরও আপনার করিবার কথা এতদিন তাঁহার মনে হয় নাই কেন? তিনি অশোককে এ কথা বলিবেন, কিন্তু কেমন করিয়া বলিবেন? তিনি তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

মা স্নানান্তে আসিয়া দেখিলেন, অশ্রু কতকগুলি নারিকেল, চিনি প্রভৃতি লইয়া অত্যন্ত উৎসাহসহকারে খাবার প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছে। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি কিছু নূতন খাবার করিবে?"

অশ্রু বলিল, "জ্যেঠাইমা যে সব নূতন খাবার করিয়া আনিয়াছিলেন, দেখি, সেগুলি করিতে পারি কি না।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "আমি দেখাইয়া দিব। আমি যে সেই দেশের মেয়ে—সেই দেশের বৌ।"

"আমি দেখি, যদি করিতে পারি, না পারি ত শিখিয়া লইব।"

নিকটে আর কেহ ছিল না। মা'র ইচ্ছা হইল, অশ্রুকে বক্ষে লইয়া তাহার প্রফুল্ল মুখচুম্বন করিয়া বলেন,"মা আমার, তুমি আমার আপনার, আমি তোমাকে আরও আপনার করিতে চাহি।" কিন্তু মা তাহা বলিতে পারিলেন না। অশোককে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি কেমন করিয়া অশ্রুকে সে কথা বলিবেন?

এই সময় ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া অশোক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, আহারের আয়োজন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজও কি আমার জন্মদিন?"

মা বলিলেন, "মেজদিদি যে সব খাবার আনিয়াছিলেন, অশ্রু সেই সব খাবার তৈয়ার করিবে। আমি দেখাইয়া দিলেও দেখিবে না, আপনি করিবে।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "এইবার বিদ্যা বুঝা যাইবে—এ ইংরাজীর হিট্‌মিট্‌ নহে—বাঙ্গালার ঘানি।"

অশ্রু একটা ইংরাজী প্রবাদে জবাব দিল, "পায়সের পরিচয় আহারে।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে মা "খোকার ঝিকে" ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, মেজ দিদি একটা কথা বলিতেছিলেন।"

মা যখনই তাহার সঙ্গে পরামর্শ করিতেন, "খোকার ঝি" তখনই গম্ভীর হইয়া উঠিত। সে গম্ভীরভাবে বলিল, "কি?"

মা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "তিনি অশ্রুর সঙ্গে অশোকের বিবাহের কথা বলিতেছিলেন, বলিতেছিলেন, তাহাতে অশোকের আপত্তি হইবে না।"

আনন্দে ও বিস্ময়ে "খোকার ঝি" গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে ভুলিয়া গেল, বলিল—"ঠিক কথা।"

"তবে আমি অশোককে এ কথা বলি?"

"বলিবে বই কি।"

মা যেন একটু সাহস পাইলেন।

"খোকার ঝি" বলিল, "তা মা, তুমি রাগ কর ত কি করিব, কিন্তু তোমার চাইতে মেজজ্যেঠাইমা'র বুদ্ধি অনেক বেশী।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তাহাতে আমি রাগ করিব কেন? তুই ত জানিস্‌ না, দেশে আমার মেজ ভাশুরের মত বুদ্ধিমান লোক অধিক ছিল না। তিনি বিষয়কার্যেও মেজ দিদির পরামর্শ লইতেন। তাই তিনি ছেলে থাকিতেও সম্পত্তি

মেজ দিদিকে উইল করিয়া দিয়াছিলেন। আর মেজ দিদি যেমনভাবে কায চালাইয়াছেন, শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

"খোকার ঝি" বলিল, "এখন সে কথা থাকুক; তুমি যাও, দাদাবাবুকে বল।"

"এখন যে অশ্রু সে ঘরে আছে।"

"তবে আমি দাদাবাবুকে ডাকিয়া আনি।"

"তোর যে আর দেরী সহ হয় না! আমি একটু পরেই যাইতেছি।"

"তোমার, মা, সবতাতেই 'গড়িমিশি'।" "খোকার ঝি" রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। মা ভাবিতে লাগিলেন।

অপরাহ্নে অশ্রু অশোকের ঘর হইতে আসিলেই মা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন; বলিলেন, "অশোক, তোর সঙ্গে একটি কাযের কথা আছে।"

অশোক বলিল, "আমার সঙ্গে কাযের কথা! কথাটা নূতন বটে।"

"তুই ঠাট্টা রাখ। তোকে বিবাহ করিতে হইবে; আমি কোন আপত্তি শুনিব না।"

"তবে ত বিচার একতরফা হইবে!"

"ও সব হেঁয়ালি আমি বুঝি না। তোকে বিবাহ করিতেই হইবে।"

"কবে; আজই? পাত্রী পাইয়াছ?"

"হাঁ।"

"তবে সব ঠিক?"

"আমি অশ্রুর সঙ্গে তোর বিবাহ দিব।"

অশোক মা'র মুখে চাহিল। তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না।

মা বুঝিতে পারিলেন,তিনি বহু চেষ্টায় যে দৃঢ়ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না। তিনি বলিলেন, 'আমি অশ্রুকে বলিতে চলিলাম।"

মা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

অশোক অত্যন্ত বিব্রতভাবে ডাকিল, "মা!"

মা ফিরিলেন।

অশোক বলিল, "মা, তুমি আমার সব কথা রাখিয়া থাক—আজ একটা কথা রাখ, তুমি অশ্রুকে কিছু বলিও না।"

মা বলিলেন, "তবে তুই বলিবি?"

অশোক মুখ নত করিল।

মা চলিয়া যাইলেন।

অতর্কিত ভূমিকম্পে সমুদ্র যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, মা'র প্রস্তাবে অশোকের

হৃদয় তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মা'র প্রস্তাব অত্যন্ত অতর্কিত। কিন্তু সে প্রস্তাব ত তেমন অপ্রত্যাশিত—তেমন অসম্ভব বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল না! অশোক আপনার হৃদয় পরীক্ষা করিতে চাহিল—কিন্তু তখনও হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্য— নানা চিন্তার—নানা ভাবের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাতে কিছুই বুঝা যায় না।

মানসিক চাঞ্চল্য থাকিলে অনেক সময় শারীরিক চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে। অশোক অস্থিরভাবে কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিল, তাহার পর একবার বেড়াইতে বাহির হইবে বলিয়া জুতা ও জামাটা বদলাইবার জন্য পরিকে ডাকিল। পরি তাহাকে জুতা পরাইতেছে এমন সময় তাহার খাবার ও চা লইয়া অশ্রু কক্ষে প্রবেশ করিল। খাবার ও চা টেবলে রাখিয়া অশ্রু বলিল, "বেড়াইতে যাইতেছ ?"

অশোক বলিল, "হাঁ।"

"তবে ত স্বভাবের কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার গুণ আছে—তোমাকেও ঘরের বাহির করিতেছে! কিন্তু এ সহরে ত স্বভাবকে স্বভাবে দেখিতে পাইবে না! স্বভাবকে দেখিয়াছিলাম, কলিকাতায় আসিবার সময় সেই মাঠের পথে—খালের ধারে—নীল আকাশের তলে।"

সে দিনের স্মৃতি অশোকের মনে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কোন কথা কহিল না, কেবল অশ্রুর মুখে চাহিল। সেই প্রফুল্ল আননের দিকে—সেই নিঃসঙ্কোচদৃষ্টি দীপ্ত নয়নের দিকে—সেই দৃঢ়তাব্যঞ্জক ওষ্ঠাধরের দিকে চাহিয়া অশোকের মনে হইল—এ রমণীরত্ন লাভ করিবার জন্য লোক বহু আয়াস স্বীকার করিতে পারে।

অশ্রু বলিল, "তুমি সেই দৃশ্যকে ভাষায় ধরিতে পারিবে ?"

অশোক বলিল, "তুমি সাহায্য করিলে চেষ্টা করিয়া দেখিব।" তাহার মনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল—ভাষায়, না জীবনে ?

অশ্রু কিন্তু বলিল, "তুমি পারিবে না। কবি কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেন—তোমার কল্পনা তোমাকে নিয়ন্ত্রিত করে।"

অশোকের মনে যে কল্পনা উদ্দাম হইয়া উঠিতেছিল অশ্রুর এই কথায় সে তাহা সংযত করিতে প্রয়াস পাইল। কিন্তু তাহার মনের চাঞ্চল্য যেন ক্রমেই অসহনীয় হইয়া উঠিতেছিল। বাত্যাতাড়িত সাগরের তরঙ্গের মত তাহা ক্রমেই যেন প্রবল হইতেছিল।

অশোক অন্যমনস্কভাবে চা'র পেয়ালা মুখে তুলিয়াছিল। অত্যুষ্ণ পানীয় তাহার অধরে স্পৃষ্ট হইবামাত্র সে শিহরিয়া উঠিল—পেয়ালা নামাইয়া রাখিল।

অশ্রু হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি দিন কয়েক কবিতাপাঠ বন্ধ রাখ। তোমাকে কবিতায় পাইয়া বসিয়াছে, তুমি বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছ।"

অশোকও হাসিল। সত্যই কি সে কবিতামোহে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছিল?

অশোক বেড়াইতে বাহির হইল, ট্রামে উঠিয়া কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিল। সন্ধ্যার পর বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত হয় নাই, সে কি করিবে, স্থির করিতে পারে নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

— —oo —

বিবাহিতা।

সে রাত্রিতে অশোক ঘুমাইতে পারিল না। সুস্থকায় সানন্দচিত্ত যুবকের পক্ষে ইহাও একটা নূতন অভিজ্ঞতা। সে কেবলই ভাবিতে লাগিল। হারাইবার কথা মনে না করিলে আমরা কাহারও স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। সে যে অশ্রুকে হারাইতে পারে, এমন কথা কোন দিন অশোকের মনে হয় নাই। আজ তাহাকে পাইবার কথায় তাহাকে হারাইবার কথা তাহার মনে পড়িল। তখন সে আপনার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখিল—দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহার অজ্ঞাতে অশ্রু ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় কতখানি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে পূর্ব্বে বুঝিতেও পারে নাই। বুদ্ধির মধ্য দিয়া যে বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কখন্ যে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। আর হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা কি রূপান্তরিত হয় নাই? স্পর্শমণি কি যাহাকেই স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্ণে পরিণত করে?

অশোক প্রভাত হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার দৈনন্দিন জীবনের আলোচনা করিল। সে জীবনে কতটুকু সময় অশ্রুকে ছাড়িয়া থাকে? তাহার কোন্ কাযে অশ্রুর সাহায্য নাই? সে তাহার সকল কার্য্যভার অশ্রুর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সে কি তাহার হৃদয়ও দিয়াছে? অশোক ঠিক বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝিল, ভূমিকম্পে যেমন ধরণীর চাঞ্চল্যে স্থানে স্থানে ভূমিতল ভেদ করিয়া উৎসমুখে ধরণীর সঞ্চিত স্নিগ্ধ সলিলধারা বাহির হইয়া ধরণীকে সরস

ও সুন্দর করে, আজ মা'র প্রস্তাবে তেমনই তাহার হৃদয়ে যে নূতন ভাবের প্রকাশ সে অনুভব করিয়াছে, তাহাতে তাহার হৃদয়ে সরসতা ও সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছে। একি প্রেম? তবে কি যে প্রেম ধরণীতলে সলিলের মত এতদিন তাহার হৃদয়তলে গুপ্ত ছিল, আজ তাহাই প্রকাশিত হইয়াছে?; সে বুঝিতে পারিল না।

তবে কি তাহার কাব্যের মানসী আজ অশ্রুর রূপে তাহাকে ধরা দিতে আসিয়াছে? অশ্রুতেই সে কাব্যের মানসী রচিত করিয়া তাহারই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে? সে কিসে মুগ্ধ হইয়াছে—কবিতার মোহে, না অশ্রুর মোহে?

এ কথা ত সে অস্বীকার করিতে পারে না যে, অশ্রুর সাহায্যে সে সাহিত্য চর্চ্চায়—বিজ্ঞানুশীলনে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছে,—তাহার জীবনে নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছে, —বুঝি সে জীবনে সার্থকতা অনুভব করিয়াছে! সে কি প্রেমের প্রকাশ? সে কেমন করিয়া বলিবে? তবে এ অনুভূতি সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই।

কিন্তু অশ্রুর কোন কথায়—কোন ব্যবহারে—কোন দিন ত সে কাব্যসাহিত্যের প্রাণ সেই প্রেমের কোন পরিচয় পায় নাই! তবে কি অশ্রুর হৃদয়ে প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই?কিন্তু তাহার এরূপ ভাবের অন্য কারণ থাকাও ত অসম্ভব নহে। কোন কোন রমণী পুরুষকে পরীক্ষা করিতে ভালবাসে—তাহারা কতখানি সহ্য পারে, দেখিতে চাহে। কিন্তু অশ্রু কি তাহাকে পরীক্ষা করিতেছে? তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টি যদি তাহার হৃদয়ের সরলতার পরিচায়ক হয়, তবে তাহার পক্ষে সেরূপ ভাবগোপন সম্ভব নহে। হয় ত সে কাব্যে—উপন্যাসে যেরূপ নারী চরিত্রের পরিচয় পাইয়াছে, অশ্রু সেরূপ নহে। সত্যই ত সে অশ্রুতে অসামঞ্জস্যের বিস্ময়কর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছে। কখন তাহাকে দেখিয়া বোধ হয়, সে কুসুমকোমলা—সৌন্দর্য্যের শরীরী কল্পনামাত্র- বাঞ্ছিতের বাহুপাশবদ্ধা হইয়া চুম্বিতা হইবার জন্যই তাহার সৃষ্টি;—আবার কখন তাহাকে দেখিয়া মনে হয়, সে দৃঢ়সঙ্কল্পা, স্বেচ্ছাচালিতা, কেহ তাহাকে আপনার ইচ্ছার বশীভূত করিতে পারিবে না। কোন রমণী আত্মসংযমে—কোন রমণী বা আত্মসমর্পণে পুরুষের প্রেম প্রদীপ্ত করে। অশ্রু আত্মস্থা। প্রথম পরিচয় হইতেই তাহার এই ভাবে—আপনার চিত্তবৃত্তির উপর তাহার প্রভুত্বে অশোক বিস্মিত হইয়াছে। প্রথম হইতেই সে অশ্রুর পুরুষোচিত দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়াছে।

সেই দৃঢ়তাই অশোকের নিকট তাহাকে তাহার পরিচিত আর সকল কিশোরী হইতে স্বাতন্ত্র্যে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। অশ্রুর ব্যবহারে অসামঞ্জস্যের অপ্রত্যাশিত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াই সে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই অশ্রুর রহস্যময়ী

নারীপ্রকৃতি অশোকের হৃদয়ে নারীজাতির সম্বন্ধে একটা নূতন ভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তবে কি সেই ভাবই প্রেমের পূর্ব্বগামী? প্রেমেই কি সে প্রশংসার পরিণতি?

অশোক যতই ভাবিতে লাগিল, তাহার ভাবনা ততই বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্থিরতাও বাড়িতে লাগিল। সে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

তখনও রাত্রি প্রভাত হইতে বিলম্ব আছে। সে আলো জ্বালিয়া দিল। একখানা পুস্তক লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। তাহার চক্ষু যখন পুস্তকের পৃষ্ঠায় অক্ষরগুলার উপর ন্যস্ত—তখন তাহার মন কেবল অস্থির চিন্তায় চঞ্চল। অশোক দুই তিন বার পাঠ্যবিষয়ে মন দিতে চেষ্টা করিল। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন সে পুস্তকখানা সশব্দে টেব্‌লের উপর ফেলিয়া আলো না নিবাইয়াই শয়ন করিল—চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার নয়নে নিদ্রা নাই। চিন্তার চাঞ্চল্য নিদ্রার পক্ষে অনুকূল নহে। সে ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল,সে যেন নূতন ও পুরাতন জীবনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান; পুরাতন পরিত্যক্ত—নূতন অপরিচিত। সে কি পুরাতন পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে? কে যেন বলিল -না। অশোক যেন চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝিল, তাহার মনেই সে "না" বাজিয়া উঠিয়াছে, ফিরিতে তাহার ইচ্ছা নাই। জীবনের যে পথ একবার পরিভ্রান্ত, পথিক সে পথে আর ফিরিয়া যায় না। নূতন পথ চিরদিনই অপরিচিত; কিন্তু আশা ও আকাঙ্ক্ষা সেই অপরিচিত পথেই মানবকে আকৃষ্ট করে। তাহাই তাহার নিয়তি। তবে কি তাহাকেও নূতন জীবনপথেই অগ্রসর হইতে হইবে?

যে দিন সে নদীকূলে সংজ্ঞাশূন্যা অশ্রুকে কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সে দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এত দিনের কথা সে মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে! দেখিয়া সে বিস্মিত হইল।

তাহার পর যখন সে আবার দেখিল, অশ্রু তাহার জীবনের কতখানি পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, তখন সে বুঝিল, সে অশ্রুকে হারাইলে কি হারাইবে। সে কি জীবনের সুখ? তখন হারাইবার কথা তাহার মনে হইল। রাখিবার আর হারাইবার মধ্যে ত আর কিছু নাই। সে যদি অশ্রুকে রাখিতে না পারে, তবে তাহাকে হারাইতে কতক্ষণ? কিন্তু সে কি তাহাকে স্বেচ্ছায় হারাইতে পারে? না—সে অশ্রুকে আপনার করিয়া রাখিবে।

আপনার সঙ্কল্পে অশোক আপনি যেন ভীত হইল। সে আবার ভাবিতে

লাগিল। কিন্তু তাহার মনের মধ্য হইতে সেই একই সঙ্কল্প দেখা দিতে লাগিল, আর, ক্রমেই সে সঙ্কল্প সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হইতে লাগিল।

অশোকের মনে এই সঙ্কল্প যতই সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হইতে লাগিল, তাহার চাঞ্চল্য ততই দূর হইতে লাগিল। আর, সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়ে আনন্দের মধ্যে যে একটা নূতন ভাব অনুভব করিতে লাগিল, তাহা সে পূর্ব্বে কখনও অনুভব করে নাই। সে ভাবিল, আজ কি তাহার পুরুষপ্রকৃতি প্রণয়ে আত্মপ্রকাশ করিতেছে? সে কেন প্রকৃতির বিকাশ-রোধের চেষ্টা করিবে? সে চেষ্টা করিয়া কে কবে সফল-প্রযত্ন হইয়াছে? মানবচরিত্র যাঁহারা নখদর্পণে দেখিতেন,সেই হিন্দু ও গ্রীক পুরাণ-কারবা প্রকৃতিকেই দেবতার আসন দান করিয়াছেন। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে কত লোক প্রবৃত্ত হইয়াছে? কিন্তু তাহারা আপনাদের শক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা পরাজিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে মানবের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

তখন সে মনে করিল, সে যে মা'কে বলিয়াছিল, তিনি যেন অশ্রুকে কোন কথা না বলেন, সে ভালই করিয়াছিল। সে আপনি অশ্রুকে সে কথা বলিবে, অশ্রুর উত্তর সে আপনি শুনিবে। নহিলে যে তাহার তৃপ্তি হইবে না। তাহার কথা শুনিয়া অশ্রুর মুখভাব কিরূপ হইবে, সে তাহা কল্পনা করিতে লাগিল। সে অশ্রুর লজ্জানত নেত্র—ব্রীড়ারাগরক্ত মুখ যেন চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে লাগিল। প্রেম কল্পনাকে প্রদীপ্ত করে।

অশোক চাহিয়া দেখিল, বাতায়নপথে দিবালোক কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে উঠিল, ব্যস্তভাবে মুখ-প্রক্ষালন করিয়া ঘরের বাহির হইল। সে আলোক নিবাইতেও ভুলিয়া গেল। সে এখনই অশ্রুকে এ কথা বলিবে। রমণী বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইলেও যতক্ষণ সম্ভব তাহাকে অধিকৃত করিতে বিরত থাকে—সময়ে সময়ে সেই জন্যই তাহাকে হারায়, পুরুষ বাঞ্ছিতকে নিকটে পাইলে তাহাকে অধিকৃত করিতে বিলম্ব সহিতে পারে না।

অশোক অশ্রুর কক্ষদ্বারে উপনীত হইয়া দেখিল, অশ্রু কক্ষে নাই। সে স্নান করিতে গিয়াছে। তখন অশোকও স্নান করিতে গেল। সে এমনই অন্যমনস্কভাবে স্নান সারিয়া আসিল যে, সে স্নানকালে মস্তকে তৈল ও গাত্রে সাবান মাখিয়াছিল কি না, সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর দিতে পারিত না।

অশোক আসিয়া দেখিল, অশ্রু তাহার জন্য চা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। পরি তথায় দাঁড়াইয়া আছে। অশোককে অপেক্ষা করিতে হইল। কিন্তু তাহার পক্ষে সামান্য বিলম্বও কষ্টকর হইয়া উঠিতেছিল।

মধ্যাহ্নে অশ্রু অশোকের ঘরে আসিলে উভয়ে একসঙ্গে সাহিত্যের বা বিজ্ঞানের আলোচনা করিত। আজ আর অশোকের অশ্রুর আগমন পর্য্যন্ত বিলম্ব সহ্য হইল না। সে অশ্রুর কক্ষে গেল।

অশ্রু তখন দাঁড়াইয়া টেবিলে কয়খানি পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেছিল। অশোক কক্ষে প্রবেশ করিলে অশ্রু মুখ তুলিয়া চাহিল।

অশোক বলিল, "অশ্রু, আমি তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়াছি।"

অশ্রু জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা? বল।"

এতক্ষণ আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, চাঞ্চল্যে যে লজ্জা তাহার হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই, সে এখন সেই লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু সে লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিতে পারিল না। সে বলিল, "অশ্রু, যাহাতে আমি কখনও তোমাকে না হারাই, আমি তোমাকে তেমনই আপনার পাইতে চাহি।"

অশোকের চক্ষুতে—মুখে আশার ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

অশ্রু অশোকের দিকে চাহিল, বলিল, "আমি—বিবাহিতা।" এই কথা ধীরে ধীরে যেন তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে উদগত হইল। যেন কেহ তাহার বক্ষে তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছে—তাহার বিদীর্ণ হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তধারা উদগত হইতেছিল।

অশোক অশ্রুর দিকে চাহিল, উত্তেজিতভাবে বলিল, "তুমি বিবাহিতা! তুমি ত কখন সে কথা বল নাই।"

অশোক দ্রুতপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিল,—যেন সে আহত ও প্রতারিত হইয়াছে।

অশ্রু প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

গান।

জীবন-কোরকে কবে পাবে প্রাণ বঁধু হে!
তব পদ-সরোরুহ-গন্ধ?
কবে অমানিশীথে নয়ন-আলোকে তব
নয়ন পাইবে দীন অন্ধ?

কবে তব পরশনে ভেঙ্গে যা'বে সুপ্তি,
হ'বে বিষয়-বাসনা-স্বপন-বিলুপ্তি?
কবে জাগ্রত হ'য়ে তব তনু-স্পন্দনে
টুটিব এ মায়া-মোহ-বন্ধ?

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সেকালের শিক্ষা।

(২)

তখন বিদ্যাসাগরের ও অক্ষয়কুমারের পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাই' তখন বাঙ্গালারচনার আদর্শ।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা-পরিষদকে লিখেন—

"Among the students of the Krishnaghur College, the exercises of the first three on the list are, in every respect, satisfactory. The papers of the two first, viz, Neelcomul Bhadooree and Omesh Chandra Dutt, are highly commendable. The general result proves that a proper degree of attention is paid to the study of the vernacular in this institution.

*　　　*　　　*　　　*

"Among the students of all the institutions, the performances of three are decidedly pre eminent; viz, Seetanath Ghose of the Hindu College and Neelcomul Bhadooree and Omesh Chandra Dutt of the Krishnaghur College. The merits of all three are nearly on an equality, and it required much consideration to decide which of these was superior to the other two. At length, we agreed to assign the superiority to Neelcomul Bhadooree of the Kishnaghur College.

নীলকমলবাবুর ও উমেশবাবুর প্রবন্ধ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তাঁহাদের রচনার বানান প্রভৃতি অবিকৃতই রাখা হইল।

উমেশ বাবুর প্রবন্ধ।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ফল বর্ণনা কর।

বিদ্যার ফল বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে ব্যক্তি যত্ন এবং পরিশ্রম পুরঃসর কৃতবিদ্য হইয়াছেন তিনিই তদীয় মাহাত্ম্য সম্যক্‌প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিদ্যা আত্মার ভূষাস্বরূপ। সকল মনুষ্যেরই বিদ্যার কিয়দংশ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এতদ্ব্যতীত কেহ মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারে না। কি পুরুষ কি স্ত্রী বিদ্যা-বিহীন হইলে তাহার জীবন বৃথা। এই ক্ষণভঙ্গুর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিগ্রহ করিয়া যে ব্যক্তি বিদ্যারস পান করিয়া চিরস্থায়িনী যশঃ প্রাপ্ত না হয়, তাহার

সংসারযাত্রা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। অপিচ বিদ্বানব্যক্তি নিরন্তর নির্ম্মল সুধাস্বাদন করেন এবং সংসারের মায়ারূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদার্থ মুক্তি লাভ করেন।

ভারতভূমীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেরই বোধ হইবে যে এ দেশস্থ লোকসমূহ নানাপ্রকার সাংসারিক এবং মানসিক যন্ত্রণার অধীন হয়। তাবৎ ক্লেশের মূল এ দেশের স্ত্রীদিগের মূর্খতা। স্ত্রীজাতির অবিদ্যা প্রযুক্ত এতন্নগরের বালকগণ বিদ্যাশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও উপযুক্তরূপ আচার ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। শৈশবাবস্থাবধি মূর্খের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া এবং মূর্খের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া শিশুর মন নানাপ্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়। অতএব যৌবন দশায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুল সদুপদেশ প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার দূরীভূত হয় না। এ প্রযুক্ত প্রৌঢ়াবস্থায় যথোচিত বিদ্যা সংগ্রহ করিলেও মাতৃক্রোড়ের দোষ হইতে সংশোধিত হইতে পারে না। শিশুগণ পঞ্চম বর্ষ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অনেক প্রকার কুৎসিত দোষ শিক্ষিত হয় এবং বালকগণ পাঠশালায় প্রবেশকালাবধি অসত্য স্রোতে মগ্ন হয়। গৃহে মাতা পাঠশালায় গুরু মহাশয় এই দুই পরম গুরুই এ দেশের বালকগণের কালস্বরূপ। মিথ্যা কথা দ্বারা যদ্যপি মাতাকে শন্তান কোন উপকার করিতে পারে তবে তাহাকে প্রবঞ্চনা জন্য দণ্ডবিধান করা দূরে থাকুক বরঞ্চ সেই সন্তান মাতার প্রিয়পাত্র হয়। গুরু মহাশয়ও যদি শিষ্যের কুব্যবহার দ্বারা কোন প্রকারে উপকৃত হয়েন, তবে তাহাকে অত্যন্ত আদর করেন। অজ্ঞ বালক গৃহে এবং পাঠশালায় মিথ্যা ও চাতুর্য্যের এবম্প্রকার আদর দেখিয়া স্বভাবতই অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞান করে এবং যাবজ্জীবন বহু যত্নেও তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু মিথ্যা কহিলে পিত্রালয়ে যদ্যপি বালক মাতা কর্ত্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং বিদ্যালয়ে কুৎসিত ব্যবহার জন্য গুরু মহাশয় শিষ্যকে প্রহার করেন। তবে এবংবিধ অপকৃষ্ট মনুষ্য সংসারে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। মাতার উচিত সন্তানকে শৈশবাবস্থা হইতে সমুচিত সদ্ব্যবহার শিক্ষা দেন এবং অসদ্ব্যবহার বিষতুল্য বোধ করান। তাহা হইলে পুত্র বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে পারে। কিন্তু এতজ্জন্য স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যা ভিন্ন তাহাদিগের নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধগম্য করা অসাধ্য।

যৎকাল পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশের স্ত্রীজাতি বিদ্যাপ্রাপ্ত না হইবে। তৎকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষে সমান ব্যবহার হইবেক না। এ দেশের নারীরা স্বীয় স্বামিকে গুরু জ্ঞান করে এবং স্বামী অতি দুশ্চরিত্র হইলেও তদীয়

শুশ্রূষা করা তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। এই ভ্রম যত দিনে স্ত্রীর মন হইতে বহিষ্কৃত না হইবে, তত দিন এ দেশীয় পুরুষ অনেক প্রকার অসাধুতার হস্ত হইতে মুক্ত হইবে না। যদ্যপি স্ত্রী-পুরুষে সমান ব্যবহার হয় তবে উভয়ে পরস্পরের উপদেষ্টা হইতে পারে। কিন্তু স্ত্রী কেবল দাসীবৎ এবং স্বামী প্রভুবৎ হইলে স্তুতরাং ভার্য্যা পরিণেতার বশংবদ হইয়া তাহার কদাচারে সম্মতা হয়। ধার্ম্মিক স্ত্রী পুরুষ দেখিলে সকলেরি মনে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। সংসারের শুভাশুভ পরিজনের ধর্ম্মাধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। যে গৃহে কলহদ্বন্দ্ব সে গৃহে কমলা ভ্রান্তিক্রমেও দৃষ্টিপাত করেন না এবং দারিদ্র্য বশতঃ অন্য অন্য নানা প্রকার অসুখ জন্মে। আর নির্ধন ব্যক্তির যদি সাংসারিক কুশল থাকে। তবে তিনি সন্তোষ প্রাপ্ত হয়েন। এমত ব্যক্তির দুঃখের সম্ভাবনা কি ? "সন্তোষ চিত্তসুখের আকর।" অতএব সন্তুষ্ট ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও আন্তরিক স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করেন। কিন্তু বিদ্যাবতী স্ত্রী ভিন্ন সাংসারিক কুশল প্রাপ্ত হয় না এবং সাংসারিক কুশল ব্যতিরেকে মনের সন্তোষ হয় না।

স্ত্রীজাতির অবিদ্যার এইরূপ অশুভ ফল চিন্তা করিলে তাহাদিগকে আশু বিদ্যা শিক্ষা দেওনের ফল সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মূর্খ স্ত্রী জগতের অসুখের প্রধান হেতু। অপিচ স্ত্রীলোকও মূর্খ হইলে সংসারের অধিকাংশ সুখে বঞ্চিত হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ চিত্তে জগদীশ্বরের আরাধনা করা যেরূপ জ্ঞানশীল জীবের কার্য্য বোধ হয় তদ্রূপ কি কতিপয় ব্রতাদি ও ব্রাহ্মণভোজন করান বোধ হয় ? বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে বিধবা নারীরা নির্দ্দয় একাদশীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। স্বামীর চরণ সেবাপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ধর্ম্ম জ্ঞান হইবে এবং কেশবন্ধন, বেশভূষা, আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকৃত্রিম স্ত্রীধর্ম্মসাধনে অনন্যমনা হইবে। স্ত্রীরত্ন এবম্প্রকার সদ্‌গুণে ভূষিতা হইলে স্বভাবতই তাহারা ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রিয়তমা হইবে এবং তাহাদিগের ঔরসে সাধু সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া নানা প্রকার ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইবেন।

এমত স্ত্রী, এমত স্বামী এবং এমত সন্তান হইলে সুখের পরিসীমা কি ? যে গৃহে ইঁহারা বাস করেন। সে গৃহে লক্ষ্মী নিরন্তর অবস্থিতি করেন। বাগ্‌দেবী তথায় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। এবং ত্রিলোকীনাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান্ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। এবম্প্রকার সৎপুরুষ সংসারে অবতীর্ণ হইলে বহুল উপকার হয়। দেশহিতৈষী পুরুষ জন্মে। বিদ্যা বিস্তীর্ণ হয়। সভ্যতার বৃদ্ধি হয় এবং বিদ্যা দ্বারা নানা প্রকার বাসোপযোগি দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা দেওনের যে সকল ফল উপরে বর্ণিত হইল তাহা কোন

ক্রমেই অমূলক নহে। এইক্ষণকার পশ্চিমাঞ্চলের লোকদিগের আচার-ব্যবহার দেখিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা বিদ্যাবতী স্ত্রী বিবাহ করিয়া সংসারের অধিকাংশ সুখ প্রাপ্ত হয়। সুশিক্ষিত পুত্র কন্যা, পরিবার সম্পর্কীয় কুশল প্রভৃতি পণ্ডিতা সহধর্ম্মিণী দ্বারা লব্ধ হয় এবং আমরা মূর্খ স্ত্রী দ্বারা এতাবৎ সুখে বঞ্চিত হই। আমাদিগের পূর্ব্বতন ইতিহাস পাঠ করিলেও স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার ফল প্রতীত হইবে। লীলাবতী প্রভৃতি বিদ্যাবতী নারীগণ যখন স্ত্রীমণ্ডলী শোভা করিয়াছিলেন। তখন এই ভারতভূমির সুখের সীমা ছিল না। পণ্ডিত বর বিবাহ করা তখন ভদ্রবালিকার প্রতিজ্ঞা ছিল এবং পিতা মাতাও বিদ্যার মাহাত্ম্য জানিয়া স্বীয় তনয়ার এমত প্রশংসনীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন।

এইক্ষণে পুনর্ব্বার বিদ্যাজ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কতি-পয় বৎসরান্তে এ দেশের স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা দেখিতে পাইব। বহুদিবসের পরে আমাদিগের ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার মানস করিয়াছেন এবং দুই এক নগরীমধ্যে তন্নিমিত্ত পাঠশালাও সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করা যাইতে পারে অনতিবিলম্বেই ভারতভূমি মূর্খতার দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিবেন।

কৃষ্ণনগরের কালেজের।
প্রথম শ্রেণীর ছাত্র।
শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য।

২৮ ভাদ্র, ১৭৭১ শক।

Woomes Chunder Dutt,
1st Class Kishnaghar College.

নীলকমল বাবুর প্রবন্ধ।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার ফল বর্ণনা কর।

ভারতবর্ষস্থ স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি একবার নেত্রপাত করিলে ইহা সকলেরই নিকট দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক, যে কেবল শৈশবকালাবধি মহিলা-গণের চিত্তক্ষেত্রে বিদ্যাদান দ্বারা কোন জ্ঞানের অঙ্কুর সংস্থাপন করার প্রথা এ দেশে প্রচলিত না থাকাই তাহাদের দুঃখের সোপান হইয়াছে। তনয়গণকে কৃতবিদ্য-করণাকাঙ্ক্ষায় তজ্জনকেরা যদ্রূপ তাহারদিগের যথানিয়মে প্রতিদিবস বিদ্যাগারে প্রেরণ পুরঃসর তজ্জন্য বহ্বর্থ ব্যয় ও কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম পর্য্যন্ত

স্বীকার করেন, সেইরূপ যদি স্বীয় স্বীয় পুত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ আয়াস প্রকাশ করেন তবে কি এই ভারতবর্ষীয় সীমন্তিনীগণ কখনও এতাদৃশ অজ্ঞানতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হওত মহাক্ষেপার্ণবে মগ্না থাকিয়া চিরজীবন যাপন করে? ভূমিষ্ঠা হওয়া অবধি স্ত্রী অন্তঃপুরে সদা অবস্থিতি করাতে বর্ষীয়সীদের প্রমুখাৎ শ্রুত ভূতপিশাচাদির প্রসঙ্গে মিথ্যাগল্প কিংবা লোকাচার ও দেশাচার-প্রসিদ্ধ নিরর্থক বস্তুতে মহা আশঙ্কা আর কি তাহাদিগকে ভীতা করিতে সমর্থ হয়? জ্ঞান রূপ দুর্ভেদ্য ফলকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি রিপুগণের অতি ভীষণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রচয়ের আঘাতে তাহাদের মনের সুবৃত্তিসমূহকে আহত করিতে ক্ষম হয়?

হা! কেবল বিদ্যাস্বরূপ মহাধনাভাবে অত্র দেশস্থ অবলারা যাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়; কন্যার বাল্যকাল অতীত না হইতেই তৎ পিতা পাত্র অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েন এবং বর উপযুক্ত ও বিদ্বান্ হউক বা না হউক, ধনে, মানে, কুলে, বিশিষ্টের সন্তান হইলেই তাহার হস্তে প্রাণাধিকা তনয়াকে সমর্পণ করেন; পাত্রী আপনি বিদ্যা যে কি পদার্থ তাহা জানে না, বিশেষ যাঁহার সহধর্ম্মিণী হয় তিনিও যদি তদ্রূপ মূর্খ হয়েন তবে এতাদৃশ পরিণয় দ্বারা দম্পতীর আর ভাবি সুখসম্ভোগের আশা সুতরাং থাকে না। কোন কোন মহাশয়েরা এমত কঠিন হৃদয় যে এক জন কুলীনবংশোদ্ভব অতি বৃদ্ধ পুরুষের সহিতও অনায়াসে পঞ্চবর্ষবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেন। কি আশ্চর্য্য, যে স্বামীর সহিত চিরকাল এক শরীরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে হইবেক এবং যাহার সুখে ভার্য্যের সুখ ও যাহার দুঃখে ভার্য্যের দুঃখ সেই ভর্ত্তা কে এবং উদ্বাহের প্রধান বাক্যের "যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব॥" অর্থ না জানিতেই কন্যার বিবাহ সম্পন্ন হয়। জনক আপন পুত্রীকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কিছুমাত্র প্রয়োজন বোধ করেন না, কেবল মনুষ্য সমাজে যশস্বী হওনাভিলাষে তাহার উদ্বাহ উদ্দেশে বিবিধ বিষয়ে অধিক অধিক ব্যয়করণ দ্বারা জীবনের স্বার্থকতা লাভ করিয়া আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন।

যত দিন এতাদৃশ প্রবৃত্তি পিতার মন হইতে দূরীভূত না হইবেক, অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে কন্যাদিগকে শৈশবকালাবধি বিদ্যাদান করা তাঁহার জীবনের এক প্রধান আবশ্যক কার্য্যরূপে গণ্য না হইবেক তত দিন ভারতমণ্ডলীর স্ত্রীগণের জ্ঞানলাভের আর কোন উপায়ই ফলদায়ক হইবেক না।

আমারদের দেশস্থ মহিলারা বিদ্যালঙ্কারে ভূষিতা হইলে, তদ্দ্বারা অশেষ ফলের উৎপত্তি হইতে পারে। তাহারা বিদ্যাবতী হইলে প্রথমতঃ, ভারতবর্ষস্থ প্রাচীন

মহাত্মারা যে সমুদয় উত্তমোত্তম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন তাহা অধ্যয়ন পূর্ব্বক তদন্তর্গত ভাবার্থ ও তাহার স্বাদগ্রহণকরণে সমর্থা হইয়া বিবিধ বিষয় অবগত হওত তাহাদের চিত্তভাণ্ডারকে কেবল জ্ঞানরত্নদ্বারা পরিপূর্ণ করিতে পারে এবং কবিগণের দিব্য দিব্য রচনার মাধুর্য্য ও ভাবনিকর বুদ্ধিগম্য করিয়া অশেষ প্রকার আমোদ ও সন্তোষ প্রাপ্তি পূর্ব্বক সদানন্দান্তঃকরণ থাকে; বিশেষতঃ যতকালীন পুরাবৃত্তাদি পাঠ করে, তখন নানা জাতির উপাখ্যান, ভিন্ন রাজ্যের পতন, শত শত ভূপালগণ কি প্রকারে সংগ্রামে পরাজিত হইলেন, অতি ভীষণকায় বীরপুরুষেরা কিরূপ অসাধারণ উদ্যম, লোকাতীত বীর্য্য এবং দুর্জ্জয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, উভয় দুর্দ্দান্ত নরপতি তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তজ্জনিত যাহার অদৃষ্টে যাদৃশ ফলাফল ঘটিয়াছিল, কোন্ রাজ্য অগ্রে বা কোন ভূপতির অধিকারে ছিল এবং তৎপর কোন্ ভূস্বামী তাঁহাকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাস্ত রাজ্যচ্যুত করিলেন এবং কোন্ রাজাই বা তাঁহাকে স্বীয় বাহুবলে বশীভূত করিয়াছিলেন, কোন্ দেশের কি প্রকার রাজনীতি, কোন্ প্রদেশে কীদৃক আচার-ব্যবহার ছিল, কোন্ নরেশ্বর দুষ্ট দমন ও শ্রেষ্ঠ পালন করিতেন, কাহার অধিকারে প্রজারা ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ থাকিয়া বিপুল সুখ লাভ করিয়াছিল, কোন্ মহাত্মা আপন সৎকর্ম্মের দ্বারা চিরস্থায়ী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন এবংবিধ নানা বিবরণ অবগত হইয়া তাহারদের অন্তঃকরণ প্রফুল্লতারসে আর্দ্র হয় এবং অনেক দেশের রীতি-নীতির সহিত তুলনা করিয়া স্বদেশের রাজনীতি ও নিয়ম সকল ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, জ্যোতিষ্ শাস্ত্র আলোচনা করিলে শৈশবকালাবধি তাহারদের যে কতকগুলিন কুসংস্কার আছে তাহা সমূলোৎপাটিত হইতে পারে; পৃথিবী সমভূমী, ত্রিকোণাকৃতি এবং নাগাদির পৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে ইত্যাদি যে বিশ্বাস তাহা দূরীভূত হইতে পারে। গগনমণ্ডলে প্রত্যহ পর্য্যায়ক্রমে দিবাকরের উদয়াস্ত কি প্রকারে সম্পাদন হইতেছে, রজনীযোগে নিশানাথ শশধরের সুধাভিষিক্ত কোমল কিরণই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতেছে; ধরণীমণ্ডলের আহ্নিক ও বার্ষিক আবর্ত্তন দ্বারা কি প্রকারে দিন যামিনী এবং বৎসর হইতেছে; নক্ষত্র, গ্রহ, ধূমকেতু ইহারা কোন্ স্থানে কে স্থিত আছে; সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ কি প্রকারে সংঘটন হইতেছে ইত্যাদি অনেক বিষয় জ্ঞাত হইয়া অসীম জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারে।

তদ্ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, সাহিত্য, ভূতত্ত্ববিদ্যা, বীজগণিত, লীলাবতী, ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া তাহারদের জন্মভূমি এই ভারতক্ষেত্রকে স্বীয় স্বীয় বিদ্যার নির্ম্মল জ্যোতি দ্বারা আলোকময় করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ ধর্ম্ম যে কি মহা পদার্থ তাহার কণিকামাত্রও তাহারা এক্ষণে জানে না পরন্তু যদি তাহারদের বিদ্যা থাকে তবে অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বেদ, দর্শন, উপনিষৎ, বেদান্তসার ইত্যাদি পুস্তকান্তর্গত মর্ম্মাদি অবগত হইয়া বিশ্বপিতা সেই নির্ব্বিকল্প অনির্ব্বচনীয় সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে এবং তাঁহার দৃশ্যমান বিশ্বক্ষেত্রে বিবিধ জন্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি নির্ম্মাণ, ও সকল সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরি যথাযথ সুখোপযোগী স্থানে সংস্থান এবং অন্যান্য নানাপ্রকার রচনাদি প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অপার করুণা, অনন্ত কৌশল এবং আশ্চর্য্য মহিমা প্রমাণ করিতে পারে। বস্তুতঃ যদি এদেশীয় স্ত্রীজাতি উপযুক্ত কালাবধি জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হয়, তবে এক্ষণে তাহারদেরকে যাদৃশ অবস্থায় দেখা যাইতেছে তাহা অপেক্ষা তখন সহস্র সহস্র গুণ উৎকৃষ্ট অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। তখন তাহারা আর চির ক্রীত দাসীর ন্যায় সংসারকার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবে না; স্বাধীনতার অগ্নি তখন তাহারদের অন্তঃকরণে জাজল্যমান হইয়া উঠিবে; পুরোহিতগণের কপট ব্যবহার আর তাহারদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবেক না; পিতার মনোমত কোন মূর্খ পুরুষকে আর তাহারা পতিত্বে বরণ করিবে না; আপনার আত্মীয়স্বজনসমীপে আর এক্ষণকার ন্যায় পরিচ্ছদের প্রথম ভাগ দ্বারা বদনমণ্ডল আচ্ছাদন দ্বারা লজ্জা জানাইবেক না, অতি গুরুতর ব্যক্তির সহিত তাহারা নিঃশঙ্ক হইয়া অনায়াসে কথোপকথন করিতে সাহসী হইবেক; স্বামী ও ভার্য্যের আর স্বতন্ত্র স্থানে সদা সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবেক না; আমারদের দেশে প্রাচীনকালে যদ্রূপ ব্যবহার ছিল অবিকল সেই প্রকার আচার-ব্যবহার পরিবারমধ্যে হইবেক।

হা! এমত দিবস কবে আগমন করিবে—যখন পুনর্ব্বার এই ভারতবর্ষে লীলাবতী, কর্ণটরাজমহিষী প্রভৃতি পণ্ডিতা স্ত্রীরা আসিয়া অন্যান্য নামে অবতীর্ণ হইবেন? ভারতবর্ষের সে শুভদিন আগমনের পূর্ব্বচিহ্ন এক্ষণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রত্যক্ষ হইতেছে। যদি আমারদের দেশহিতৈষী মহাত্মা ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন মহোদয়ের যত্ন প্রতি কোন ব্যাঘাত যদি না জন্মে তবে এতাদৃশ আর দুই এক জন বিদ্যানুরাগি মহাশয় বিশেষ আনুকূল্য করিলেই আমারদের মনোভীষ্টসিদ্ধি হওয়ার সম্ভব অতএব শ্রীযুক্ত বেথুন সাহেব যে এতাদৃশ দুঃসাধ্য কার্য্যের পদবীতে পদার্পণ প্রথম করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে এ স্থানে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করি।

শ্রীনীলকমল ভাদুড়ী।
ছাত্রবৃত্তি ধারক।
Nil Comal Bhadoory,
1st Class, Kishnaghar College

কৃষ্ণনগর
২৮ ভাদ্র
১৭৭১ শক

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সিনীয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উমেশচন্দ্র দ্বিতীয় স্থান অধিকৃত করেন, হিন্দু কলেজ হইতে শ্রীনাথ দাস প্রথম স্থান অধিকৃত করেন। ইহার কারণ, গণিতে ও বিজ্ঞানে উমেশচন্দ্র তাদৃশ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। আর উমেশ-চন্দ্রের চির-সুহৃদ্ অম্বিকাচরণ? তিনি পরীক্ষার পূর্ব্বেই দুরন্ত বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজের রিপোর্টে ইঁহার কথা এইরূপে লিপিবদ্ধ আছে;—

"In the month of March, the smallpox made its appearance at Kishnaghur and numbers were withdrawn from the College, while others obtained leave of absence on account of the panic with which they were seized. A Senior Scholar, Ombica Charan Ghose, died from the malignant effects of this disease, and a gloom was cast over the institution. The superior abilities and amiable disposition of this young man excited the sympathy of his fellow students, and they resolved to erect a tablet to his memory. The tablet has been received; and, while it remains as a record of the ability and kind heart of their departed friend, it will show how ready they are to honor and respect talent and virtue."

কৃষ্ণনগর কলেজে স্থাপিত অম্বিকাচরণের প্রস্তরময় স্মৃতিফলকে এই কয়টি কথা ক্ষোদিত আছে —

This tablet is erected to the memory of Ombica Charan Ghose by his fellow students of the Krishnagar College as a mark of their respect for his character and regret for his untimely death.

Died 26th March 1850, aged 20 years.

অম্বিকাচরণের রোগশয্যায় উমেশচন্দ্র যে অকপট বন্ধুপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আচার্য্য মহাশয়ের কথাতেই সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়াছে—তিনি (অম্বিকাচরণ) যে "আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর তোমায় কি বলিব! আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে বসন্তরোগে তিনি শয্যাগত হইলেন। এখানে তাঁহার আত্মীয়-পরিজন ছিলেন বটে, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শে বসিয়া থাকিতাম। আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ অনেক নিষেধ করিতেন; আমি তাহাতে কর্ণ-পাত করিতাম না। শেষে তাঁহারা আমাকে আমাদের ক্ষুদ্র কুঁড়ে-ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি উন্মত্তের মত সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটা জীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অম্বিকার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অম্বিকাচরণকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না। প্রাণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল। আমার খুব জর হইল। লোকে ভাবিল, আমারও বসন্ত হইল। আমি কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।" *

উমেশচন্দ্র যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। যে শিক্ষায় চরিত্র উন্নত হয়, যে শিক্ষায় পরার্থে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছা হয়, যে শিক্ষায় মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই শিক্ষাই ত যথার্থ শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিলাভ যেন আমাদিগের ছাত্রগণের একমাত্র লক্ষ্য না হয়; প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা যেন কখনও তাহাদিগের বন্ধুপ্রেম ক্ষুণ্ণ না করে। আর যাঁহাদিগের হস্তে আমাদের বালকগণের শিক্ষার ভার ন্যস্ত, তাঁহারা যেন সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন যে, কেবল শব্দের অর্থ শিখানই তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, বালকগণকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা প্রদান করিবার ভার তাঁহাদেরই। মহাত্মা বেথুনের যুগে—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বা ইংরাজী-শিক্ষার স্বর্ণ যুগে—শিক্ষার আরও উচ্চতর আদর্শ ছিল। তখন শিক্ষক হইতে শিক্ষাপরিষদের সভাপতি পর্য্যন্ত ছাত্রগণের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, চরিত্রবান্ ছাত্রগণের সদ্‌গুণের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন। তাঁহারা অম্বিকাচরণের ন্যায় সুচরিত্র ছাত্রের স্মৃতিরক্ষার আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতেন, উমেশচন্দ্রের ন্যায় চরিত্রবান বালকের সদ্‌গুণরাজির প্রশংসাদ্বারা ছাত্রগণকে মনুষ্যত্বলাভের জন্য প্রয়াস পাইতে প্রোৎসাহিত করিতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণনগর কলেজে পুরস্কারবিতরণসভায় শেষবার গমন করিয়া মহাত্মা বেথুন কিরূপে অম্বিকাচরণ ও উমেশচন্দ্রের গুণগরিমার প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা পাঠ করুন;

"I miss among you the intelligent countenance of one who last year was counted among the brightest ornaments your College, and whose premature death, in the blossom of his youth, has excited the regret alike of his teachers and his class-fellows. Poor Ombica Charan Ghose! I saw his eyes lighten last year, when from this chair I exhorted you to exert yourselves to maintain the honor of your College, and assuredly I reckoned that he would not have failed to do his part. He has been taken from us; it has pleased God that the promise of his early years should not ripen to bear its mature fruits; but though he is dead, his name and memory live among us. I noticed with melancholy pleasure the monumental tablet your kindly recollection of your late companion has placed on the walls of your College, and by which, while seeking to record his merits, you have also done honor to yourselves. Look on it not

* অম্বিকাচরণের কোন প্রতিকৃতি নাই।—সম্পাদক।

merely as a memorial of departed worth, but as a pledge that you will endeavour to take him for an example ; that you, who have known how to appreciate his intellectual pre-eminence and his moral excellence, will seek to emulate his industry, his docility his virtuous disposition ; when you feel tempted to act in any why of which you know that he would have been ashamed, pause and reflect, that his eulogium be not turned to your condemnation.

"And you, Omesh Chunder Dutt, whom I have so often had occasion to mark out for praise, be assured of this that not even in that moment which you probably thought the proudest in your life, when from this place I hailed you as the first scholar of your year throughout Bengal, not even then did I look on you with so kindly a feeling or so hearty a desire to serve you, as when I heard of your affectionate kindness to your dying friend and competitor ; when I learned how carefully you had tended him in his malignant disorder, undeterred by the terror of contagion, which is often found powerful enough to break through stronger natural ties than those which bound you to your departed friend. I doubt not that your own approving conscience has already amply rewarded you ; for it is in the plan of the All-wise contriver of the world that every sincere act of kindness to a fellow creature carries with it its own peculiar inimitable joy : but it is also my pleasing right to tell you that your behaviour in this matter has not been unobserved, and that by it you have raised yourself higher in the good opinion of those, whose good opinion I believe you are desirous of deserving. May such examples multiply among us ! May we have many such students as Ombica Charan Ghose ! May your conduct one toward another be so marked with brotherly love, that it shall cease to call for particular notice or special commendation. Let these be the fruits of knowledge and who shall then venture to say that a blessing is not upon the tree" ।

আর কি সে দিন আসিবে, যে দিন পুণ্যশ্লোক বেথুনের ন্যায় সহৃদয় বিশ্বপ্রেমিক এই দেশের ছাত্রগণের সম্মুখে শিক্ষার মহান্ আদর্শ উপস্থাপিত করিবেন; জ্ঞানের সহিত চরিত্রের উৎকর্ষসাধনে ছাত্রগণকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের উচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইবেন? আর কি সে দিন আসিবে, যে দিন অম্বিকাচরণ ও উমেশচন্দ্রের ন্যায় ছাত্র কেবল বিদ্যার বিমল বিভায় নহে, প্রতিভার প্রোজ্জ্বল প্রভায় নহে, চরিত্রের অপূর্ব্ব গৌরবে, পুণ্যের বিমল প্রভাবে জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করাইয়া দিবেন ?

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস।

—০০—

ষোড়শ অধ্যায়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, রুধিরলোলুপ জেকবিনগণ প্রতিদ্বন্দ্বী গিরন্দিষ্ট নেতৃগণের প্রাণসংহারের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে প্রেরণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জাতীয় সমিতিগৃহে গিরন্দিষ্টগণের সংখ্যাধিক্য-প্রযুক্ত তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পরাভূত হইয়াও জেকবিনগণ উদ্যমভঙ্গ হইলেন না। ম্যারাট হার্ব্বাট প্রভৃতি নেতৃগণ অহর্নিশ জাতীয় সমিতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরোধ ঘোষণার প্রয়োজন প্রতিপাদিত করিতে লাগিলেন। মিউনিসিপালিটী গৃহে এবং রাজনীতিক সভাসমূহে তৎপ্রসঙ্গে আন্দোলন চলিল। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ইতরসাধারণ পুনর্ব্বার নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইল। গিরন্দিষ্টগণ জেকবিন-প্রধান মিউনিসিপালিটীকেই অনর্থের মূল মনে করিয়া তৎপ্রতিবিধানে যত্নবান্ হইলেন। সভ্যপ্রবর গডে মিউনিসিপালিটীর অস্তিত্ব-বিলোপসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সমিতিগৃহে তদ্রূপ প্রস্তাবনা করিলেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে আত্মকলহে দেশ নষ্ট হইয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া জাতীয় সমিতি মিউনিসিপালিটী দমনের নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। মিউনিসিপালিটীর কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত এবং ইতরসাধারণের উচ্ছৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধানকল্পে দ্বাদশ-সংখ্যক সভ্য সংবলিত "দ্বাদশ সমিতি" নামক একটি কমিটী সংস্থাপিত হইল।

"দ্বাদশ সমিতির" সভ্যগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যে প্রবৃত্ত হইয়া অত্যল্পকালমধ্যেই জেকবিনগণের চক্রান্ত ভেদ করতঃ জাতীয় সমিতির বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিলেন। হার্ব্বাট নামক জেকবিন নেতা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সমিতি তাঁহাকে আবি নামক কারাগৃহে প্রেরণ করিলেন। মিউনিসিপালিটী তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া ইতরসাধারণকে সমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের নিমিত্ত উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্যক ব্যক্তি মিউনিসিপালিটীর পক্ষ এবং অল্পসংখ্যক লোক সমিতির পক্ষ অবলম্বন করিল।

অস্ত্রধারী ইতরসাধারণের হস্ত হইতে জাতীয় সমিতির উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত "দ্বাদশ সমিতির" সভ্যগণ উপায়-উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। সভ্যপ্রবর ভিজি সমিতিগৃহে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার অবগত হইয়াছি, তাহা চিন্তা করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। জাতীয় সমিতির ধ্বংসসাধন এবং বহুসংখ্যক সভ্যের প্রাণসংহার সেই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। আর চিন্তার সময় নাই, কিয়দ্দিবস পরেই সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, কিয়দ্দিবস অতীত হইলেই আপনাদিগকে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইবে। যদি আমি মিথ্যাকথা বলিয়া থাকি, যদি সমগ্র জগতের সমক্ষে আমি জেকবিন ষড়যন্ত্র প্রতিপাদিত করিতে না পারি, তাহা হইলে সমিতি যেন আমার প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করেন।"

এই বলিয়া তিনি সমগ্র প্যারিস নগরের অধিবাসিগণের প্রতি জাতীয় সমিতি-রক্ষণকল্পে অস্ত্রধারণের ঘোষণাপত্র-প্রচারের প্রস্তাব করিলেন।

জেকবিনগণ দেখিলেন যে, এরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইলে, তাঁহাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ হয় না। তাঁহারা সেই জন্য ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিলেন। নেতৃবর ম্যারাট বলিলেন, "এক কাল্পনিক ষড়যন্ত্র লইয়া আমরা বৃথা কালক্ষেপ করিতেছি। উপন্যাসঘটিত প্রসঙ্গ লইয়া আমরা বন্ধ্যাড়ম্বরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। সমিতির সভ্যগণ 'ত্রাসরূপ' ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবেন না, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে আমি তাঁহাদিগকে নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গিরন্দিষ্টগণের ষড়যন্ত্র ভিন্ন দেশে এখন অন্য কোন ষড়যন্ত্র নাই।"

সমিতিগৃহে গিরন্দিষ্ট সভ্যগণের সংখ্যাধিক্য প্রযুক্ত জেকবিনগণের আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়া "দ্বাদশ সমিতি"র প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই জেকবিন-নেতৃগণের প্ররোচনায় বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সমিতিগৃহ বেষ্টিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েক জন সমিতিগৃহে প্রবেশ করিয়া সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "আপনারা অবিলম্বে 'দ্বাদশ সমিতি'র শক্তি হরণ পূর্ব্বক মিউনিসিপালটীর সভ্যপ্রবর হাবার্টের কারামোচনের আদেশ প্রদান করুন। 'দ্বাদশ সমিতি' হাবার্টকে অযথা নির্য্যাতিত করিয়াছেন। আমরা স্ব স্ব জীবন দিয়া হাবার্টকে রক্ষা করিব।"

জাতীয় সমিতির সভাপতি মহামতি ইছনার্ড ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি অস্ত্রধারিগণের স্পর্দ্ধান্বিত উক্তি শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা মনোযোগ পূর্ব্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যদি অস্ত্রধারীরা সমিতির প্রতি বল-প্রয়োগের চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, সমগ্র দেশ সম্মিলিত হইয়া সমিতির

পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবে, তাহা হইলে প্যারিস নগরের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান থাকিবে না।"

সভাপতির বাক্য শুনিয়া অস্ত্রধারীরা ক্ষণকালের নিমিত্ত নিরস্ত হইল। কিন্তু কিছু ক্ষণ পরে তাহারা পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বেরূপে সভ্যগণকে ভয়-প্রদর্শন করিতে লাগিল। তথাপি সভাপতি তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহার এরূপ দৃঢ়তা দর্শনে জেকবিনগণ ক্রোধে অধীর হইলেন, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আসনচ্যুত করিবার নিমিত্ত কতিপয় জেকবিন সভ্য তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দৃষ্টে গিরন্দিষ্ট সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া সভাপতির মর্য্যদা রক্ষা করিলেন। জেকবিন নেতা ড্যান্টন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন; "দাম্ভিকতা সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে -আমরা এইক্ষণে বল-প্রয়োগ করিব। যে নরাধমগণ প্রজাপীড়ক ভূপতির জীবনরক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহাদিগের সহিত জেকবিনগণের বন্ধুত্বের প্রয়োজন নাই।"

জেকবিনগণ সমিতিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইতরসাধারণকে যথেচ্ছাচারমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। তিন দিবসের মধ্যে প্যারিস নগরের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের অধিবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া সমিতির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইল। সবে মাত্র তিন বিভাগের অস্ত্রধারীরা সমিতির পক্ষাবলম্বন করিল। জেকবিনপক্ষসমর্থনকারী অস্ত্রীরা সমিতির নিকট উপস্থিত হইয়া "আজ গিরন্দিষ্টগণের মৃত্যুর দিন" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভৈরবহুঙ্কারে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল। ক্রোধানলপ্রদীপ্ত ইতরসাধারণের এইরূপ আস্ফালন দৃষ্টে গিরন্দিষ্ট সভ্যগণের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাঁহারা বহু কষ্টে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অকস্মাৎ মন্ত্রীবর গ্যারাট সমিতিগৃহে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "আমি ষড়যন্ত্রের কোন প্রকার চিহ্ন দেখিলাম না। অস্ত্রধারীরা আমার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল। কাল্পনিক ভয়-প্রদর্শনে রাজনীতিক সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে বিরোধ উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোন ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।"

গ্যারাটের বাক্য শুনিয়া গিরন্দিষ্টগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সমিতিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন কিন্তু গ্যারাট যে জেকাবিন ইন্দ্রজালে প্রতারিত হইয়াছেন,জেকাবিনগণ যে বিস্ময়কর যাদুকর তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। গিরন্দিষ্ট নেতৃগণ সমিতিগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে সভাপতি ইছনার্ডের স্থানে হিবা ডি সচি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। ইনি জনসাধারণের ভয়প্রদর্শনে ভীত হইয়া স্বীয় পদের মর্য্যদা রক্ষা করিতে পারিলেন না; পুনঃ পুনঃ অস্ত্রধারিগণের ভয়প্রদর্শনে ভীত হইয়া বলিলেন, "তোমরা মিউনিসিপালিটীর জনৈক

সভ্যের কারামোচনের নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে। সমিতির সভ্যগণ তাঁহার কারামোচনের আদেশ প্রদান করিবেন।"

অনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গিরন্দিষ্ট সভ্যগণের অনুপস্থিতিকালে জাতীয় সমিতি হ্যাবার্টের কারামোচন এবং "দ্বাদশ সমিতি"র শক্তি-হরণকল্পে আদেশ প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ ইতরসাধারণ জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া বিকট রবে চীৎকার আরম্ভ করিল। জেকবিনগণ সভাভঙ্গ করিয়া মহানন্দে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

জেকবিনগণের প্রতারণা বুঝিতে পারিয়া গিরন্দিষ্ট সভ্যগণ পরদিবস (১৭৯৩ ২৮শে মে) জাতীয় সমিতির প্রাগুক্ত আদেশ রহিত করিবার নিমিত্ত দলবদ্ধ হইয়া সমিতিগৃহে আগমন করিলেন। জেকবিনগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সদলে আসন গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রামের আয়োজন হইল। গিরন্দিষ্ট সভ্য লঞ্জয় জেকবিনগণকে কহিলেন,"আপনাদের কার্য্যকলাপে এ যাবৎ অর্দ্ধলক্ষ ব্যক্তি কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। নৃপতিগণের শাসনাধীনে শত বৎসরে যে পরিমাণ লোক বন্দিদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, আপনারা অত্যল্প সময়ে তদধিক লোকের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছেন। তদ্দৃষ্টেও ইতর-লোক অনুধাবন করে নাই। কিন্তু জনৈক ব্যক্তিকে গুরু অপরাধে লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া আমরা তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছি, অমনই আপনারা তুমুল প্রলয় উৎপাদিত করিয়াছেন।"

লঞ্জয়ের বাক্য সমাপ্ত না হইতেই জেকবিনগণ বিকটরবে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তখন জেকবিন নেতা ড্যান্টন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিলেন, "গত কল্য আপনারা ন্যায়প্রদর্শিত পন্থানুসরণে কার্য্য করিয়াছিলেন। আমি আপনাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি,আপনারা সে নীতি পরিহার করিবেন না। আমরা এ যাবৎ প্রজার সাহায্যে প্রশান্তভাবে রাজনীতিক শত্রুগণকে পরাস্ত করিয়াছি। কিন্তু যদি আপনারা ক্রমান্বয়ে অবৈধ শক্তি-পরিচালনে প্রবৃত্ত হয়েন, যদি ক্রমাগতই লোক কারাগৃহে প্রেরিত হয়, যদি আপনারা মিউনিসিপালিটীর সভ্যপ্রবরকে কারামুক্ত না করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবেন, আমরা বিপ্লবশক্তির আশ্রয়-গ্রহণে আপনাদিগকে পরাভূত করিব!"

ড্যান্টনের ভয় প্রদর্শনে ভীত না হইয়া গিরন্দিষ্ট প্রবর লঞ্জয় জেকবিনগণের সমস্ত আপত্তি একে একে খণ্ডিত করিলেন। তখন সমিতি হ্যাবার্টের কারামোচন এবং "দ্বাদশ সমিতি"র শক্তিহরণপ্রসঙ্গে পূর্ব্বপ্রদত্ত আদেশ রহিত করিলেন। জেকবিনগণ ক্রুদ্ধ হইয়া গিরন্দিষ্ট সভ্যগণের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

সভ্য কনট বলিলেন, আপনারা ব্যক্তিগণের অধিকারপ্রসঙ্গীয় ব্যবস্থাবলীর উল্লঙ্ঘনে কার্য্য করিয়াছেন, এ কথাটি বিস্মৃত হইবেন না। আমরাও আপনাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে কার্য্য করিব। জনসাধারণের উৎপীড়কদিগের সাহায্যকল্পে সেই ব্যবস্থাবলী প্রণীত হয় নাই। আমরা এ যাবৎ প্রশান্তভাবে কার্য্য করিয়াছি,কিন্তু এইক্ষণে স্বতন্ত্র পথে চলিব।

জাতীয় সমিতি হার্বার্টের কারামোচন এবং "দ্বাদশ সমিতি"র শক্তিহরণপ্রসঙ্গে স্বীয় আদেশ রহিত করিলে জেকবিন ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রবস্‌পিয়র, ম্যারাট, ডান্টন, প্রভৃতি নেতৃগণ সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। রবস্‌পিয়র জেকবিন সভায় বলিলেন, "হার্বার্টকে কারাগৃহে প্রেরণ করিয়া সমিতি যে কেবল তৎপ্রতি নির্য্যাতন করিয়াছেন, তাহা নহে। সমিতির এই অবৈধ শক্তিপরিচালননিবন্ধন ফরাসী জাতির স্বাধীনতার প্রতি হস্তার্পিত হইয়াছে, প্রজাতন্ত্র শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। উপস্থিত ক্ষেত্রে মিউনিসিপালিটী জনসাধারণের সহিত সম্যক্‌প্রকারে মিলিত না হইলে মিউনিসিপালিটীর স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে ত্রুটি হইবে। দেশ বিপজ্জালসংবেষ্টিত। চারি বৎসর যাবৎ বৈপ্লবিক কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমি অবসন্ন হইয়াছি; উৎপীড়নের জয় দৃষ্টে নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হইয়াছি। সুতরাং কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ আমার সাধ্যাতীত। তবে আমি জেকবিন ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিব না।"

অনন্তর ৩০ শে মে মিউনিসিপ্যালিটী এবং জেকবিন সভার উত্তেজনায় পুনর্ব্বার প্যারিস নগরে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। হেনরিয়ট নামক তরুণবয়স্ক যুবক অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। পরদিবস প্রত্যূষে সমরবাদ্যের গম্ভীরনিনাদে সমগ্র প্যারিস নিনাদিত হইল। সৈন্যগণ দলে দলে সমিতিগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। তৎপশ্চাৎ বহুসংখ্যক আবেদনকারী চলিল। আবেদনকারীদিগের প্রার্থনা ত্রিবিধ; —২২ জন নির্দ্দিষ্ট সভ্যকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে প্রেরণ, "দ্বাদশ সমিতি"র শক্তিহরণ এবং খাদ্য-সামগ্রীর মূল্যনির্দ্ধারণ। আবেদনকারীরা প্যারিসের ইতর-সাধারণ, সমর্থনকারীরা জেকবিন এবং যুক্তি—কামান, বন্দুক ও তরবারি। কিন্তু সমিতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের উদ্দেশ্যপ্রসঙ্গে জেকবিনগণের মতভেদ দৃষ্ট হইল। ড্যান্টন "দ্বাদশ সমিতির" শক্তি বিলুপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হইবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু রবস্‌পিয়র জাতীয় সমিতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এ দিকে জাতীয় সমিতির অধিবেশন আরব্ধ হইল। বন্ধুগণের নিষেধবাক্য অবহেলা করিয়া গিরন্দিষ্ট সভ্যগণ সভাগৃহে আগমন করিলেন। পরক্ষণেই বজ্র-নিনাদে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। গিরন্দিষ্ট নেতৃবর ভার্ণিয়ড তচ্ছবনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ ব্যক্তির আদেশে কামানের অগ্নিবর্ষণ আরব্ধ হইয়াছে?" তুরিয়ট্ নামক জেকবিন সভ্য সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন, "অবিলম্বে 'দ্বাদশ সমিতি' অন্তর্হিত হউক।" হেনরিয়ট সমিতির বিনা আদেশে কামানের অগ্নি-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, গিরন্দিষ্ট সভ্যগণ এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। নেতৃপ্রবর ভার্ণিয়ড বলিলেন:—"যুদ্ধারম্ভ হইলে তাহার পরিণাম যাহাই হউক না কেন, প্রতিষ্ঠিত শাসনের ধ্বংস অনিবার্য্য। সেইজন্য আমি সভ্যগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন কোন ক্রমেই স্থান-ত্যাগ না করেন। সকলেই কর্ত্তব্যস্থানে উপস্থিত থাকিয়া দেহত্যাগের নিমিত্ত প্রস্তুত হউন।"

তখন জেকবিন নেতা ড্যান্টন দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন:— "আপনারা অবিলম্বে 'দ্বাদশ সমিতির' শক্তিহরণ করুন। যদি আপনাদের মস্তিষ্কে কণিকামাত্র রাজনীতিক প্রজ্ঞা থাকে তাহা হইলে এই সুযোগে ক্রমে বিপরীত দিকে পাদক্ষেপণ পূর্ব্বক জনসাধারণের প্রীতি উৎপাদিত করুন। যাঁহাদিগের সময়োচিত কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে, আমি তাঁহাদিগকেই এ কথা বলিতেছি। যাঁহারা বাতুল, তাঁহাদিগকে কোন কথা বলিতে চাহি না। তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া জনসাধারণের অভিলাষ পূর্ণ করুন। অদূরে অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি হইতেছে।"

ভার্ণিয়ড বলিলেন—"আপনি কাহাকে 'জনসাধারণ' বলিতেছেন?"

ড্যান্টন উত্তর করিলেন, "ঐ যে সংখ্যাতীত অস্ত্রধারী দেখিতেছেন, আমি তাহাদিগকেই 'জনসাধারণ' আখ্যা প্রদান করি। উহারা সর্ব্বপ্রকারে উৎপীড়নের বিরোধী, আবার প্রশান্তভাবেরও বিরোধী—কারণ, উহারা মনে করে যে, প্রশান্ত ভাব হইতেই উৎপীড়নের উৎপত্তি অনিবার্য্য। তাই বলিতেছি, বৃথা কালবিলম্ব না করিয়া জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করুন। তাহাদিগকে উচ্চ সম্প্রদায়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান করুন। তৎপরেও যদি বিপ্লবের বহ্নি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে প্যারিসের সমগ্র অধিবাসী সম্মিলিত হইয়া শান্তিভঙ্গকারিগণের দমন করিবে।"

ড্যান্টনের বক্তৃতা সমাপ্ত না হইতেই কতিপয় আবেদনকারী সমিতি-গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া বলিল—"আপনারা অনতিবিলম্বে সমিতির ২২ জন সভ্যকে বিচারালয়ে প্রেরণের এবং খাদ্য-সামগ্রীর মূল্য-নির্দ্ধারণের আদেশ প্রদান করুন।"

সমিতি-গৃহ অস্ত্রধারিপরিবৃত দেখিয়া জেকবিনগণ যৎপরোনাস্তি উৎসাহান্বিত হইলেন। বারী প্রভৃতি কতিপয় সভ্য সমিতির সংরক্ষণকল্পে "দ্বাদশ সমিতি"র শক্তি-হরণে সম্মতি প্রদান করিলেন। জেকবিন নেতা ড্যান্টন তাহাতে পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু জেকবিন দলপতি রবস্‌পিয়রের তাহাতেও আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি হইল না। তিনি বলিলেন,—"অদ্য উৎপীড়নের সহিত স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ। সুতরাং অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাব উত্থাপনে বৃথা বাক্যব্যয় করা কর্ত্তব্য নহে।"

ভার্ণিয়ড উত্তর করিলেন:—"যাহা করা কর্ত্তব্য, আপনিই প্রস্তাব করুন।"

রবস্‌পিয়র বলিলেন, "আমি যে প্রস্তাব করিব, তাহা আপনার বিরুদ্ধে। আপনি ১০ই আগষ্ট তারিখে যুদ্ধাবসানের পরে সেই রণবিজয়ী ব্যক্তিগণের সংহারসাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তৎপ্রসঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। আপনি এ যাবৎ স্বদেশের অকল্যাণকার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আমি তৎপ্রসঙ্গে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। আপনি প্রজাপীড়ক ভূপতির জীবনরক্ষার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আমি সেই জন্য আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। আপনি প্রতিষ্ঠিত শাসনের ধ্বংসসাধনকল্পে সেনাপতিপ্রবর ডুমুরিয়রের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই জন্য আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করি।"

জাতীয় সমিতি দস্যু-হস্তে পতিত হইয়া "দ্বাদশ সমিতির" শক্তি-হরণের নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু রবস্‌পিয়র তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইলেন না! তিনি রাজনীতিক বৈরিদলের নিপাতসাধনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া যথাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৭৯৩ খৃঃ ২রা জুন মিউনিসিপালিটী ভবনসান্নিধ্যে অশীতি সহস্র সৈন্য সমবেত হইল। তৎসঙ্গে বহু সংখ্যক কামান বারুদ ও গোলা সংগৃহীত হইল। সেই দিবস বেলা ১০ ঘটিকাকালে সেই বিপুল বাহিনী জাতীয় সমিতি-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

সৈন্যগণ অনতিবিলম্বে সমিতিগৃহ পরিবেষ্টিত করিল। যে ২২ জন গিরন্দিষ্ট সভ্যকে বৈপ্লবিক বিচারালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত ইতর সাধারণ সমিতিসমীপে আবেদন করিয়াছিল, তন্মধ্যে লঞ্জয় ভিন্ন প্রায় সকলেই অদ্য অনুপস্থিত। লঞ্জয় সমিতির মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত সভাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তিন দিবস যাবৎ আমরা ঘাতুকগণপরিবৃত হইয়া সমিতির কার্য্য পরিচালিত করিতেছি। বহির্দ্দেশে সংখ্যাতীত উন্মত্ত অস্ত্রধারী আমাদিগকে প্রতিক্ষণ ভয়প্রদর্শন করিতেছে, গৃহাভ্যন্তরে রাজনীতিক বৈরীরা সেই পাশবশক্তিবলে শক্তিসম্পন্ন হইয়া যদৃচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বথা মর্য্যাদা-ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ

নিম্ন হইতে নিম্নতর সোপানে পাদবিক্ষেপ করিতেছি। আমরা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া নিগৃহীত ও প্রশান্তভাবে কার্য্য করিয়া লাঞ্ছিত হইয়াছি। কিন্তু আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, বাক্‌শক্তি অন্তর্হিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কোন প্রকার মর্য্যাদাহানিকর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিব না। এ যাবৎ আপনারা কোন কার্য্যই সম্পাদন করেন নাই—কেবল সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, কেবল ইতরসাধারণের দুর্ব্বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন। এইক্ষণ বিদ্রোহিগণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাহারা পাশবশক্তির সাহায্যে ভীতি উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর আপনারা এরূপ যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিতেছেন?”

লঞ্জয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত না হইতেই জেকবিনগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ তৎপ্রতি বলপ্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহার নিকট অগ্রসর হইল। কিন্তু তিনি অচল—অটল-ভাবে দণ্ডায়মান থকিলেন। সভাপতি মহোদয় লঞ্জয়ের বাক্যে লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—“প্যারিস নগরে বৈপ্লবিক শাসনশক্তি-সমূহ আমার আদেশে অন্তর্হিত হউক। জাতীয় সমিতি ইতরসাধারণের ভয় প্রদর্শনে ভীত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন তাহা রহিত হউক। যাঁহারা ব্যবহার শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শক্তিপরিচালন করিবেন তাহারা ব্যবহারশাস্ত্রের সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন না।”

এই সময়ে কয়জন অস্ত্রধারী সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,- “প্যারিসবাসীরা অদ্য চারি দিবস সশস্ত্র দণ্ডায়মান। সমিতি এ যাবৎ তাহাদের বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই। ষড়যন্ত্রকারীরা অবিলম্বে কারাগৃহে প্রেরিত না হইলে জনসাধারণ সে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে।”

জেকবিন সভ্যগণ বলিয়া উঠিলেন,—“আপনারা জনসাধারণকে রক্ষা করুন।”

তথন বারি প্রভৃতি কতিপয় সভ্য উপস্থিত বিপদ্ হইতে ত্রাণপ্রাপ্তি-মানসে দ্বাবিংশ সভ্যকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লঞ্জয় পদত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন,—“এ যাবৎ আমি মাত্র যৎকিঞ্চিৎ সাহসের পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু বিপদের চরমসীমায় উপনীত হইয়াও আমি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইব না। আমি পদত্যাগ করিব আপনারা এ আশা পরিত্যাগ করুন।”

জেকবিনগণকে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন,—“প্রাচীন-কালে যথন নরবলিপ্রথা প্রচলিত ছিল, তথন বলি ব্যক্তি পুষ্পমাল্য শোভিত হইয়া যূপকাষ্ঠসন্নিধানে আনীত হইলে পুরোহিত তাহাকে বধ করিত। কিন্তু সংহার সাধন ব্যতীত তৎপ্রতি অন্য কোন নির্য্যাতন হইত না। আর আপনারা প্রাচীন-

কালের সেই পুরোহিতগণ অপেক্ষাও নিষ্ঠুর। যে ব্যক্তি নিয়তির হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে না, আপনারা তাহার প্রতি নির্য্যাতন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন।”

লঞ্জুয় আসন গ্রহণ করিলে গিরন্দিষ্ট সভ্যপ্রবর বার্বার বলিলেন,—“আমি স্বস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক দেহত্যাগের নিমিত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছি। আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনীয় নহে। আপনারা মিউনিসিপালিটীর যদৃচ্ছাচরণ নিবারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় মিউনিসিপালিটীর সন্নিধানে মস্তক অবনত করুন, অথবা আমাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। মিউনিসিপালিটীর পদরজলেহন অপেক্ষা দুর্ব্বৃত্তগণের অস্ত্রাঘাতে দেহত্যাগ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।”

“দ্বাদশ সমিতি”র ধ্বংসসাধনের সঙ্গে সঙ্গে জেকবিন নেতৃপ্রবর ড্যান্টন সংহারনীতি পরিহার পূর্ব্বক প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। সেই জন্য অদ্যকার জেকবিনগণের কার্য্যকলাপের সহিত তাঁহার সহানুভূতি নাই। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সভ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—“জাতীয় সমিতির প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন হইয়াছে। অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। চলুন, আমরা বহির্দেশে গিয়া সমিতির মর্য্যাদা প্রদর্শনে বিদ্রোহিগণকে পরাভূত করি।”

তখন সভাপতি ও সভ্যমণ্ডলী দ্বারদেশে গমন করিলেন। সৈন্যগণপরিবৃত সেনাপতি হেনরিয়ট্ অশ্বপৃষ্ঠে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন। সভাপতি মহোদয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জনসাধারণের প্রার্থনা কি? জাতীয় সমিতি সর্ব্বদা তাহাদের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত।”

হেনরিয়ট্ বলিলেন, “জনসাধারণ মধুর বচনে প্রতারিত হইবার নহে। তাহারা ২৪ জন সভ্যকে তাহাদিগের হস্তে সমর্পিত করিবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছে।”

কয়েকজন সভ্য বলিলেন,—“আমাদের সকলকেই তাহাদের হস্তে সমর্পিত করুন।”

তৎক্ষণাৎ সেনাপতির ইঙ্গিতে দুইটি কামানের গোলা সভ্যগণের দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন তাঁহারা তথা হইতে পুনর্ব্বার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তখন কুথন নামক জেকবিন প্রস্তাব করিলেন, —“আপনারা বোধ করি দেখিয়া থাকিবেন সমিতির প্রতি জনসাধারণ আক্রোশ নাই। সভ্যপদের অনুপযুক্ত কয়জন ব্যক্তির প্রতিই তাহাদের বিদ্বেষ। অতএব আমি প্রস্তাব করি, ভার্নিয়ড, লঞ্জুয়, সিলারি, জেনসেন্, লিহার্ডি, গডে, ব্রিছট্, বয়লো, বিরাটি, বর্গজি, গোমারি, পিটিয়ন, বার্টাও, গার্ডিয়েন, কার্বলিগান, মেলিভাণ্ট, বর্গই, বার্বার, লিডন, বিজো, লাস্থরি,র‍্যাবাট, দালি, চম্বন, গোসর্স, গ্রাঞ্জেলভি, ল্যাছেজ, ভিজি, লবে ও হেনরি লারিভি এই কয়জন সমিতির আদেশে ধৃত হউন।”

এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে জেকবিন সভ্যগণ উহার সমর্থন করিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ী সভ্যগণ মৌন রহিলেন। সুতরাং জেকবিনগণের মতই সমিতির মত বলিয়া গৃহীত হইল।

যে মহাত্মগণ স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত জীবন উৎসৃষ্ট করিয়া প্রজ্ঞা,বিবেক ও প্ররোচনাশক্তিপ্রভাবে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছিলেন, স্বদেশের উন্নতি ও ফরাসী জাতির কল্যাণ ভিন্ন অন্য কোন বাসনা যাঁহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, যাঁহাদের নাম আবহমানকাল যাবৎ ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে, যাঁহাদের আখ্যায়িকা অনন্ত কাল যাবৎ স্বদেশবৎসল ব্যক্তিগণকে অনুপ্রাণিত করিবে—তাঁহারাই অদ্য ভয়ার্ত্ত জাতীয় সমিতির বিচারে সভ্যপদের অনুপযুক্ত বিবেচিত হইলেন। তাঁহারাই আজ বন্দী হইয়া বৈপ্লবিক বিচারালয়ে প্রেরিত হইলেন। জেকবিন দুরাত্মগণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। ফরাসী দেশের অদৃষ্টগগন হইতে দ্বাবিংশসংখ্যক উজ্জ্বল নক্ষত্র চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দুঃখ।

(৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষের ইংরাজী কবিতা হইতে)

—— ০০——

দিবস রজনী কত শত
বিষাদে কেটেছে, দুঃখ ! মোর ;
তথাপি পরীক্ষা কেন এত
হৃদয় ত বহুদিন তো'র ?

বিস্মৃতি গিয়াছে ত্যজি মোরে
স্মৃতি শুধু আনে পূর্ব্বব্যথা ;
ভগ্নহৃদয়ের ধ্বংস'পরে
বহ তুমি প্রভঞ্জন যথা।

জীবনের সুখ আশা যত
বহুদিন করেছ হরণ ;
রেখে গেছ হৃদয় শুধু ত
শোকভার বহিতে বহন।

প্রচণ্ড প্রকোপ তব আনে
ঘন কৃষ্ণ মেঘ উদ্বেগের,
কিছু ত রাখনি এ হৃদয়ে—
মুক্তি কি দিবে না হৃদয়ের ?

কোপ তব সম্বর সম্বর
বিশ্রাম প্রদান ক্ষণতরে,
ফুটুক জীবনে একবার
একটি গোলাপ হৃদ্‌ভরে।

সমালোচনা।

শারীর স্বাস্থ্যবিধান। *

ইংরাজীতে সাধারণভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়-নির্দ্দেশক উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব নাই। বাঙ্গালায় সেরূপ পুস্তক বিরল। সেই জন্য পূর্ব্বে সরকার কানিংহামের স্বাস্থ্য-রক্ষাবিষয়ক পুস্তিকার বঙ্গানুবাদ মধ্য-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'সরল শরীরপালন' ও 'শরীরপালন' বাঙ্গালায় এই জাতীয় পুস্তকের অভাবমোচনে সহায় হইয়াছিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উচ্চশিক্ষিত গৃহস্থের অবশ্যপাঠ্য এইরূপ পুস্তকের অভাব তাহাতে মোচিত হয় নাই। রায় চুণীলাল বসু বাহাদুরকে সেই অভাব-মোচনে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। চারি বৎসর পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছিলাম, 'খাদ্যের' প্রচার করিয়া চুণী বাবু বাঙ্গালীর পরম উপকার করিয়াছেন আজ আমরা বলিতেছি, আলোচ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে অপরিশোধ্য ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় তত্ত্বসমূহের যথোচিত আলোচনা হইতেছে বলিয়া মনে হয় না এবং শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও (অনেককে) এই বিষয়-সংক্রান্ত নানাবিধ ভ্রান্তধারণা পোষণ করিতে দেখা যায়। আমাদের সংসারে দৈনন্দিন যাবতীয় কার্য্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। এই সকল কার্য্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যরক্ষার অনেকানেক মূলতত্ত্ববিষয়ে তাঁহাদিগের অনভিজ্ঞতাহেতু সংসারে সর্ব্বদা অনর্থ ঘটিতে দেখা যায়। এই সকল বিষয়ের জ্ঞান তাঁহাদিগের মধ্যে প্রসার লাভ করিলে সংসার হইতে রোগ, শোক, অর্থনাশ ও মনস্তাপ যে অনেকাংশে অদৃশ্য হইয়া যাইবে,সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাতে আমাদিগের অন্তঃপুরমহিলাগণের এবং সাধারণজনবর্গের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় তত্ত্ব প্রচারিত হয়,সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রচারিত হইল।"

* শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—শ্রীচুণীলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ২৫, মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।



শ্রীচুণীলাল বসু।

গ্রন্থকারের এই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইলে যে, দেশের বিশেষ উপকার হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। এই পুস্তক বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য। পুস্তকখানির বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে যে সকল ব্যবস্থা বিবৃত হইয়াছে, সে সকল সর্ব্বতো-ভাবে আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন ব্যবস্থাই ব্যয়বহুল বা কষ্টসাধ্য নহে। বিশেষ আমাদের দেশে প্রচলিত সকল আচার ব্যব-হার যে "কুসংস্কার" নহে, পরন্তু অধিকাংশ স্থলেই সুফলপ্রদ, বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক বসু মহাশয় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তৈলমর্দ্দনসম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা হিতকর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানানুমোদিত। পাশ্চাত্য-আচার-পক্ষপাতী নব্যসম্প্র-দায়ভুক্ত অনেক যুবকযুবতী এই প্রথার বিরোধী, এ জন্য এই প্রথার উপকারিতা-সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। গায়ে তৈল মাখিলে ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মের উত্তেজনা হয়। এই হেতু অধিক পরিমাণ রক্ত চর্ম্মের দিকে সঞ্চালিত হইয়া ক্লেদ-নিঃসরণ কার্য্যের সহায়তা করে।" পুনশ্চ "তৈলমর্দ্দন করিলে স্নানের সময় শরীরে কম ঠাণ্ডা লাগে, এ জন্য যাঁহারা নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তৈলমর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য। * * * কোন কোন 'সাহেব' আমাদিগকে 'তৈলাক্ত বাবু' বলিয়া রহস্য করে বলিয়া আমাদিগকে যে এই দেশোপযোগী ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বা সত্যানুমোদিত নহে।"

তৈলের মত পানের ব্যবহার-পরিহারের কারণও যুরোপীয়দিগের বিরক্তির ভয়। কিন্তু পান-ব্যবহারের উপকারিতা অনেক। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"অনে-কের মুখে স্বভাবতঃই একটা দুর্গন্ধ বিদ্যমান থাকে। অনেক সময়ে খাদ্যের সুপরি-পাক না হইলে অথবা যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইলে, মুখে দুর্গন্ধ অনু-ভূত হয়, ইংরাজীতে ইহাকে Foul breath কহে। * * * পান বা হরীতকী নিয়মিতভাবে মুখশুদ্ধিরূপে ব্যবহৃত হইলে এই নিন্দনীয় রোগের সবিশেষ উপশম হইয়া থাকে। পান বা সুগন্ধি মসলা মুখের ভিতর রাখিলে ঈষৎ উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অধিক পরিমাণে লালা নিঃসারিত হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের অধিকাংশ খাদ্যই শ্বেত-সার-ঘটিত। লালার সাহায্যে খাদ্যের শ্বেত-সার অংশ শর্করায় পরিণত হইয়া পরিপাক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং মুখশুদ্ধি করিবার পদার্থদ্বারা গৌণভাবে খাদ্য-পরিপাকের সহায়তা হইয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পরে যাঁহাদের অম্লোদ্গার নির্গত হয়, পান খাইলে তন্মধ্যস্থিত চূণের দ্বারা উহা নিবারিত হয়। অম্লাধিক্যযুক্ত অজীর্ণরোগে

পানের নিয়মিত ব্যবহারে উপকার সাধিত হইতে দেখা যায়। আমরা পানের সহিত লবঙ্গ, এলাইচ, মৌরি, যমানী, রাঁধুনী, কাবাবচিনি, দারুচিনি, জৈত্রী, কর্পূর প্রভৃতি যে সকল সুগন্ধি মসলা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদিগের সকলগুলিরই কিয়ৎপরিমাণ বায়ুনিঃসারক ও পচননিবারক গুণ আছে। ইহাদিগের ব্যবহারে ভুক্ত দ্রব্যের অসাময়িক বিকার নিবারিত হইয়া পেট-ফাঁপা, পেটের মধ্যে দুর্গন্ধময় বাষ্পের সঞ্চার, উদরাময় প্রভৃতি অজীর্ণঘটিত নানাবিধ উপদ্রব হইতে কিয়ৎপরিমাণে শান্তি লাভ করিতে পারা যায়।"

আমাদের দেশে প্রচলিত দুইটি প্রাচীন প্রথাসম্বন্ধে গ্রন্থকারের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—"আহার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মুখ ও হাত ধুইয়া ভোজন করা উচিত। * * * * মুখের মধ্যে সর্ব্বদা নানারূপ বীজাণু বিদ্যমান থাকে। ভাল করিয়া কুলকুচা করিয়া মুখ ধুইয়া খাইলে এই বীজাণুগুলি খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইতে পায় না। ভোজনের পূর্ব্বে 'গণ্ডুষ' নামক যে প্রাচীন প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহা যথারীতি আচরিত হইলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।" আর—"'জলছড়া' দিয়া মুছিয়া ভোজনের স্থান পরিষ্কার করিলে তথাকার ধূলি উড়িয়া অন্নব্যঞ্জনের সহিত মিশিবার সম্ভাবনা থাকে না। আমাদিগের প্রবীণা গৃহিণীরা এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক। পাতের নীচে 'জলছড়া' না দিলে তাঁহারা কখনই ভোজনপাত্র সে স্থানে রক্ষিত হইতে দেন না। কিন্তু আমাদিগের নবীনা গৃহিণীদিগের মধ্যে এই প্রথার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শুদ্ধ নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য নামমাত্র একটু জল ছিটাইয়া ভাতের থালা বসাইয়া দেওয়া হয়। আমি আশা করি, প্রত্যেক গৃহিণী এই সুপ্রথার যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইয়া ইহার যথোপযুক্ত ব্যবহার করিবেন।"

বাঙ্গালীকে বিলাসবর্জ্জনের পরামর্শ দিয়া গ্রন্থকার আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। "আমাদিগের বাঙ্গালী রমণীগণের পরিচ্ছদ-পরিধান-প্রথার সংস্কারের আবশ্যকতা হইয়াছে" এই মত ব্যক্ত করিয়া গ্রন্থকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন—"এ স্থলে বলা উচিত যে, অধিকাংশ বাঙ্গালীই সামান্য অবস্থার লোক। যদি আমাদিগের মহিলাকুলের মধ্যে বিলাতী রমণীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদের আড়ম্বর প্রবেশ করে, তাহা হইলে আমাদের সংসারে বিষম অনর্থ ও বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা। বুদ্ধিমতী নারীমাত্রেই এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইবেন। তাহা না হইলে দর্জ্জির দোকানের দেনা মিটাইতেই গৃহস্বামীর প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করা দূরে থাকুক, বালকবালিকা-

দিগের শিক্ষা ও তাহাদিগের জন্য পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইয়া উঠিবে। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আড়ম্বর কাহারও পক্ষে ভাল নহে, সামান্য অবস্থার লোকের পক্ষে উহা বিষম অনর্থমূলক।"

"স্নান" অধ্যায়ে লেখক বলিয়াছেন—"সকল তৈল অপেক্ষা নারিকেল-তৈল মাথায় মাখিবার উপযোগী। ইহা অনেক দিন মাখিলেও মাথায় আটা হয় না এবং মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। তবে অনেক পুরাতন প্রথার সহিত নারিকেল-তৈলের ব্যবহারও আমাদের মহিলাকুলের মধ্যে অনেকের নিকট ক্রমশঃ অনাদরণীয় হইয়া আসিতেছে এবং ইহার স্থলে বহুবিজ্ঞাপনমুখরিত নানাবিধ অতৈল কুতৈল অধুনা তাঁহাদের কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল তৈলের মধ্যে যথার্থ তৈল বলিয়া যে জিনিস, তাহা আছে কি না, তাহা অনেক সময়ে পরীক্ষাদ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। তবে বিলাতী কৌশলে বিদূরিতগন্ধ কেরোসিন-জাতীয় জ্বালানি তৈল যে অনেক সময় উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এরূপ তৈল প্রতিদিন ব্যবহৃত হইলে কোন কুফল প্রসব করিবে কি না, অথবা বিলাতের পরচুলা ব্যবসায়ীদিগের সহিত এই সকল তৈলব্যবসায়ী-দিগের ব্যবসাসূত্রে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, ইহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্য বংশীয় চিকিৎসকদিগের উপর অর্পিত রহিল। তবে কেরোসিনজাতীয় এই সকল জ্বালানি তৈলের ব্যবহারে তৈলব্যবহারের যে উদ্দেশ্য, তাহা যে সাধিত হয় না, ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে।" ইহাতে কি কাহারও চৈতন্যোদয় হইবে?

নিমন্ত্রণে আমাদিগের এই বাহুল্যপ্রিয়তা ও বিলাসবাসনা যেমন সপ্রকাশ হয়, তেমন আর কোথাও হয় না। নিমন্ত্রণে অপব্যয়ের কথায় গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না—"আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি যে, তখন নিমন্ত্রণ-ভোজন একটা বড়ই আমোদের ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজকাল লোককে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করা একটা মহা দায় বলিয়া অনেক সময়ে মনে হয়। যাঁহারা নিমন্ত্রণ করেন, তাঁহাদেরও বিপদ্, আবার যাঁহারা নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন, তাঁহারাও শরীরের ভালমন্দ লইয়া একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ইহার প্রধান কারণ ভোজের আড়ম্বরবাহুল্য। নিমন্ত্রণ একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক প্রথা। সৌহৃদ্য, আত্মীয়তা, সদাচার, সৌজন্য, আতিথেয়তা প্রভৃতি সামাজিক জীবনের সদ্‌গুণাবলী নিমন্ত্রণপ্রথাদ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে এত অধিক আড়ম্বর উপস্থিত হইয়াছে যে, ব্যয়বাহুল্যহেতু গৃহস্থলোকে ২।১০ জন আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবকেও বৎসরে একবার নিমন্ত্রণ করিতে সাহসী হন না। আজ কাল আমাদিগের ভোজে এক প্রস্থ খাদ্য

সামগ্রীর ব্যবস্থা কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না। আগে ভাতেরযজ্ঞ হইলে ভাত, মাছ, তরকারী, দধি ও মিষ্টান্নে সমাপ্ত হইত। বড় লোকের বাটীতে ফলাহারের আয়োজনে লোকে লুচি ও তরকারী তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিত। আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ভোজের এরূপ সরল ভাবের আয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না। দেশী, বিলাতী, ফরাসী, মোগলাই, চীনা, জাপানী প্রভৃতি পৃথিবীর সকল দেশের বিশেষ বিশেষ খাদ্য এক দিনের ভোজের জন্য আয়োজন করিতেই হইবে। সুতরাং যে খাইতে যায়, ভোজন তাহার পক্ষে সুখের না হইয়া নানা অসুখের কারণ হইয়া থাকে, এবং যে খাওয়ায় খরচ ও আয়োজনের আড়ম্বরে তাহারও প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হইয়া উঠে। অথচ আমাদিগের অভিমান এতই প্রবল হইয়াছে যে, আমরা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত না করাইলে নিজের হীনত্ব অনুভব করিয়া থাকি। * * * * আমরা নিশ্চয় জানি যে, অধিকাংশ দ্রব্যই পাতে পড়িয়া থাকিবে এবং পরদিন আবর্জ্জনার গাড়ী বোঝাই করিয়া বিদায় করিতে হইবে। কিন্তু তথাপি আমাদের অভিমান এতই প্রবল যে, বহুক্লেশোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া এই বৃথা আড়ম্বর প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত হই না! গৃহস্থলোক যে এই ব্যয়বাহুল্যের জন্য নিমন্ত্রণরূপ সামাজিক প্রথা পালন করিতে সমর্থ হয় না, ইহা নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। সামান্য ভোজের আয়োজনে যদি লোক সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে এই আত্মীয়তা-রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায় সমাজ হইতে লোপ প্রাপ্ত হয় না।"

এক দিকে এই বাহুল্যবিলাস—অপর দিকে জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা, এই দুই কারণে "বাঙ্গালী জাতির জীবনে আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটা দিন দিন যেন একেবারে নিবিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর 'বার মাসের তের পার্ব্বণ' নানাবিধ প্রতিকূল কারণের সমবায়ে একবারে লোপপ্রাপ্ত না হউক, লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল উৎসবের দিনে সরল প্রাণের হাসিরাশির প্রতিধ্বনি বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে আর ভাসিয়া বেড়ায় না, উৎসবপ্রাঙ্গণে আবালবৃদ্ধবনিতার আত্মহারা তন্ময়তের দৃশ্য আর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আজকাল যেন কি একটা গুরুতর চিন্তার ছায়া কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, সকলেরই হৃদয়ের উপর আধিপত্যবিস্তার করিয়াছে। আগে, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, সহরেও পাড়াপ্রতিবেশীরা একত্র হইয়া সন্ধ্যার পর খেলাধূলা, গীতবাদ্য, হাস্যকৌতুকে ৩।৪ ঘণ্টা যেরূপ সুখে অতিবাহিত করিতেন, আজকাল তাহা কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালীরা এখন যেন অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছে। কি যেন একটা অকাল-বৃদ্ধত্বের ভাব আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। * * * * ইহা শুভলক্ষণ নহে। যে জাতি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা

আমোদ করিতে পারে না, সে জাতির জীবনীশক্তি ও উন্নতির সীমা ক্রমে শেষ-হইয়া আসিতেছে, বুঝিতে হইবে।" গ্রন্থকারের সহিত আমরাও বাঙ্গালীকে বলিতেছি—"এখনও—সময় থাকিতে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। যে আমোদ-প্রমোদের কোলাহলে আমাদের জাতীয় জীবন কিছু দিন পূর্ব্বে মুখরিত হইত, আসুন, আমরা আবার তাহাকে পুনঃপ্রবুদ্ধ করিয়া মলিনত্ব পরিহার পূর্ব্বক, উহার অনাবিল স্রোতে অবগাহন পূর্ব্বক আমাদের ক্লান্ত দেহ ও অবসাদগ্রস্ত মনকে নূতন উৎসাহে ও নব আশায় অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করি।"

সহজবোধ্যরূপে স্বাস্থ্যরক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তক-প্রচারের উপযোগিতার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকেই পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—'১২বৎসর পূর্ব্বে আমি 'জল' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলাম। ওলাউঠা-রোগ দূষিত জল পান করিয়া কিরূপে শীঘ্র পরিব্যাপ্তি লাভ করে, কতকগুলি সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া সাধারণকে ঐ তথ্য বিশেষভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ইহার নিবারণের জন্য পল্লীগ্রামবাসীদিগকে জল ফুটাইয়া পান করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধ সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলাম। পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার কিছু দিন পরেই বসিরহাটের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রামে ওলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। বসিরহাটের একজন উকীল বাবু ঘটনাক্রমে সেই সময়ে ঐ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন এবং জল ফুটাইবার উপদেশটি সহজ ও উপকারী বিবেচনা করিয়া নিকটস্থ আটখানি গ্রামের প্রত্যেক বাড়ীতে স্বয়ং যাইয়া যাহাতে ঐ সময়ে সকলের বাড়ীতেই জল ফুটাইয়া পানের জন্য ব্যবহার করা হয়, তজ্জন্য সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশমত ঐ কয়খানি গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থই পানীয় জল ফুটাইয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ আটখানি গ্রাম হইতে কলেরা একেবারে অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু অন্যান্য গ্রামের মধ্যে কলেরার প্রকোপ অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।"

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া উঠিতেছে। গ্রন্থে আলোচিত আর একটি কথার উল্লেখ করিয়া আমরা সমালোচনা শেষ করিব। শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"আমাদিগের হিন্দুসমাজে বিবাহ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে এই নিয়ম যে সমাজের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলপ্রদ, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। * * বিবাহ জীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য সংস্কার বলিয়া যে আমাদিগের শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রকারগণের বহুদর্শিতা ও সমাজ তত্ত্বে প্রগাঢ় অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।" কিন্তু "আমরা সচরাচর দেখিতে

পাই যে, খাওয়াইবার সঙ্গতি নাই, শীতাতপ হইতে শরীর-রক্ষার জন্য উপযুক্ত বস্ত্রসংস্থানের উপায় নাই, রোগ হইলে উপযুক্ত চিকিৎসা করাইবার ক্ষমতা নাই, পুত্রকন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উপায় নাই অথচ ষষ্ঠী দেবীর অনুগ্রহে এরূপ অবস্থার গৃহস্থকে প্রতি বৎসর সন্তানের মুখ দেখিবার আশায় নিরাশ হইতে হয় না। এই সংযমের অভাবে আমাদিগের গৃহস্থগণই দিন দিন ধনেপ্রাণে মারা যাইতেছে। কবে আমাদিগের এই সর্ব্বনাশকারী ইন্দ্রিয়মোহ ঘুচিয়া যাইবে, কবে আমরা ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আত্মতৃপ্তিসাধন-সম্বন্ধে সংযম অভ্যাস করিতে যত্ন পাইব, কবে জীবনের সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবশ্য আচরণীয় বলিয়া আমাদিগের চিত্তে দৃঢ় ধারণা হইবে এবং আমরা তৎ-সাধনোপযোগী শক্তি অর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিব!" যে সময় লোক সন্তানের কথায় বলিত—"Happy is the man that hath his quiver full of them" সে সময়ে ও এসময়ে প্রভেদ লোককে বুঝাইয়া prudential check on the part of the people সমাজে কিরূপ উপযোগী,তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিবার সময় সমাগত।

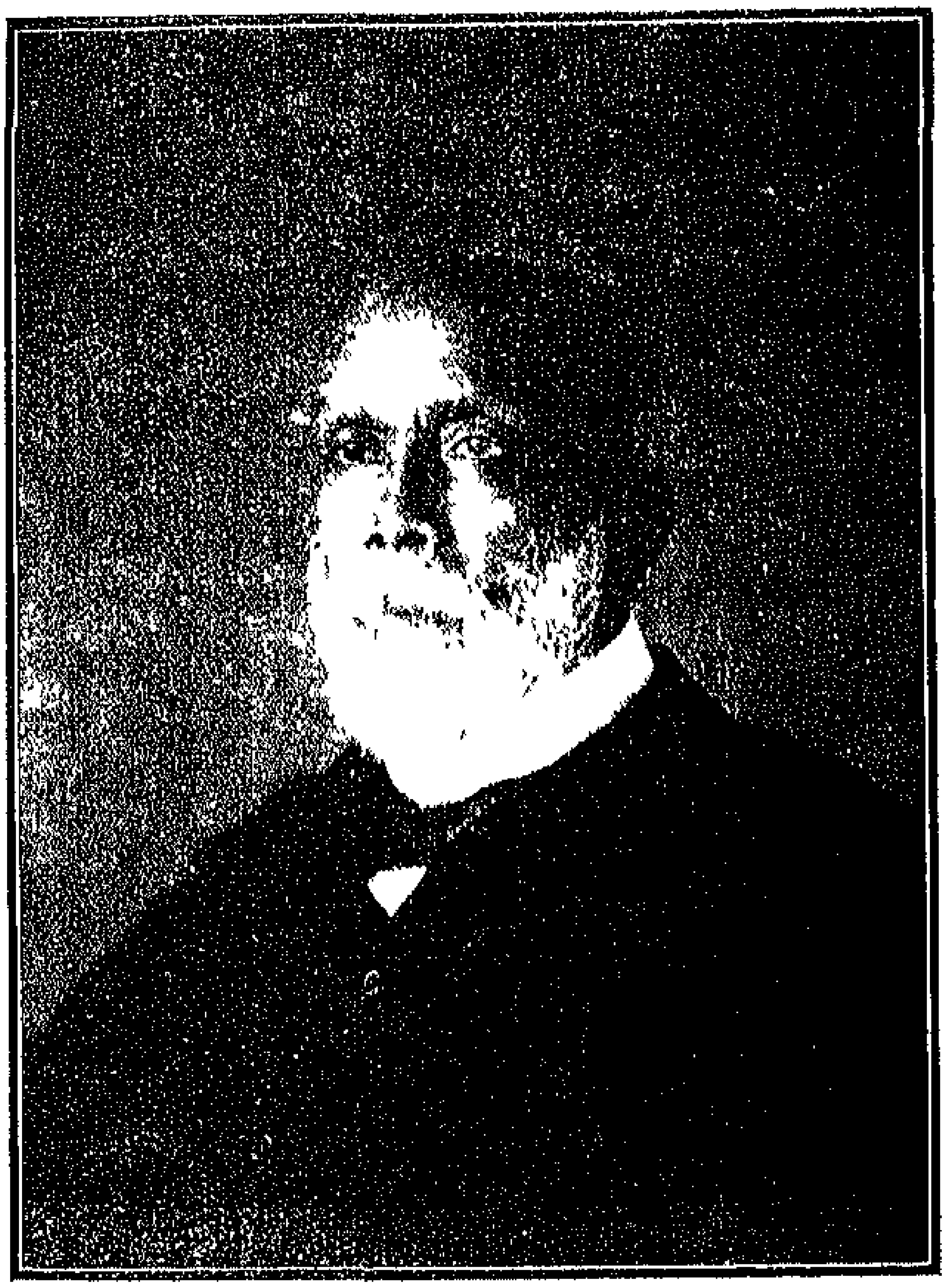
কেবল এক বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমাদের অত্যন্ত মতভেদ বিদ্যমান—সে গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে। এরূপ পুস্তকের মূল্য যথাসম্ভব অল্প নির্দ্ধারিত করিয়া তাহার বহুল প্রচারই উদ্দেশ্য করা সঙ্গত।

সার তারকনাথ পালিত।

—:০:—

গত ৩রা অক্টোবর (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ) সার্ তারকনাথ পালিত লোকান্তরিত হইয়াছেন। তারকনাথ প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ছিলেন—কিন্তু তাহাতে দেশের কিছু আইসে যায় না। তিনি সময় সময় এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনে অর্থ সাহায্য দান করিতেন—তাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি জীবনের শেষ কার্য্যে—একটিমাত্র কার্য্যে বঙ্গদেশে বরেণ্যবৃন্দের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার দীর্ঘ জীবনের সঞ্চয় প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা এ দেশে বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার দানের বিষয় প্রকাশিত হইলে আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় 'আর্য্যাবর্ত্তে' প্রকাশিত "পুরাতন প্রসঙ্গে"র লেখক মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—



সার তারকনাথ পালিত।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধবণিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি, এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু বিশেষ দায়ে পড়িলে, পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা একেবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন। বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের সন্নিধানবাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসত-বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল।"

আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছিলেন—"তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালা ভাষায় এক জন লেখক হইবেন, এরূপ প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন।"

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে (২৫শে অক্টোবর) পালিত মহাশয়ের জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল ব্যারিষ্টারী করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংস্থাপিত হইলে তাহার বিজ্ঞান-বিভাগের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রভূত অর্থ দিতে থাকেন। শেষে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে আশানুরূপ ফললাভসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তিনি আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিজ্ঞান-শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে দান করেন। তাঁহার এই দানের জন্য সরকার তাঁহাকে "নাইট" করেন।

আচার্য্য ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথার্থই বলিয়াছিলেন—"কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। * * * তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি, সমস্তই স্বোপার্জ্জিত এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফলস্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহাকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিশ্রমের ধন অম্লানবদনে অকাতরে দান করা অসামান্য, মহানুভাবতাসূচক, এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।"

প্রতিশোধ

বা

(বিস্মৃতের আত্মকাহিনী)

——oo——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আমি যে সন্ধ্যার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম ক্রমে সেই আকাঙ্ক্ষিত সন্ধ্যা আসিয়া ধীরে উপনীত হইল। সুশীতল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া মানবের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি সৌরভবিস্তার করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিল। লোহিতবর্ণে রঞ্জিত ভানু পশ্চিম-গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে; লোহিতবর্ণে রঞ্জিত তাহার প্রতিবিম্ব নেপলস্ উপসাগরের অচঞ্চল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়াছে। সে আলোক ক্রমে নির্ব্বাপিত হইল, দিবসের উজ্জ্বল কিরণ ম্লান ছায়ায় পরিণত হইল। মনে হইল, সহস্র অপ্সরার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত অঞ্চল গগনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শ্রান্ত রবি অবশেষে সাগর গর্ভে নিমগ্ন হইল; পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্র সুবর্ণ থালের মত প্রকাশিত হইল। আমি আমার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যাকুল হইলাম। আমার হৃৎপিণ্ড দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল। আমার হস্তপদ মানসিক উত্তেজনায় কম্পিত হইতে লাগিল। আমি দ্রুত গতিতে আমার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলাম। আমার কাছে পথ অস্বাভাবিক সুদীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

আমি আমার গৃহ-দ্বারে উপনীত হইলাম। প্রবেশপথের স্তম্ভোপরি সিংহ মূর্ত্তি যেন রোষকষায়িত-লোচনে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি উদ্যানস্থিত জলপ্রপাতের কলকলশব্দ শুনিতে পাইলাম। সুধাগন্ধ কুসুমরাশির-সৌরভ আমার নাসিকার তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিল। আমি আমার সুখসমুজ্জ্বল গৃহে উপনীত হইলাম। আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। বাহিরের দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকায় আমি পশ্চাদ্দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে উৎসুক হইলাম। গৃহের এই স্থানটি নানাজাতীয় বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। ইহার নীরবতা চিরদিন আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিত, আমি সচরাচর এই স্থানেই ভ্রমণ করিতাম, দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এই স্থানের সুখদ শৈত্য দূর হইত না।

আমি ব্যতীত গৃহের আর বড় কেহ এই স্থানে আগমন করিতেন না। কেবল গিডো আমার সহিত এই স্থানে ভ্রমণ করিত। এই সকল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় উপবেশন করিয়া আমি কত দিন কত গবেষণাপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়াছি, কত দিন কত কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়াছি। আজ সে সকল কথা আমার মনে হইতে লাগিল। এই নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বাগ্রে চুপে চুপে আমার ষ্টেলার ধাত্রী আশুয়ানোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার ইচ্ছা হইল। এই ধাত্রীর ক্রোড়েই আমার স্বর্গীয়া জননী তাঁহার অন্তিম শ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

আমি নিঃশব্দে সেই শৈবালসমাকৃত সুকোমল পথে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইলাম। পথিপার্শ্বস্থিত বৃক্ষগুলির পত্র তখন বায়ুহিল্লোলে মৃদু প্রকম্পিত হইতেছিল। অদূরে পাপিয়া তখন থাকিয়া থাকিয়া গীতপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছিল। ঘন পত্রের অভ্যন্তর দিয়া স্থানে স্থানে চন্দ্রালোক পতিত হওয়ায় সে স্থান তখন অপূর্ব্ব কারুকার্য্যখচিত গালিচার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সহস্র-ফল-ভারাক্রান্ত লতাগুলি চন্দ্রালোকে নানা রত্নখচিত রাজমুকুটের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রস্ফুটিত কমলা ও যূথিকা পুষ্পের সুগন্ধ মিশ্রিত হইয়া আমাকে মুগ্ধ করিতেছিল। আমি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আমার চিত্ত ততই আনন্দে অধীর হইতে লাগিল। আমি আমার পত্নী নীনার প্রেমালিঙ্গন ও বন্ধু গিডোর সাদরসম্ভাষণের জন্য ব্যাকুল হইলাম। বালিকা কন্যা ষ্টেলা এত ক্ষণ ঘুমাইয়া থাকিলেও আমি যে তাহাকে জাগরিত করিয়া স্নেহ চুম্বন করিব, সে কল্পনা আমাকে অধীর করিয়া তুলিল। আমি প্রফুল্লচিত্তে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এমন সময় কি একটি শব্দ আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এ যে আমারই পরিচিত কণ্ঠের সুমধুর হাস্যধ্বনি! আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার হস্তপদ যেন একেবারে অবশ হইয়া গেল। কে যেন আমার সর্ব্বাঙ্গে উত্তপ্ত বারিরাশি ঢালিয়া দিল। আমি দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলাম। আমার পত্নী কি প্রকারে এত সত্বর স্বামিশোক বিস্মৃত হইল ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ক্রোধে ও দুঃখে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতে লাগিল। আমি সর্পদর্শনে ভীত পথিকের ন্যায় ক্ষণকাল তথায় দণ্ডায়মান রহিলাম। অদূরে মনুষ্যের পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। আমি সত্বর একটা ঝোপের অন্তরালে লুক্কায়িত হইলাম। একটি শুভ্র পরিচ্ছদের অস্পষ্ট আভাস আমার নেত্রপথে পতিত হইল। ক্রমে উহা আমার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আমি অদৃশ্য থাকিয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগি-

লাম। আবার সেই শ্রবণবিদারী উচ্চ হাস্যধ্বনি! আমার মস্তিষ্কে উহা তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। হায় আমার প্রিয়তমা পত্নী! আমি যে কত কথাই ভাবিয়া আসিয়াছি! আমি যে মনে করিয়াছিলাম, আমার সেই পতিশোকাতুরা পত্নী না জানি আজ শোকে কতই অধীরা হইয়া পড়িয়াছে, না জানি, শয়ন-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিবা-নিশি কতই ক্রন্দন করিতেছে; দেবী মেরীর মন্দিরে সদ্যপরলোকগত পতির আত্মার কল্যাণকামনায় কতই প্রার্থনা করিতেছে! আর, এ কি হইল? সে আজ সকল শোক বিস্মৃত হইয়া কি করিয়া সুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে বিচরণ করিতেছে? কেমন করিয়া সে আনন্দের লহরী তুলিয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছে? আমরা মূর্খ, তাই এই স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসি। ভালবাসা আমাদিগকে কিরূপ অন্ধ করিয়াই রাখিয়াছে! পরমুহূর্ত্তে আমার মনে হইল, এ হাস্য হয় ত আনন্দের হাস্য না-ও হইতে পারে। হয় ত আমার প্রিয়তমা পত্নী আমারই শোকে উন্মাদিনী হইয়াছে। হয় ত অতর্কিত শোকের দারুণ আঘাতে তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। হয় ত সে এই জন্য শোক-বিহ্বলচিত্তে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই চিন্তা বস্তুতঃই আমার হৃদয় বড় ব্যথিত করিল। আমি ঝোপের অন্তরাল হইতে দুই হাতে বৃক্ষশাখা অপসারিত করিয়া সম্মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। সেই অস্পষ্ট ছায়া ক্রমে সুস্পষ্ট হইল। আমি দেখিলাম, আমার প্রিয়তমা পত্নী ও বিশ্বস্ত বন্ধু হাত ধরাধরি করিয়া ক্রমে আমারই দিকে অগ্রসর হইতেছে! আমার সহোদরাধিক বন্ধু গিডো এ দুঃসময়ে যে আমার পত্নীর শোকাপনোদনের চেষ্টা করিবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি আছে? কিন্তু এ কি শুধু তাহাই? তাহারা কি কেবল পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াই সন্তুষ্ট? হায়, আমি কি দেখিলাম! আমার চক্ষু কি আমাকে প্রতারিত করিল? মৃত্যু যে ইহার অপেক্ষা সহস্র গুণে বাঞ্ছনীয় ছিল! আমি কেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম; কেন সে কঠিন শবাধার ভগ্ন করিয়া বাহিরে আগমন করিলাম? কেন সে ভীষণ সমাধিমন্দির আমাকে চিরদিনের জন্য তাহার তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে আবদ্ধ রাখিল না? মৃত্যুর সকল বিভীষিকা যে ইহার তুলনায় তুচ্ছ বোধ হয়! সমাধিমন্দিরের সকল যন্ত্রণা যে ইহার তুলনায় সুখময় বলিয়া অনুমিত হয়! আমি কেন বাঁচিলাম? আমার হৃদয়ে যে অগ্নি আজ প্রজ্জ্বলিত হইল, তাহা যে আর কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না। ইহার স্মৃতি যে চিরদিন আমাকে তুষানলের ন্যায় দগ্ধ করিবে! আমি অতি কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া সেই ঝোপের অন্তরাল হইতে ইহাদের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে

লাগিল, আমি যেন আমারই জীবন-নাটকের শেষ অংশগুলির অভিনয় দর্শন করিতেছি। এ যেন আমারই মৃত্যুর অভিনয়। আমারই পরম বিশ্বস্ত বন্ধু ও পত্নীর হস্তে আমারই সম্মান যেন চিরদিনের মত নিহত হইতেছে। তাহারা আমার সেই আশ্রয়স্থলের অতি সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি তাহাদের প্রত্যেক কথাটি শুনিতে লাগিলাম; তাহাদের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী আমার দৃষ্টি-পথের অন্তর্বর্ত্তী হইল। আমি দেখিলাম, গিডো তাহার উভয় হস্তদ্বারা নীনার সুকোমল দেহলতিকা বেষ্টিত করিয়া ধরিল। নীনা তাহার বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া তাহার মুখের দিকে অনিমেষ-নেত্রে তাকাইয়া রহিল। নীনার পরিহিত শুভ্র বসন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে আরও শুভ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। তাহার বক্ষে একটা রক্তবর্ণ গোলাপ হীরকমণ্ডিত পিন দিয়া বদ্ধ, সে হীরকের দীপ্তি চতুর্দ্দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। হায়! নীনা কত দিন এইরূপে আমার সহিত ভ্রমণ করিয়াছে; কত দিন তাহার অঙ্গ-স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া আমি সুখী হইয়াছি! আজ সে আমার সকল সুখ বিনষ্ট করিল। আমার মনে হইতে লাগিল, তাহার বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে পারিলে বুঝি আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হয়। ঐ রক্তবর্ণ গোলাপের পরিবর্ত্তে ঐ স্থানে রক্তবর্ণ শোণিতের উৎস দেখিতে পাইলে বুঝি আমার হৃদয় কতক পরিমাণে পরিতৃপ্ত হয়। ঐ হীরকমণ্ডিত পিনের পরিবর্ত্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকাই বুঝি ঐ স্থানের শোভা পরিবর্দ্ধিত করিবে। কিন্তু এখন আমি ছুরিকা কোথায় পাইব? নীনার মুখখানি যেন আনন্দে সমুজ্জ্বল, বিষাদের ক্ষীণ রেখাও যেন তাহাতে লক্ষিত হয় না। তাহার চক্ষু হর্ষোজ্জ্বল; তাহার ওষ্ঠে মৃদু হাস্যরেখা সপ্রকাশ; তাহার কণ্ঠস্বর যেন অতীতের কোন সুখ-স্মৃতি আহ্বান করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়াছিল—আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

"হায় মূর্খ গিডো, ফ্যাবিও এত সত্বর মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে তোমার কি দশা হইত, বল দেখি?"—ধীরে ধীরে নীনা এই কথা কয়টি বলিল। আমি গিডোর উত্তর শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইলাম।

সে বলিতে লাগিল, "কেন? ফ্যাবিও ত আমাদের এই গুপ্ত-প্রণয়ের সংবাদ কিছুই অবগত ছিল না। তাহার সরল অন্তঃকরণ কখনও তোমার চাতুরীর আবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। বিশেষতঃ সে স্বয়ং নির্ম্মল-চরিত্র বলিয়া কখনও অপরকে সন্দেহ করিতে জানিত না।"

আমার সেই রমণীরত্ন (!)—সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আমি কিন্তু তাহার মৃত্যুতে বরং আনন্দিতই হইয়াছি। নতুবা তোমার অসংযত আচরণ

কখন্ সে আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিত, তাহার স্থিরতা ছিল না। প্রিয়তম, এখনও তোমাকে সংযত হইতে অনুরোধ করি। পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বদা আমার নিকট আসিয়া দাসদাসীদিগের মনে কোনওরূপ সন্দেহের উদ্রেক করিও না, তাহাদিগকে নানা কথা কাণাকাণি করিবার সুযোগ প্রদান করিও না। অন্ততঃ ছয় মাসকাল আমাকে শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নির্জ্জনে সময় অতিবাহিত করিতে দাও। আমাকে এই সময়ের মধ্যে বহু বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।"

গিডো এই সময় নীনার কণ্ঠবেষ্টী হার নাড়িতেছিল। তাহার কথা পরিসমাপ্ত হইলে সে তাহার লকেট-পরিশোভিত বক্ষঃস্থলে একটি চুম্বন প্রদান করিল।

হায়, আমার প্রিয়তমা পত্নী আজ সাধারণ সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে! গিডো একবার কেন, সহস্রবার তাহাকে চুম্বন করিলেও আমার আর প্রতিবাদ করিবার অধিকার নাই। আমি এই বিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিলাম, আমার দেহে শোণিত ততই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আমার মস্তক ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রের ন্যায় দারুণ প্রতিহিংসা আমার হৃদয় অধিকৃত করিল। আমি তথাপি নীরবে ঝোপের অন্তরালে বসিয়া রহিলাম।

গিডো বলিতে লাগিল, "না। প্রিয়তমে, ফ্যাবিওর মৃত্যুতে আমি বস্তুতঃই বড় দুঃখিত হইয়াছি। সে যেমন তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে আমাদের সকল পাপ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিতে সমর্থ হইত, এমন আর কে পারিবে?"

এই সময় আমার আশ্রয়স্থলের বৃক্ষপত্রগুলি একটু কম্পিত হওয়ায় নীনা ভয়-চকিত নেত্রে তাহার চতুর্দ্দিকে তাকাইতে লাগিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আজ এক দিন মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে ফ্যাবিও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাহার প্রেতাত্মা হয় ত এখনও অনির্দ্দিষ্টভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ সময় আমাদের এই নির্জ্জন প্রদেশে আগমন করা সঙ্গত হয় নাই। বিশেষতঃ লোকের মুখে শুনিয়াছি, পরলোকগত প্রেতাত্মাগুলি বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় স্থান ও প্রিয় ব্যক্তিগণের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই স্থানটি তাহার বড় প্রিয় ছিল এবং আমি আর কিছু না হইলেও সে তাহার প্রিয় কন্যার জননী, তাহাতে ত আর সন্দেহ নাই। এইরূপ অবস্থায় তাহার প্রেতাত্মার এই স্থানে আগমন একেবারে অসম্ভব নহে।"

গিডো বলিল,—"সে যে তোমার কন্যার পিতা, তাহা কি আর আমি জানি না? সে যে তোমার স্বামী বলিয়া অভিহিত হইত, ইহা কি আমার পক্ষে কম ক্লেশকর ছিল? সে যখন চোরের মত তোমার অধর হইতে চুম্বন চুরী করিয়া

লইত, আমি তাহা দেখিয়া কত দিন ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইয়াছি, কত দিন মনে মনে তাহাকে অভিসম্পাত করিয়াছি।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। তাহার সামাজিক নীতিজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত হইলাম। পতি আপনার পরিণীতা পত্নীর মুখচুম্বন করিয়া তাহার মতে চৌর্য্যাপরাধে অপরাধী হয়, আর কলুষিত প্রেমের নায়ক অসচ্চরিত্র যুবকই পরপত্নীর প্রেমালিঙ্গনের ন্যায্য অধিকারী!! হায়, আমার প্রিয় বন্ধু—আমার সহোদরাধিক প্রিয়তম সুহৃদ, তোমার মস্তকে সহস্র অশনিপাত হইলেও কি আমার দুঃখ বিদূরিত হইবে?

গিডো নীনার মুখ হইতে তাহার অলকদাম সযত্নে অপসারিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ মহাভ্রমে কেন পতিত হইয়াছিলে, নীনা? কেন তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলে?"

নীনা বলিল, "সে গূঢ় রহস্যের কথা তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? সন্ন্যাসিনীদিগের কঠোর নিয়মাবলী আমাকে বড়ই উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষতঃ আমার দারিদ্র্য আমার পক্ষে বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি দেখিলাম, ফ্যাবিও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি; তাহার হৃদয়ও একেবারে প্রেম-বিরহিত নহে, তাই তাহাকে পতিত্বে বৃত করিলাম। সে কিন্তু বস্তুতঃই আমাকে বড় ভালবাসিত। আমার জন্য সে যেন পাগল ছিল।"

নীনার কথা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গিডো রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি তুমি তাহাকে সত্য সত্যই ভালবাসিতে?"

নীনা বলিল, "বিবাহের পর দুই এক সপ্তাহ সম্ভবতঃ তাহাকে ভালবাসিয়া থাকিব। পত্নী পতিকে যতটুকু ভালবাসিতে পারে, আমি বোধ হয় তাহাকে ততটুকুই ভালবাসিয়াছিলাম। লোক বিবাহ করে কেন? কেবল ত সুখ, স্বচ্ছন্দতা, ঐশ্বর্য্য ও উচ্চপদের আকাঙ্ক্ষায়। ফ্যাবিও কি এ সকল আমাকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করে নাই?"

ঈর্ষ্যাজর্জ্জরিতকণ্ঠে গিডো বলিল, "আমাকে বিবাহ করিয়া ত তুমি ইহার কিছুই পাইবে না।

নীনা তাহার ক্ষুদ্র হস্তদ্বারা গিডোর মুখ চাপিয়া ধরিল। তাহার হস্তস্থিত অঙ্গুরী উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে জ্বলিতে লাগিল। সে হাসিয়া বলিল, "তাহা ত নহেই। আর আমি যে তোমাকে বিবাহ করিব, এমন কথা কি আমি কখনও বলিয়াছি? তুমি উপযুক্ত প্রেমের পাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমি কি করিব না করিব, তাহার স্থিরতা কি? আমি আজ স্বাধীন; আমার বাসনার গতি রুদ্ধ

করিবার ক্ষমতা আজ কাহারও নাই। আমি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমার সে স্বাধীনতা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহি। বিশেষতঃ—”

গিডো তাহাকে আর কোন কথা বলিতে দিল না, তাহাকে স্বীয় বক্ষে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিল,”নীনা, আমাকে প্রবঞ্চনা করিও না—আমার সহিত কপটাচরণ করিও না। কেবল বিধাতাই জানেন, আমি তোমার জন্য কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তোমার বিবাহের রাত্রিতে প্রথম যে দিন আমি তোমাকে দেখি, সেই দিন হইতেই আমি তোমার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলাম। তোমার অতুলনীয় রূপরাশি আমাকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি পাপ-পুণ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি কত চেষ্টাই না করিয়াছি। আমি জানিতাম, তুমি স্বর্গের দেবী নহ; তুমি সামান্যা নারী। এক দিনে হউক, দুই দিনে হউক, তুমি আমার অঙ্কশায়িনী হইবেই। আমি সুযোগ পাইলেই তোমাকে আমার প্রাণের কথা জানাইতাম। তিন মাস অতীত না হইতেই দেখিলাম, আমার যত্ন ব্যর্থ হয় নাই। তুমি হাবভাবে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে আরম্ভ করিলে। তোমার প্রত্যেক দৃষ্টি—তোমার প্রত্যেক কথা—তোমার প্রত্যেক ইঙ্গিত আমার প্রতি তোমার অনুরাগের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমার সকল বাসনা চরিতার্থ করিলে। তুমি ফ্যাবিওর বিবাহিতা পত্নী হইলেও তোমার প্রতি আমার দাবী তাহার অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়াইল। তুমি জীবনে তাহাকে যাহা দিতে সমর্থ হও নাই, আমি তোমার সেই ভালবাসা পাইয়া কৃতার্থ হইলাম। তোমার ভালবাসা কত দিন সম্ভোগ করিয়াছি! আমি জানি, তুমি আমাকে কখনও প্রতারিত কর নাই, আজও করিবে না। তোমার ভালবাসা সত্যই আমাতে ন্যস্ত ছিল। মূর্খ ফ্যাবিও তোমার সে রহস্যের মর্ম্ম কখনও অবগত ছিল না। সে কখনও তোমাকে সন্দেহের নেত্রে নিরীক্ষণ করে নাই। তুমি বালকের ক্রীড়াকন্দুকের মত তাহার মান-সম্ভ্রম লইয়া ক্রীড়া করিয়াছ, হস্ত হইতে হস্তান্তরে তাহা নিক্ষিপ্ত করিয়াছ। আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে চলিবে কেন? আমি কখনও তোমাকে পাইবার আশা পরিত্যাগ করিব না।”

সান্ধ্য সমীরণ তাহার কথাগুলি উড়াইয়া লইয়া চলিল। তাহার উত্তেজিত কণ্ঠ নীরব হইল। নীনা ক্রুদ্ধভাবে তাহার আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে বলিল, “তুমি কি নিষ্ঠুর! আমাকে ছাড়িয়া দাও। তোমার কঠিন বাহুপাশ আমাকে বেদনা দিতেছে।”

গিডো তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তাহার দৃঢ় আলিঙ্গনে নীনার বক্ষঃস্থিত

সদ্যপ্রস্ফুটিত গোলাপের দলগুলি তাহাদের চরণপ্রান্তে ঝরিয়া পড়িল। নীনার কুঞ্চিত ভ্রূ তাহার অন্তরের বিরক্তি প্রকাশ করিতেছিল। সে বিরক্তিসহকারে নীরবে মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া রহিল।

গিডোর হৃদয় বোধ হয় নীনার ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াছিল। সে শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সহস্র চুম্বনে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিল। সে বলিতে লাগিল, "নীনা,নীনা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমার অন্তরে ব্যথা দেওয়া আমার অভিপ্রেত নহে। তোমার রূপ আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে, তোমার সৌন্দর্য্য আমার মন হরণ করিয়াছে। তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব। নীনা, বৃথা মান-অভিমানে আমাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিও না। সম্মুখে যে সুযোগ উপস্থিত, তাহার সদ্ব্যবহার কর। আমাদের সৌভাগ্য বশতঃ ফ্যাবিও আজ মৃত। আজ আমরা স্বাধীন। আজ আমার মুক্ত জীবনের চির-আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ কর, জীবনকে সুখ-স্বপ্নে পরিণত কর। বিরক্তির ক্ষীণ রেখাও অন্তরে প্রবেশ করিতে দিও না। জগতে ভালবাসার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন আর কি আছে ?"

নীনার অধরপ্রান্তে এবার গর্ব্বের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল; পরস্পর পরস্পরকে অগণ্য চুম্বন প্রদান করিতে লাগিল। তাহাদের প্রত্যেক চুম্বন তীব্র দংশনের ন্যায় আমাকে যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল।

নীনা সাদরে গিডোর মস্তকে আপনার রত্নমণ্ডিত অঙ্গুলীগুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "প্রিয়তম, এত ব্যাকুলতা কেন? এত অধীরতা কেন? আমি কি তোমাকে বলি নাই, আমার ভালবাসা তোমাকেই অর্পণ করিয়াছি; আমার হৃদয় তুমিই অধিকৃত করিয়াছ? মনে পড়ে প্রিয়তম, এক দিন সন্ধ্যার পর ফ্যাবিও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে বসিয়া তাহার প্রিয় গ্রন্থ প্লেটোর দর্শন অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিল, আমি ও তুমি বৈঠকখানার সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া একটি সঙ্গীতের সুরনির্ণয়ে নিযুক্ত ছিলাম—আমি তাহার অজ্ঞাতসারে তোমাকে তখন কেমন করিয়া বলিয়াছিলাম, জগতে তুমিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম, আমি তোমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি? তুমি কি আমার সে কথায় বিশ্বাস কর নাই? তুমি কি আমার সে কথায় পরিতৃপ্ত হও নাই?"

গিডো নীনার কেশগুচ্ছ লইয়া সানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল। আনন্দে তাহার মুখ প্রফুল্ল হইল। তাহার সকল উত্তেজনা বিদূরিত হইল। সে বলিতে লাগিল, "আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই; কিন্তু ভালবাসা কখনও ঈর্ষ্যাবিরহিত নহে। ফ্যাবিও ঈর্ষ্যার এ তীব্র দংশন কখনও সহ্য করে নাই। ভালবাসা যে কি, তাহা সে

জানিত না। সে আপনাকে লইয়াই চিরদিন বিব্রত ছিল। তোমার চিন্তা তাহার হৃদয় কখনও অধিকৃত করে নাই। দর্শনশাস্ত্রের কঠিন সমস্যাগুলি তোমার অপেক্ষা তাহার অধিক প্রিয় ছিল। জলপথে একক্রমে একাধিক দিবস পরিভ্রমণ করিবার আনন্দ তোমার সংস্পর্শ অপেক্ষাও তাহার নিকট প্রলোভনীয় ছিল। দর্শন-বিজ্ঞানের কঠিন তত্ত্বগুলি তাহার নিকট প্রাঞ্জল হইয়া যাইত, কিন্তু রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব চিরদিন তাহার নিকট দুর্জ্ঞেয় ছিল। তুমি কি কর না কর, সে সংবাদ লইবার জন্য সে কিছুমাত্র ব্যাকুল ছিল না। আমার হৃদয় চিরদিন তোমার পশ্চাতেই ঘুরিয়া বেড়ায়। তুমি মৃত্তিকা দিয়া হাঁটিয়া যাইলে আমার মনে হয়, মৃত্তিকা বড় ভাগ্যবতী। তুমি সুশীতল বায়ুসেবনে বহির্গত হইলে আমার মনে হয়, বায়ু তোমার সংস্পর্শে না জানি কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছে। তাহাদের প্রতিও আমার ঈর্ষ্যার উদ্রেক হইয়া থাকে। আর ফ্যাবিও যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন আমি ঈর্ষ্যায় জর্জ্জরিত হইতাম, তোমার ভালবাসায় সে যে আমার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তাহা আমার সহ্য হইত না। আর যদি সেইরূপ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হয়, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার শাণিত কৃপাণ তাহার হৃদয়ের শোণিত পান না করিলে আমি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইব না।"

নীনা বিরক্তিসহকারে তাহার বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক উত্তোলিত করিল, বিরক্তিপূর্ণভাবে তাহাকে বলিল, "তুমি যে তোমার অভিমান কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিতেছ না! তুমি যে কথায় কথায় পুনরায় উত্তেজিত হইতেছ!"

গিডো তাহাকে পুনরায় চুম্বন করিল ও বলিল, "যত দিন তুমি আমাকে ভালবাসিবে—যত দিন তোমার এ ভালবাসা শুধু আমাতেই অর্পিত হইবে, তত দিন আমার হৃদয় আর কোনও দিন বিরক্তি বা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইবে না। এ স্থানটা বড় আর্দ্র ও শীতল বোধ হইতেছে। চল, আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি।"

গিডো ও আমার পত্নী (আমাদের উভয়ের পত্নী বলিলেও বোধ হয় দোষের হইবে না, কারণ, তাহার প্রেম পক্ষপাতদোষদুষ্ট ছিল না।) অতঃপর উভয়ের বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিল; পথে একবারমাত্র কিছুক্ষণের জন্য দণ্ডায়মান হইল। তখন পাপিয়া সুললিত গীতে দিগন্ত ধ্বনিত করিতেছিল। গিডো জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পাপিয়ার গান শুনিতেছ?"

তখন সত্যই মনে হইতেছিল, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষগুলি হইতে যেন তাহাদের প্রেমধারা বৃষ্টির মত বর্ষিত হইতেছে। সে প্রেমে মলিনতার সংস্পর্শ নাই, মানবের প্রবঞ্চনার তীব্র গন্ধ তাহাতে অনুভূত হয় না; উহা যেন চির-মধুর—চির-পবিত্র। চকোর-চকোরী পরস্পরের প্রতি যতটুকু অনুরক্ত, মানবদম্পতির মধ্যে কি ততটুকু

অনুরাগও পরিলক্ষিত হয়? পক্ষীর জীবনে যে প্রেম—যে ভালবাসা দৃষ্ট হইয়া থাকে, মানুষের মধ্যে তাহা কোথায়? ভগবানের প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতাও অসীম। ক্ষুদ্র তিত্তির মেঘমুক্ত প্রসন্ন আকাশ দেখিয়া যে আনন্দ অনুভব করে, ভগবান্‌কে যে ধন্যবাদ প্রদান করে, শীতের দারুণ কুজ্ঝটিকার মধ্যেও সে আনন্দ বিস্মৃত হয় না, তখনও ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে কুণ্ঠিত হয় না। আর, চিরবিদ্রোহী নরনারী ভগবানের বিরুদ্ধে চিরদিনই অনুযোগ দিয়া আসিতেছে; পরস্পরকে হিংসাদ্বেষ করিবার জন্যই যেন তাহাদের জন্ম। তথাপি মানব জ্ঞান ও বুদ্ধির অহঙ্কার করে!

নীনা কিছুক্ষণ নীরবে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিল, পরে কম্পিত-কলেবরে গাত্র-বস্ত্র টানিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত বলিতে লাগিল, "আমি এই পক্ষীগুলিকে বড় ঘৃণা করি। ইহাদের তারস্বর যেন আমার কর্ণে বিদ্ধ হয়। ফ্যাবিও কিন্তু ইহাদের কর্কশ স্বর শুনিতে বড় ভালবাসিত, ইহাদের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সেও গান গাহিত।" এই বলিয়া সে আমার প্রিয় সঙ্গীতটি গাহিতে লাগিল।—

বন্দি তোমায় হে প্রিয় আমার;
তুলনা তোমার নাই,
বিকশিত ফুলে তুলনা না মিলে,
তুলনা কোথায় পাই?
মাধুরী তোমার কোথা পাব আর?
তুমি যে মাধুরীময়;
তোমাতরে প্রাণ দিতে পারি দান—
যদি প্রয়োজন হয়।

তাহার সুমধুর কণ্ঠ তখন চতুর্দ্দিকে সুধাবর্ষণ করিতেছিল। পাপিয়ার স্বরও যেন ক্ষণকালের নিমিত্ত পরাজয় স্বীকার করিল। নীনা পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, "ফ্যাবিওর কণ্ঠস্বরে যেন কোথায় একটু বিষাদের সুর বাজিয়া উঠিত।"

তাহারা অতঃপর নীরবে চলিয়া গেল। বিবেকের দংশনযন্ত্রণা তখনও তাহারা ভোগ করে নাই। পাপের স্মৃতি তখনও তাহাদের হৃদয়ে তুষানল প্রজ্বালিত করে নাই। তাহাদিগের দুষ্কার্য্যের প্রতিফল এক দিন ভুগিতে হইবে, সে চিন্তা তখনও তাহাদিগকে যন্ত্রণা প্রদান করে নাই। তাহারা নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র লোকের মত নীরবে স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়া গেল। আমার উৎসুক দৃষ্টি তাহাদিগের অনুসরণ করিল। ছায়ার ন্যায় তাহাদের মূর্ত্তি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গেল, নীনার শ্বেত বস্ত্রের অস্পষ্ট আভাস ক্রমে বনান্তরালে লুক্কায়িত হইল। তাহারা ক্রমে আমার দৃষ্টি-পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। এ রজনীতে তাহারা আর এ স্থানে আগমন

করিবে না। আমি আমার সেই গুপ্ত স্থান হইতে বাহিরে আগমন করিলাম। তাহারা যে স্থানে দণ্ডায়মান ছিল, আমি সেই স্থানে কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলাম। আমার মস্তক তখন ঘুরিতেছিল, আমার চক্ষুর সন্নিকটে তখন অসংখ্য অগ্নির স্ফুলিঙ্গ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আমার পদতল হইতে মৃত্তিকা যেন কোথায় সরিয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রের সুবিমল রশ্মি তখন আমার কাছে অস্বাভাবিক লোহিত বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। আমি আমার স্ত্রীর আচরণের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলাম। আমি জীবিত কি মৃত, এই দারুণ সন্দেহ আসিয়া আমার হৃদয় অধিকৃত করিল। আমি কি আমারই পরলোকগত আত্মা; অতীতের সকল স্মৃতি লইয়া বিগত জীবনের সুখের আলয় দেখিতে আসিয়াছি? আমার চতুর্দ্দিকের সৌর-জগতে যেন আমার আর কোন আকর্ষণ নাই? আমি যেন ইহার সৌন্দর্য্যে আর মুগ্ধ নহি। সমস্ত বিশ্ব যেন আমার নিকট তুচ্ছ জলবিম্বের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ইহা যেন কোন অভিশপ্ত দানবের ক্রীড়াকন্দুক। এই অগণ্য নক্ষত্র-পরিশোভিত সুবিশাল গগন, এই বিচিত্রপত্রবিশিষ্ট অসংখ্য তরুরাজি, এই সুমধুর সৌরভ-সমাকুল অগণিত পুষ্প এ সকলই বৃথা। বৃথা আমরা ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া থাকি। যিনি একটি রমণী-হৃদয়ের ভালবাসার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহাকে আর সর্ব্বক্ষমতাশালী বলি কেন? আহা, প্রাণ দিয়া আমি তাহাকে কতই ভালবাসিতাম! যাহার মধুর আনন অপ্সরোনিন্দিত, যাহার দেহ সুগঠিত, যাহার গুণরাশি খৃষ্টবাঞ্ছিত—আজ সেও কি না অবিশ্বাসিনী! অর্থ-বিনিময়ে আত্মবিক্রয়কারিণী পতিতা রমণীর ন্যায় সে-ও কলঙ্কিতা! এক দিন যে সম্মানের সমুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় ছিল, আজ সে কি না জগতের হেয়—নিন্দকের নিন্দার সামগ্রী! পথে ঘাটে আজ তাহার চরিত্র ইতরশ্রেণীর রমণীর চরিত্রের ন্যায় আলোচিত হইবে। হায়, এই নারী আমারই পত্নী—আমারই সন্তানের জননী! স্বেচ্ছায় সে আপনার শুভ্র অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লিপ্ত করিয়াছে, সানন্দে তীব্র হলাহল পান করিয়াছে; উন্নত মস্তকে কণ্টকের মুকুট পরিধান করিয়াছে! কিসে ইহার প্রতিবিধান হইবে? ধরাতলবদ্ধদৃষ্টি হইয়া আমি বারংবার আপন হৃদয়কে এই প্রশ্ন করিলাম। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া কেহ কি আমার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিবে? সহসা আমার দৃষ্টি ধরাতলে কতগুলি গোলাপের দলের প্রতি পতিত হইল। আমি বুঝিলাম, গিডোর আলিঙ্গন সহ্য করিতে না পারিয়া নীনার বক্ষঃস্থল হইতে এইগুলিই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই স্থানে পতিত হইয়াছে। তাহাদের রক্ত-আভা তখনও পথিপার্শ্ব আলোকিত করিতেছিল। আমি সাগ্রহে

সেগুলি গ্রহণ করিলাম। তাহাদের কোমলতা—তাহাদের সৌরভ তখনও আমার চিত্ত আকৃষ্ট করিতেছিল। আমি সেগুলিকে প্রায় চুম্বন করিতে উদ্যত হইলাম। তীব্র স্মৃতি সহসা আমাকে বাধা প্রদান করিল। মনে হইল, প্রবঞ্চনা-পরিপূর্ণ বক্ষে যাহারা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা আমার এ আদর-সম্ভোগের অযোগ্য। মিথ্যা প্রবঞ্চনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ—সৌন্দর্য্যের আবরণে আচ্ছাদিত তীব্র বিষধরের মত সে ভীষণ। কিসে ইহার প্রতিবিধান হইবে? আমার হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে ভীষণ শব্দে নিনাদিত হইল, "যাও, তাহাকে হত্যা কর।" এই চিরপরিচিত শব্দ কোথায় প্রথম শুনিয়াছিলাম, একটু চিন্তা করিতে তাহা আমার মনে পড়িল। আমার মনে হইল, সেই বৃদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী আমাকে কি ভীষণ উপদেশই দিয়াছিল! আহা, বৃদ্ধ বস্ত্রব্যবসায়ী সামান্য দরিদ্র লোক হইয়াও এক মুহূর্ত্তে কেমন প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল; কি ভয়ঙ্কর বৈরনির্য্যাতন সংসাধিত করিয়াছিল। সে যাহা পারিয়াছিল, আমি তাহা পারিলাম কই? আমি যে মূর্খের মত আজ আমার সমস্ত সুযোগ নষ্ট করিয়াছি; বহুমূল্য সময় বৃথা অতিবাহিত হইতে দিয়াছি! কি প্রকারে আর আমার প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করিব? জগৎ-বিখ্যাত রোমাণী-বংশের একমাত্র বংশধর কি হীন নরহত্যাপাপে লিপ্ত হইবে? তাহার সুযোগ্য সন্তান কি নরশোণিতে হস্ত কলঙ্কিত করিবে? হত্যা ব্যতীত কি এ পাপের অন্য প্রতিবিধান নাই? একটা ছিন্ন বৃক্ষকাণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া আমি এই সকল কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম। গোলাপের দলগুলি তখনও আমার হাতে ন্যস্ত ছিল। আমার কর্ণে কি এক প্রকার শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল; আমার মুখে দারুণ বিস্বাদ অনুভূত হইতেছিল; ওষ্ঠদ্বয়ে জরাক্রান্ত রোগীর জালার ন্যায় ভীষণ জালা অনুভূত হইতেছিল। ইটালীর সম্রাট্ যে আমাকে "শুভ্রকেশধারী মৎস্যজীবী" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে পড়িয়া গেল। আমি আমার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। আত্মঘাতী মৎস্যজীবীর পরিচ্ছদ তখনও আমার অঙ্গে। পরিচ্ছদপ্রদানকারী বৃদ্ধ সত্যই বলিয়াছিল, মূর্খ সে, তাই সে এইরূপে আপনার ধ্বংসসাধন করিয়াছিল। আমি তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে বিরত হইলাম, ভীষণ প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলাম। নীনার বক্ষচ্যুত গোলাপের দলগুলির গন্ধ আমার নিকট তখন বড় তিক্ত বোধ হইতে লাগিল। আমি উহা দূরে নিক্ষিপ্ত না করিয়া নীনার অবৈধ প্রেমালিঙ্গনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ আমার মুদ্রাথলির অভ্যন্তরে সযত্নে রক্ষা করিলাম। এই সময় আমার সদ্যঃপ্রাপ্ত স্বর্ণ ও মণিমুক্তাপরিপূর্ণ অপর দুইটি থলির কথাও আমার মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে

সঙ্গে সেই ভীষণ সমাধি-মন্দিরের যাবতীয় ঘটনা আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল।

ঐ থলিগুলি আমাকে আমার সমাধিমন্দিরের ভীষণ অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। জীবন ও মুক্তির জন্য তথায় আমি কি কঠোর সংগ্রামই করিয়াছিলাম! সে কি শুধু শেষে আত্মহত্যা করিবার জন্য?—না, আমাকে এ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতেই হইবে। আমি যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব, সে আশা ত কেহ করে নাই। আমি যে আবার আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিতে পারিব, সে ধারণা ত কাহারও হৃদয়ে স্থান পায় নাই। আমারই কৃত উইল অনুসারে আমার সকল সম্পত্তি আমার পত্নীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। আমি আর ঐ সকলের জন্য দুঃখ করিব কেন? আমি দস্যুর লুক্কায়িত যে অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছি, তাহার তুলনায় আমার সম্পত্তি তুচ্ছ। সেই ঐশ্বর্য্যের কথা মনে করিয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। অর্থদ্বারা কোন্ কার্য্য না সাধিত হয়? অর্থ আমাকে নিশ্চয়ই বৈরনির্য্যাতনে সাহায্য করিবে। কিন্তু তাহা কি প্রকারে সাধিত হইবে, আমি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম।

সাগরসঙ্গশীতল সান্ধ্য সমীরণ তখন বৃক্ষপত্র কম্পিত করিয়া ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। পাপিয়ার কণ্ঠ তখনও নীরব হয় নাই। পূর্ণচন্দ্র নীল আকাশে তখনও বিরাজিত। আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। "তাহার কণ্ঠে যেন অজ্ঞাতসারে একটু বিষাদের স্বর বাজিয়া উঠিত,"—নীনার উচ্চারিত এই কথা কয়টি আমার হৃদয়-মধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার সেই মৃদু হাসি আমার বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিতে লাগিল। সত্যই আমার কণ্ঠে—আমার কণ্ঠে কেন—আমার সমস্ত জীবনে, আজ বিষাদের স্বর বাজিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলিতে যখন অবিশ্বাসিনী নারীরা আঘাত করে, তখন যে বিষাদ-স্বর বাজিয়া উঠে, তাহা জীবনে কখনও নীরব হয় না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাহার ধ্বনি সমভাবে ঝঙ্কারিত হইতে থাকে।

"শুভ্রকেশধারী মৎস্যজীবী"—সম্রাটের উচ্চারিত এই কথা কয়টি বার বার আমার কর্ণে নিনাদিত হইতে লাগিল; বার বার মনে হইতে লাগিল। আমার আকৃতির কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে! আমাকে এখন আর কেহ সহজে চিনিতে পারিবে না। এই চিন্তা আমার হৃদয়ে প্রতিহিংসা-সাধনের এক নূতন উপায়ের উদ্ভাবন করিয়া দিল। আমি সেই ভীষণ উপায়ে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলাম। সে কথা চিন্তা করিতে যেন আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। আমি আমার আসন পরিত্যাগ করিলাম ইতস্ততঃ পাদচারণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল, কোন অদৃশ্য দানব আমার হৃদয়ে যেন এক নূতন শক্তি সঞ্চারিত করিতেছে। আমার নৈরাশ্য ও অবসাদ বিদূরিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধব্যবসায়ী সৈনিকের মত আমি কার্য্যতৎপর হইলাম। প্রেম, ভালবাসা, ক্ষমা, দয়া—এই সকল কোমল বৃত্তি আমার অন্তর হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। রক্তাক্তকলেবরে খৃষ্ট মৃত্যুকালেও তাঁহার শত্রুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অবিশ্বাসিনী নারী কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইলে তিনি কি করিতেন, কে জানে? আমি প্রতিহিংসাবিধানে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলাম; বৈরনির্য্যাতনে বদ্ধপরিকর হইলাম। আমি সামান্য নাবিক বা ক্ষুদ্র বস্ত্র-ব্যবসায়ীর ন্যায় আত্মহত্যা বা নরহত্যা-পাপে লিপ্ত হইব না, তাহাদের মত বর্ব্বরোচিত ক্রোধের বশীভূত হইয়া স্বীয় বংশমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিব না। ধীর মস্তিষ্কে, প্রশান্ত হৃদয়ে আমাকে এই পথ অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে ক্রুদ্ধ হৃদয়ের উত্তেজনা বা কোমল-প্রকৃতি স্ত্রীলোকের ভাবপ্রবণতা স্থান পাইবে না। আমার জীবন-নাটকের ভবিষ্যৎ অঙ্কগুলি কি প্রকারে অভিনীত হইবে, আমি তাহা বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া স্থির করিয়া লইলাম। আমার হৃদয়ের সকল অন্ধকার বিদূরিত হইল, আমার উত্তেজিত মস্তিষ্ক সুশীতল হইল। আমি আমার নির্দ্দিষ্ট সঙ্কল্পের পরিণাম চিন্তা করিয়া নিজেই আনন্দিত হইলাম, অতীতের দুঃখ-স্মৃতিতে আপনাকে আর অনর্থক আবদ্ধ রাখিলাম না। যাহার হৃদয়ে কখনও স্থান প্রাপ্ত হই নাই, তাহার জন্য রোদন করিয়া লাভ কি? সে ত চিরদিনই আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে; চিরদিনই করিবে। বিবাহের পর তিন মাস অতিবাহিত হইতে না হইতেই সে আমার নয়নে ধূলি-নিক্ষেপ করিয়া পাপের স্রোতে ভাসিয়াছিল। আমি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এতদিন তাহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আজ আমার সে ভ্রান্তি অপনোদিত হইয়াছে। আমি বুঝিয়াছি, সুবর্ণের হার ভ্রমে কি কালসর্পই এত দিন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি। আমার হৃদয়ে তাহার জন্য যে স্থানটুকু ছিল—যে ভালবাসা ছিল, কণ্টকের ন্যায় তাহা তুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলাম। ন্যায়, ধর্ম্ম, আত্মসম্মান এই অবিশ্বাসিনী নারীর বিশ্বাসঘাতকতার বিচার প্রার্থনা করিতেছে, আজ পাপের প্রতিবিধান করিতে হইবে। গিডো ফেরারীর জন্য আমার অন্তরের নিগূঢ়তম প্রদেশে যে স্নেহ সঞ্চিত ছিল, তাহা আজ তীব্র হলাহলে পরিণত হইল। কি সুখের আশাতেই আমি আজ আমার এই প্রিয় গৃহের দিকে ধাবিত হইয়াছিলাম; কি আনন্দের প্রেরণায় আমি সেই ভীষণ সমাধি-মন্দির হইতে এই স্থানে উপনীত হইয়াছিলাম। আমার সকল সুখ—সকল শান্তি আজ অপহৃত হইল। প্রতিহিংসার

প্রবল বহ্নি আজ আমার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত হইল। ধর্ম্মযাজকের প্রদত্ত সেই ক্রুশখানি আমি বাহির করিলাম, দুই হস্তে উহা সুদৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া বৈরনির্য্যাতনব্রত গ্রহণ করিলাম। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, বিশ্রাম-সুখ চিরদিনের মত পরিত্যক্ত হইল। অনন্ত আকাশে অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী আমার সেই ব্রতগ্রহণ নিরীক্ষণ করিল। ক্ষুদ্র পাপিয়া ক্ষণকালের জন্য নীরব থাকিয়া আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিল। বায়ু প্রবল বেগে সে বারতা দিগ্‌দিগন্তে বহন করিয়া লইয়া গেল। ক্ষুদ্র যূথিকা-পুষ্পগুলি শুভ্র দন্ত বিকশিত করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কবিল। আমাব অতীত জীবনের সকল সুখস্মৃতি, সকল বিলাসবাসনা, সকল আনন্দ ও তৃপ্তি আমি চিরদিনের মত বিসর্জ্জন কবিলাম। দুর্ব্বহ জীবন আজ সুকোমল পুষ্পমাল্য হইতে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে পরিণত হইল। সে লৌহ-শৃঙ্খলের সংঘর্ষণে এক দিন নীনার ও গিডোর সকল সুখ—সকল তৃপ্তি তিরোহিত হইবে। তাহারা এক দিন চিরদিনের মত এই লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে। তাহাদের আর পরিত্রাণেব উপায় নাই। আমি অতঃপর সেই উদ্যান হইতে বাহিরে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। গুপ্তদ্বার অতিক্রম করিয়া রাজপথে উপনীত হইতেই পশ্চাতে একটা খট খট শব্দ শুনিতে পাইলাম, দেখিলাম, আমারই জনৈক ভৃত্য সিংহদ্বার রুদ্ধ করিতেছে। আমার এ গৃহে প্রথম প্রবেশকালে এ দ্বাব ত রুদ্ধই ছিল! কে ইহা উন্মুক্ত করিল? আমি বুঝিলাম, গিডো এই দ্বার দিয়া বিদায় গ্রহণ কবিয়াছে, উহা পুনরায় রুদ্ধ হইতেছে। আমি নীনার এই চাতুরীতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। সে নিজে কি চরিত্রেব লোক, তাহা সে জানে; কেবল পরের চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ কবিবার জন্য কি চাতুরীই না অবলম্বন কবিয়াছে! তাহার বাহ্য আচরণে যাহাতে কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক না হয়, তজ্জন্য সে সর্ব্বপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। তাই গিডো সিংহদ্বারপথেই গৃহে নীত হইয়া থাকে এবং ঐ দ্বার দিয়াই পুনরায় বিদায় গ্রহণ করে। আমি ধীরপাদবিক্ষেপে ক্রমে সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথে গিডোর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে তখন ধূমপান করিতে করিতে অলস গতিতে তাহার গৃহাভিমুখে যাইতেছিল। তাহার হস্তে একটি সুগন্ধবারিপূর্ণ গোলাপপাস। তাহা কাহার এবং কে তাহা তাহাকে দিয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার বড় বিলম্ব হইল না। আমি তাহাকে অতিক্রান্ত করিলাম। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে তাহার বদনমণ্ডল বড় প্রফুল্ল বোধ হইতেছিল। সে আমার দিকে একবার তাকাইয়া অন্যত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সামান্য মৎস্যজীবী কেন তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিবে? সে ত আর আমাকে চিনিতে পারে নাই!

আমার মনে এই সময় দারুণ প্রতিহিংসা প্রজ্জলিত হইয়াছিল; তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য আমার হৃদয় বড়ই উত্তেজিত হইয়াছিল। উন্মত্তের ন্যায় তাহাকে মৃত্তিকায় নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহার কণ্ঠদেশ নিষ্পীড়ন করিবার জন্য আমার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে আমি আপনাকে সংযত করিলাম। ইহার অপেক্ষা ভীষণতর প্রতিশোধের উপায় ইতঃপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। আমি শুধু সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমি বুঝিলাম, এ ক্ষেত্রে বর্ব্বরের ন্যায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া লাভ নাই। বিশেষতঃ প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি হৃদয়ের সঞ্চিত ক্রোধদ্বারা কিছুদিন পরিপুষ্ট না হইলে তাহা অকালপক্ক ফলের ন্যায় নীরস হয়। তাই আমার প্রিয়বন্ধু—আমার পত্নীর সকল সন্তাপহারী গিডো সে স্থান দিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নে সে তখন বিভোর ছিল। আমি তাহাতে আর কোনও বাধা প্রদান করিলাম না। নেপল্‌সের এক সাধারণ বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিয়া আমি সে রাত্রির মত বিরামদায়িনী নিদ্রার শরণ লইলাম। সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও মানসিক উত্তেজনার পর আমার ব্যাধিক্লিষ্ট শরীর সত্বর সুনিদ্রার শান্তিলাভ করিল। প্রতিহিংসা-বিধানের শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় আমার হৃদয় প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। তার্কিকগণ বলিলেন, আমার এ আচরণ খ্রীষ্টানোচিত ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি এখনও বলি, খ্রীষ্ট যদি কোন রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নৈরাশ্যজনিত দারুণ যন্ত্রণা সম্ভোগ করিতেন, তবে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মনীতিতেও ইহার জন্য বিশেষ বিধান থাকিত।

শ্রীজগদেন্দু গুপ্ত।

খল ও সাধু।

(সংস্কৃত হইতে অনূদিত।)

খলে বিদ্যা বিবাদের হেতু শুধু হয়,
অর্থ আত্ম-অহঙ্কার বাড়ায় নিশ্চয়,
শক্তি সদা পর-পীড়া উৎপাদন করে।
সাধুজনে কিন্তু তিনে ভিন্ন ফল ধরে—
জ্ঞান বৃদ্ধি করে বিদ্যা, অর্থ করে দান,
শক্তি করে বিপন্নের রক্ষার বিধান।
অতএব উভয়ের অনেক অন্তর,
খল অন্ধতমঃ, সাধু দীপ্ত দিনকর।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু।

সংগ্রহ।

—*—

প্রাচীন ঢাকা।

সংপ্রতি 'ঢাকা রিভিউ' পত্রে সৈয়দ আউলদ হোসেন মহাশয়ের ঢাকাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের সারাংশ 'আর্য্যাবর্ত্তের' পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।—১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর ভারতের সম্রাট্ হয়েন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বিশৃঙ্খল রাজ্যতন্ত্রের কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে মোগলরাজশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার তদানীন্তন নবাব ইসলাম খাঁ'কে আদেশ করেন। বঙ্গদেশে তখনও ওসমান খাঁ'র আশ্রিত পাঠানগণের দৌরাত্ম্য অনুভূত হইতেছিল। এতদ্‌ভিন্ন মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুরা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র দুর্দ্ধর্ষ আচরণ করিতেছিল। ভুলুয়া ও লক্ষ্মীপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকৃত করিয়া তাহারা নদীমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সম্পন্ন গ্রামসমূহ বিধ্বস্ত করিত। ইসলাম খাঁ এই সকল উপদ্রব-নিরাকরণ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনপ্রয়াসী হইলেন। রাজমহল হইতে নৌবহর লইয়া বাহির হইয়া ইসলাম খাঁ ঢাকার সন্নিকটে কোনও স্থানে আগমন করিলেন। এই স্থানের নানাবিধ উপযোগিতাদর্শনে একান্ত আকৃষ্ট হইয়া তিনি এই স্থানে তাঁহার রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহা এখনও তাঁহার নামানুসারে ইসলামপুর আখ্যায় অভিহিত হয়। ঢাকার নামোৎপত্তি লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। লেখক বলেন, ইসলাম খাঁ তাঁহার নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী হইতে নৌকায় আগমন করিবার সময় দেখিলেন, হিন্দুগণ ঢাকের বাদ্যসহকারে পূজা করিতেছে। সহসা তাঁহার মনে এক অভিনব কল্পনা জাগিল। তিনি বাদ্যকরগণকে ডাকিলেন এবং খুব উচ্চে ঢক্কা-নিনাদ করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি তিন জন লোককে নিশান লইয়া যথাক্রমে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তরদিকে গমন করিতে বলিলেন। যেস্থানে ঢাকের বাজনা আর শুনা যাইবে না, নবাব তাহাদিগকে সেই স্থানে নিশান প্রোথিত করিতে বলিলেন। এই সকল চিহ্নিত সীমায় (দক্ষিণে স্বাভাবিক সীমা বুড়ীগঙ্গা ছিল) স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং এই স্থানকে তিনি 'ঢাকা' নামে অভিহিত করিলেন। পরে তদানীন্তন ভারতসম্রাট্ জাহাঙ্গীর বাদশাহের নামে তিনি ইহাকে "জাহাঙ্গীর নগর" নামে আখ্যাত করেন। কেহ কেহ বলেন, 'ঢাক' বৃক্ষের প্রাচুর্য্য বশতঃই ইহার এই

নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, বল্লাল সেনের প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী মন্দিরই উক্ত স্থানের ঈদৃশ নামকরণ হইবার কারণ।

মিষ্টার আসকলি বলেন যে, ঢাকবৃক্ষ হইতে ঢাকার নামোৎপত্তি কেবল জনপ্রবাদ নহে। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে টেলর লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়েও ঢাকায় ঢাকবৃক্ষের বিশেষ প্রাচুর্য্য লক্ষিত হইত। স্থানীয় বিশেষত্বের উপর নির্ভর করিয়া অনেক সময় বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানের নামকরণ হইয়াছিল। লেখক বল্লাল সেনের মন্দিরের নমামানুসারে ঢাকার নামোৎপত্তির কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বল্লাল-স্থাপিত ঢাকেশ্বরীর নাম ঢাকবৃক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল কি না, তাহাও বিচার্য্য। একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা একটি নগরকে যে একবার হিন্দু আখ্যা এবং পরক্ষণে আবার মুসলমান আখ্যা প্রদান করিবেন, ইহাও বিশ্বাস করা যায় না। আর একটি কথা এই যে,ঢাকা নগরীর প্রতিষ্ঠার যে সময় কল্পিত হইয়াছে,তাহার ঈষদূন শতবর্ষের মধ্যেই টাভার্ণিয়ার, মানুচি প্রভৃতি বৈদেশিক পর্য্যটকগণ ইহাকে ঢাকা-নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। লেখকের একমাত্র যুক্তি, আইন-ই-আকবরি প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থে ঢাকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের জিজ্ঞাসা এই,সকল ইতিহাসে পূর্ব্ববঙ্গের সকল প্রাচীন স্থানের নামই কি দৃষ্ট হইয়া থাকে? শ্রীবাটী, মৌনা, পাঁচদানা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের উল্লেখ মুসলমানপ্রণীত ইতিবৃত্তে দেখা যায় না। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ্ লিখিয়াছেন, ঢাকা উক্ত সময়ে কার্পাসের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া স্বতঃই ধারণা হয়, ইসলাম খাঁ'র পূর্ব্ববঙ্গে আগমনের বহুপূর্ব্বেও ঢাকানগরীর অস্তিত্ব ছিল। ভূতত্ত্বের আলোচনা করিলেও ইহা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আইন-ই-আকবরি-প্রণেতা ঢাকার উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'ঢাকা বাজু' নামে এক পরগণার উল্লেখ করিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর ইহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; কিন্তু ইহার সহিত ঢাকা নামের কি সম্পর্ক, তাহা এখনও বিচার-সাপেক্ষ রহিয়াছে। লেখকের মতে ঢাকা সরকার বাজুর অন্তর্গত, ঢাকা বাজুর অন্তর্গত নহে। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, ঢাকা বাজু সরকার সোণারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত—সরকার বাজুহার অন্তর্গত নহে। মিষ্টার আসকলি বিবিধ প্রমাণবলে দেখাইতে সাহসী হইয়াছেন যে, ইসলাম খাঁ'র সময়েই ঢাকার প্রথম অভ্যুত্থান, ইহা সন্দেহ করিবার যথার্থ কারণ আছে। ঢাকায় আপনার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রথমতঃ ইসলাম খাঁ বিদ্রোহী ওসমান খাঁ কে পরাজিত করিলেন (১৬১১ খ্রীষ্টাব্দ)। বঙ্গের পাঠানরাজশক্তি বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তৎপরে ইসলাম খাঁ কোচ-রাজকে পরাভূত করেন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া আগরায় প্রেরণ করেন।

পরবৎসর নোয়াখালির নিকট নবাব মগ ও পর্ত্তুগীজগণের এক সম্মিলিত সেনাদল পরাজিত করিলেন। ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার অভীষ্ট যে অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইসলাম খাঁ'র পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তার নাম কাসেম খাঁ। তিনি ইসলাম খাঁর ভ্রাতা। তাঁহার দ্বারা কার্য্য-উদ্ধারের বিশেষ কোনও সম্ভাবনা না দেখিয়া ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গকে তাঁহার স্থানে প্রেরণ করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া কৃষি-বাণিজ্য-বিষয়ে অনেক উন্নতি লক্ষিত হয় এবং দেশে শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু এ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের পুত্র খুরাম বিদ্রোহী হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ রাজমহলের নিকট যুদ্ধে নিহত হইলেন। যুবরাজ খুরাম ঢাকায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পর চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা লইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ'র শাসনকালে ঢাকায় একটি দুর্গ-নির্ম্মাণ হইয়াছিল। এই ভূমির উপর এক্ষণে সেণ্ট্রাল জেল এবং বাতুলালয়ের বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ বঙ্গের নবাবের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চট্টগ্রাম দখল করেন এবং ইহার নাম ইসলামাবাদ রাখেন। ইহার পর আসামে এক অভিযান প্রেরিত হইল, ফলে আসামরাজ্য ও সম্রাটের রাজ্য ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তীসীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। ১৬৩৯খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থানে সুলতান শা'সুজা নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ঢাকায় কিয়ৎকাল অবস্থানের পরই শাসুজা ঢাকা হইতে রাজমহলে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার শাসনকালে নূতন করিয়া জমীর খাজনা নিরূপিত হয়। তিনি প্রায় বিংশবর্ষ ধরিয়া বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ঢাকার বহু উন্নতি সাধিত হয়। অত্রত্য প্রধান প্রধান হর্ম্ম্যাদির অধিকাংশ এই সময়েই নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্রাটের পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া সুজা অচিরে দিল্লীর রত্নসিংহাসনের প্রয়াসে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন; কিন্তু ভ্রাতা ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্ত্তৃক পরাজিত ও অনুসৃত হইয়া পুনরায় ঢাকায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। এই স্থান হইতে তিনি আরাকানে গমন করেন এবং আরাকানরাজকর্ত্তৃক সসম্মানে গৃহীত হয়েন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জলে ডুবিয়া সুজার মৃত্যু হয়।

সুজার মৃত্যুর পর মীর জুমলা বঙ্গের নবাব হয়েন। ইদ্রাকপুর, বর্ত্তমান মুন্সী-গঞ্জ, খিজিরপুর ও নারায়ণগঞ্জে তিনি দুর্গনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বুড়ীগঙ্গার মোহানায় এবং সোনাকাণ্ডায় তাঁহার দুর্গের এখন আর চিহ্ন নাই। ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত যে দুইটি রাজপথ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা

মীর জুমলারই কীর্ত্তি। তাঁহার রচিত পাগ্‌লা এবং টুঙ্গির সেতুদ্বয় এখনও বিরাজমান। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মীর জুমলা কুচবিহার প্রদেশ জয় করেন এবং আসাম আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েন। কিন্তু এই সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরব্ধ হওয়ায় তাঁহার সৈন্যগণ পরাজিত হয় এবং খিজিরপুর হইতে চারি মাইল দূরে নৌকার উপর তাঁহার মৃত্যু হয়। (১৬৬৩ খৃঃ অঃ)।

মীর জুমলার মৃত্যু হইলে শায়েস্তা খাঁ শাসনকর্ত্তা হয়েন। তিনি ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৭ এবং ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—দুইবার বঙ্গদেশ শাসন করেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণের পরাভব, আরাকান, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট অধিকার—ইহাই শায়েস্তা খাঁ'র শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ সম্রাট কর্ত্তৃক আগরায় আহূত হয়েন এবং তাঁহার স্থলে আজিম খাঁ বঙ্গদেশের নবাব হয়েন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে আজিম খাঁ'র মৃত্যু হয় এবং সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আজম খাঁ নবাব হয়েন। তিনি ঢাকার লালবাগ-দুর্গ-নির্ম্মাণ আরব্ধ করেন। এই স্থানে তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী বিবি প্যারী সমাহিতা আছেন। পরবৎসর আজম খাঁ দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে পিতার সহিত সম্মিলিত হয়েন এবং শায়েস্তা খাঁ পুনরায় বঙ্গের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ইংরাজ-উপনিবেশের শাসনকর্ত্তা উইলিয়ম হেজেস শায়েস্তা খাঁ'র সভায় আগমন করেন। তিনি নবাবের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হেজেস নবাবের দরবারের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ হইতে চলিয়া যাইবার সময় তিনি ঢাকা-দুর্গের পশ্চিম-তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া যায়েন। তাঁহার শাসনকালে টাকায় আট মণ পর্য্যন্ত চাউলের দর নামিয়াছিল। প্রবাদ, ইহারই স্মরণার্থ এই নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। শায়েস্তা খাঁ'র সময় ঢাকা নগরীর যে উন্নতি হইয়াছিল এবং সমগ্র দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা আর কোনও নবাবের শাসনকালে হয় নাই।

শায়েস্তা খাঁ'র পরবর্ত্তী দুই জন নবাবের শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ইঁহাদের পরবর্ত্তী নবাবের নাম আজিম উস্‌সান। তাঁহার সহিত দেওয়ান মুর্শিদ কুলি খাঁ'র বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। মুর্শিদ নবাবের দুর্ব্যবহারের কথা সম্রাটের নিকট লিখিয়া পাঠান। সম্রাট ঔরঙ্গজেব আজিম উস্‌সানের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহারে যাইতে

আদেশ করেন। আজিম উস্মানের গমনের পর হইতেই ঢাকার গৌরব লুপ্ত হইল এবং ঢাকা কেবল বঙ্গের তদানীন্তন নবাব নাজিমের আবাসমাত্র রহিল।

ইংরাজ, ফরাসী ও দিনেমারগণের ঢাকায় কুঠী ছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ফরাসীগণের কুঠী অধিকৃত করেন। দিনেমারগণের কুঠী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়।

সুন্দর সুন্দর বস্ত্র, নীল, গুবাক, পাট, সাবান, চর্ম্ম, শাঁখা, অলঙ্কার, তাম্রনির্ম্মিত বাসন প্রভৃতি সামগ্রী ঢাকা হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হইত। ঢাকার মসলিন বিশেষ বিখ্যাত ছিল। নিম্নে ঢাকার কয়টি প্রধান অট্টালিকার বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

বড় কাটরা—লালবাগ-গড় হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বদিকে নদীর উত্তরপার্শ্বে এই সুদৃশ্য হর্ম্ম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের রাজত্ব-কালে দেওয়ান মীর আবদুল কাসেম কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার ক্ষোদিত-লিপি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ইহা প্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল।

হুসেনি দালান—১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নৌসেনার অধিনায়ক মীর মুরাদ এই হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করান। এই স্থানে বৎসর বৎসর আড়ম্বরসহকারে মহরম হইয়া থাকে।

লালবাগ-দুর্গ—১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মহম্মদ আজম কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। কিন্তু দুর্গনির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া মারাট্টাযুদ্ধে যোগদান করেন। শায়েস্তা খাঁ'র প্রিয়তম কন্যা বিবি প্যারীর মৃত্যু হইলে তিনি লালবাগে সমাধিস্থ হয়েন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁ'কে লালবাগ জায়গীরস্বরূপ অর্পণ করেন।

চকমসজিদ—চকমসজিদে নবাব নাজিমগণ আসিয়া উপাসনা করিতেন। মস-জিদের ক্ষোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ এই মসজিদ নির্ম্মাণ করান। মসজিদের উপরিভাগে তিনটি গম্বুজ আছে।

বিবি প্যারীর সমাধিমন্দির—মার্ব্বল ও চুনার প্রস্তরে ইহার মধ্যবর্ত্তী সমাধি-কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। শায়েস্তা খাঁ'র কন্যা এই স্থানে সমাহিতা। পূর্ব্ববঙ্গে এরূপ সুদৃশ্য প্রাসাদ আর নাই।

লালবাগ মসজিদ—মসজিদটি প্রকাণ্ড। এরূপ মসজিদ পূর্ব্ববঙ্গে আর দৃষ্ট হয় না। ইহা যুবরাজ ফরাকসায়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৭০৩ হইতে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহার নির্ম্মাণ-কাল নির্দ্দেশ করা হয়।

মণিহার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া চাঁদসিং ধরমপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ধরমপুরের সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি শান্তি লাভ করেন নাই। যে মণিহারের জন্য তিনি এত অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় করিলেন, সে মণিহার কোথায়? চরগণ দুই তিন বৎসর সন্ধান করিয়া বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের ফিরিবার পর তিনি যেন মণিহার পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিক বাসনা কিন্তু অন্যরূপ। সেই মণিহার আনিয়া যে কেহ ধরমপুর-রাজ্য প্রতিদানস্বরূপ চাহিলে তিনি হাসিমুখে রাজ্য দান করিয়া মণিহার লইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইতে স্বীকৃত আছেন। তিনি প্রজাদিগকে তাঁহার মনের ঐকান্তিক বাসনা জানিতে দেন নাই, ধরমপুরের সামন্ত ও কর্ম্মচারীদিগকে নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। কেবল মন্ত্রীর পদটি নিজরাজ্যের লোককে দিয়াছেন। কারণ, মন্ত্রীর কোন পুত্র সে পদ লইতে স্বীকৃত হয়েন নাই।

সকলের সহিত তিনি সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বৈদেশিক রাজা যে সিংহাসনে বসিয়াছেন, প্রজার এরূপ মনে হয় না। লোকের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে তিনি দক্ষ।

"এত উৎকোচ দিব, রাজকন্যা ও মণিহার কোথায় বল", এমন কথা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। জনসাধারণ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, সে দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য আছে।

মণিহারের ও রাজকন্যার কথা তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন মনে করিয়া প্রজারা মন্ত্রী ও রাজকন্যার জন্য নিরুদ্বিগ্ন। কিন্তু তাহাদের মনের বেদনা দূর হয় নাই। এ পর্য্যন্ত তাহারা মন্ত্রীর বা রাজকন্যার কোন সন্ধান পায় নাই। তাঁহারা জীবিত কি মৃত, ইহাও তাহারা জানে না। দশ বৎসর অতীত হইল, তাহারা কোন সংবাদই পাইল না—ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যদিও নব রাজার শাসনাধীনে তাহারা সুখে আছে, তবুও তাহাদের হৃদয়ের আকুল আহ্বান ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সিংহাসনের অধিকারিণী সেই ক্ষুদ্র রাজকন্যাকেই ডাকিতেছে। তাহারা তাহারই জন্য কাঁদিতেছে।

মন্ত্রীর স্ত্রী স্বামীর কোন সংবাদ না পাইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় ছয় বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, তাহার পর কালের কোলে জীবন দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

মন্ত্রীর তিন পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে এখন দুই কন্যা ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটি জীবিত। মাতার মৃত্যুর পর, দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র রামলাল ভগিনীপতিদ্বয়ের উপর বিষয়রক্ষার ভার দিয়া এক বৎসর হইল পিতার সন্ধানে বাহির হইয়াছে।

চাঁদসিং মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রকে নিজরাজ্যে পাঠাইবার অছিলায় মণিহার ও রাজকন্যার সন্ধানে পাঠাইয়াছেন। সে-ও আজ কয়েক বৎসর হইল। তাহারা নানা দেশে ঘুরিতেছে, এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ পায় নাই। তাহারা পিতাকে সে কথা লিখিতেছে। কিন্তু চাঁদসিং ফিরিতে আদেশ প্রদান করেন নাই, পরন্তু পৃথিবীর প্রান্ত অবধি ঘুরিতে আদেশ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যত অর্থ চাই, লিখিও। ফিরিবার সঙ্কল্প ত্যাগ কর। আমার সাধ পূর্ণ কর। মণিহার আনিতেই হইবে। চেষ্টা করিলে নিশ্চয় সন্ধান পাইবে।"

রাত্রি দশটা। নীল নভোমণ্ডলে অগণ্য তারকা ঝক্‌মক্ করিয়া জলিতেছে। এক একটা বাদুড় উড়িয়া চলিয়াছে। পেচকরা আনন্দে বাসা হইতে বাহির হইতেছে। গ্রাম্য কুকুরগুলি পথে পথে ফিরিতেছে। কুকর্ম্মীরা উৎসাহে অন্ধকারে পেচকদিগের মত পথে পথে ঘুরিতেছে। চৌকীদার বড় বড় কর্ম্মচারীদের গৃহদ্বারে হাঁক ছাড়িয়া ফিরিতেছে। এই অন্ধকারে রাজবাটীর শোভা অপরূপ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পরিবেষ্টিত, তাহার মধ্যে শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রাসাদের গম্বুজের আলোকগুলি পথের কতক দূর অবধি পতিত হইয়া আলো-আঁধারে এক অপরূপ মাধুরী বিস্তার করিতেছে।

রাণী রত্নমালা রৌপ্য-পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় শয়ান। পরিচারিকা শিয়রে দাঁড়াইয়া ব্যজন করিতেছে। রৌপ্যের সামাদানে বাতি জলিতেছে। দুইটি কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণের ফুলদানে রক্ষিত গোলাপের তোড়া সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ বিকীরণ করিতেছে। গৃহেরচতুর্দ্দিকে সোণার ফ্রেমে বাঁধান বড় বড় আয়না অনিন্দ্যসুন্দরী রাণীর মূর্ত্তি বুকে ধরিয়া রহিয়াছে। রাজার প্রতীক্ষায় রাণী এখনও নিদ্রা যায়েন নাই।

রাজা চাঁদসিং কক্ষে প্রবেশ করিতেই রাণী পরিচারিকাকে বিদায় দিলেন। সপ্রেম কটাক্ষে রাণীর দিকে চাহিয়া চাঁদসিং পালঙ্কে উঠিলেন। তাম্বুলাধার হইতে রাজার হস্তে তাম্বূল দিয়া রাণী ধীরে ধীরে তাঁহাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন।

রাজা বলিলেন, "রাণী আজ প্রতাপের ও শঙ্করের চিঠি আসিয়াছে। তাহারা ভাল আছে। তাহারা লিখিয়াছে, এইবার দুই জনে দুই দিকে গিয়াছে।"

গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া রত্নমালা বলিলেন, "এক সঙ্গে ত বেশ ছিল। তবু পরস্পরকে দেখিতে পাইত। ছাড়াছাড়ি হইয়া ভাল কায করে নাই। আপনি পুনরায় তাহাদিগকে এক সঙ্গে মিলিতে আদেশ দিউন।"

"যখন আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া দূর-প্রবাসে ঘুরিতেছে, তখন একা আর স্বতন্ত্র কি? আর তাহারা যে যুক্তি ঠিক করিয়াছে, তাহা উত্তম। এক দিকে দুই জনে ঘুরিলে ফিরিতে অনেক বিলম্ব অনিবার্য্য। তদপেক্ষা এক জন এক প্রদেশে, অন্য জন অন্য প্রদেশে যাইলে উভয়েই শীঘ্র ফিরিতে পারিবে।"

"মহারাজ এত দিন আপনার কোন সঙ্কল্পে আমি বাধা প্রদান করি নাই। আজ আমার একটি অনুরোধ রাখিবেন কি?"

"বল, রাণী, কি অনুরোধ— রাখিবার মত হইলে নিশ্চয়ই রাখিব।"

"মহারাজ,আমার ইচ্ছা, বাছারা গৃহে ফিরিয়া আইসে। রাজপুত্র হইয়া বিদেশে অযত্নে আর কত দিন ঘুরিবে? এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান ত মিলিল না, এমন কি, সামান্য একটি সূত্রও পাওয়া যাইতেছে না, যাহাতে সন্ধানের সুবিধা হইতে পারে। কত দিন বাছাদের দেখি নাই! মা'র প্রাণ আর কত দিন স্থির হইয়া থাকিতে পারে।"

গম্ভীর স্বরে চাঁদসিং উত্তর করিলেন, "রাণী, তুমি কি আমায় মণিহারের আশা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছ? যে মণিহারের জন্য দিবারাত্রি অশ্ব-পৃষ্ঠে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছি, যে মণিহারের জন্য এত অর্থ ও সৈন্য নষ্ট করিয়াছি, সেই মণিহারের বাসনা ত্যাগ করিতে বলিতেছ? নীরব কেন, রাণী? বল, তাহাই যদি তোমার অভিলাষ হয়; কল্যই আমি পত্র লিখিয়া তোমার প্রতাপ ও শঙ্করকে আনাইব।"

"মণিহারের বাসনা কি ত্যাগ করিতে বলিতেছি, মহারাজ? আমার ইচ্ছা, প্রতাপ ও শঙ্কর ফিরিয়া আসুক; আর কেহ যাউক।"

"অগ্রে চরই গিয়াছিল। তাহার পর কত দিন ভাবিয়া তবে ত আমি প্রাণাধিক পুত্রদিগের হস্তে সে কার্য্যের ভার ন্যস্ত করিয়াছি। এ কার্য্যে আর কাহাকে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইব? তুমিই বল। পিতার আশা পুত্র মিটাইবে না? পিতার কার্য্য পুত্র করিবে না? এই মণিহারের জন্য কত রাজা রাজ্য, ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। ধরমপুরের তোরণ হইতেই তাহারা ফিরিয়াছে। আর, আমি সেই রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহার ধন পাইয়াছি; তাহার পূর্ব্বাধিকারীকে বিনষ্ট করিয়াছি। একটি ক্ষুদ্র বালিকা অজ্ঞাতবাসে রহিয়াছে। তাহার সহিত একটি বৃদ্ধ পুত্রপরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কত ভয়ে,কত কষ্টে কালযাপন করি-

তেছে। এতগুলি পাপ যাহার জন্য সঞ্চিত করিয়াছি, যাহার লোভে কত লোকের মনঃকষ্টের কারণ হইয়াছি, তাহার আশা ছাড়িব, রাণী? এত দূর অগ্রসর হইয়া কি ফিরিব? তুমি ত তোমার সন্তানদের কুশল সংবাদ পাইতেছ। মন্ত্রী যে রাজকন্যার সহিত গিয়াছে, তাহার কষ্টের কথা ভাবিয়া দেখ দেখি। সে তাহার পুত্রকন্যা কাহারও সংবাদ পায় না। প্রভুকন্যাকে লইয়া, প্রভুর আদেশে কোন নিভৃত প্রদেশে বাস করিতেছে, কে জানে? যদি সে কখন ফিরিয়া আইসে, সাধ্বী পত্নী, প্রিয়তম পুত্রদ্বয় ও কন্যাদ্বয়কে আর দেখিতে পাইবে না। তবুও প্রভুকন্যার মঙ্গলের জন্য মৃত প্রভুর আদেশ স্মরণ করিয়া সে লুক্কায়িত আছে। আর আমার পুত্রদ্বয় কি পিতার জন্য এই কষ্টটুকু সহিতে পারিবে না?"

"ক্ষমা করুন, মহারাজ, অন্যায় কথা বলিয়াছি। আমার কথা আমি প্রত্যাহার করিতেছি। ভাল, মহারাজ, রাজকন্যাকে পাইলে কি করিবেন।"

"তোমার কি ইচ্ছা, রাণী? বল। পরে আমার মত জানিবে।"

"আমার ইচ্ছা—প্রকাশ করিব? তবে বলুন, মহারাজ, অন্যায় বলিলে বিরক্ত হইবেন না।"

"সর্ব্বদা রাজকার্য্যে আমার হৃদয় বড় কঠিন হইয়াছে, ভাবিয়াছ? সেই জন্য আমার কাছে একটি ইচ্ছা প্রকাশ করিতেও তুমি ভয় পাইতেছ। ভয় নাই; বল, বিরক্ত হইব না।"

"আপনার হৃদয় কঠিন? আমারই বুদ্ধি অল্প, সেই জন্য ভয় পাইতেছিলাম। আপনার হৃদয় কোমল বলিয়াই ত আপনি এ রাজ্যের প্রজাদিগকে বশ করিতে পারিয়াছেন। তাহা না হইলে তাহারা নিশ্চয়ই বিদ্রোহী হইত।"

"ও কথা থাকুক, রাণী! তোমার ইচ্ছা কি বল।"

"যদি রাজকন্যাকে পাওয়া যায়, তাহার রাজত্ব তাহাকে দিয়া আমরা স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব। আহা, পিতৃমাতৃহীনা রাজ্যভ্রষ্টা বালিকা না জানি কত কষ্টই পাইতেছে!"

"আমারও ঐ বাসনা, রাণী। মণিহার লইয়া তাহার রাজ্যে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমরা চলিয়া যাইব।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—oo—

পর্ব্বতের তলদেশে দেবদারু বৃক্ষের ছায়ায় জ্যোৎস্না দাঁড়াইয়া আছে। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত একখানি ছবির মত তাহার লাবণ্যরাশি উছলিয়া পড়িতেছে। শুভ্র নিটোল ললাটে কুঞ্চিত কেশগুলি পড়িয়া মুখের সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। রাজকন্যার মতই ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্না আজ পাহাড়ীদের কাছে বিদায় লইতেছে। যদিও সে এত দিন কাহারও সহিত মিশে নাই, কাহারও সহিত বাক্যালাপ অবধি করে নাই, তবুও তাহার কি একটি আকর্ষণ ছিল, জানি না, তাহাকে বিদায় দিতে সকলেই কাতর হইতেছে। বালকবালিকারা অবধি বিষণ্ণমুখে তাহার পানে চাহিয়া আছে। মুন্না পিতার চাদর চাপিয়া ধরিয়াছে ও তাহার সহিত যাইবার জন্য বায়না করিতেছে। প্রবাস হইতে সুন্দর সুন্দর খেলনা, গহনা আনিয়া দিবার লোভ দেখাইয়া জহর মুন্নাকে নিবৃত্ত করিতেছে। একমাত্র কন্যাকে ছাড়িয়া সুদূর প্রবাসে যাইতে হইবে বলিয়া জহর ব্যথিত হইতেছে। কারণ, মুন্নাকে ছাড়িয়া সে কখনও কোথায় যায় নাই, কেবল বৃদ্ধের সেই অন্তিম অনুরোধ রাখিতে সে যাইতেছে। মন্ত্রী তাহাকে যে অর্থের লোভ দেখাইয়াছিলেন, কেবল সেই অর্থলোভে সে কখনও যাইত না। বৃদ্ধের অনুরোধ ও অনাথার উপকারের জন্যই জহর স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া যাইতেছে। সকলে যখন কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল ও জ্যোৎস্না জহরের সহিত অগ্রসর হইল, তখন জ্যোৎস্নার স্থৈর্য্যও টুটিয়া গেল। আপনার ক্ষুদ্র কুটীরের দিকে চাহিয়া সে বদ্ধকরে উদ্দেশে মন্ত্রীকে প্রণাম করিল। যে কর্ত্তব্যপরায়ণ স্নেহশীল বৃদ্ধ তাহাকে বক্ষে ধরিয়া এই অজ্ঞাতবাসে আসিয়াছিলেন, তিনি আজ কোথায়? তাঁহার স্ত্রী-পুত্রদিগের সহিত যখন তাহার দেখা হইবে, তখন জ্যোৎস্না তাহাদের প্রশ্নের কি উত্তর দিবে? যে মণিহারের জন্য পিতা প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাহার জন্য মন্ত্রী বান্ধবহীন হইয়া বিদেশে প্রাণত্যাগ করিলেন, সেই মণিহার সে এই দীর্ঘ পথে লুকাইয়া সাবধানে লইয়া যাইতে পারিবে কি? তুমি ফিরিয়া আইস—তুমি যেমন করিয়া তাহাকে বক্ষে ধরিয়া আনিয়াছিলে, তেমনই বক্ষে করিয়া রাজ্যে লইয়া চল।

জ্যোৎস্নার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। জহর আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইতেছিল। জ্যোৎস্নার ক্রন্দন

শুনিয়া ফিরিয়া, সস্নেহে তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, "কাঁদিও না। নিজের দেশে যাইতেছ, কত আনন্দ! যাইয়া হয় ত ভাই, ভগিনী, কত আত্মীয়-স্বজন পাইবে।"

কাতর স্বরে জ্যোৎস্না বলিল, "আমি ত চলিতে পারিতেছি না। মন যেমন অবসন্ন হইয়াছে, পদও তেমনই অবসন্ন হইতেছে। সারা পথ আমি চলিতে পারিব না।"

"মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতে করিতে ক্রোশখানেক চল। তাহার পর চলিতে হইবে না। গাড়ী বা পাল্কী পাওয়া যাইবে। আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া আমাদের গ্রামের নিকটে গাড়ী-পাল্কী কিছুই নাই। গ্রামান্তরে পাওয়া যাইবে। সম্মুখের গ্রামে দুই একখানি গাড়ী-পাল্কী আমাদিগের জন্য আছে, অধিক নাই। আমরা ভাড়া করিব। যত ভাড়াই লাগুক না কেন, ভাবনা নাই। তোমার পিতা পথ-খরচের যথেষ্ট টাকা আমায় দিয়া গিয়াছেন।"

কত নগর, কত গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া জহর জ্যোৎস্নাকে লইয়া বিশালাক্ষী গ্রামে পৌঁছিল। এই গ্রামে জহরের ধর্ম্মমাতা বাস করিতেন। শীঘ্র তথায় পৌঁছিবার আশায় এত দিন সে কোন স্থানে এক দিনের অধিক থাকে নাই। কিন্তু শরীর এমন অবসাদে পূর্ণ হইয়াছে যে, কিছু দিন বিশ্রাম না করিলে আর পথ চলা দায়। জ্যোৎস্নাও এই পর্য্যটনে কৃশা হইয়াছে। তাহার বালিকাসুলভ চঞ্চলতা যুবতীর গাম্ভীর্য্যে পরিণত হইয়াছে। কৃশ হইয়া তাহাকে অল্প লম্বা দেখাইতেছে। তাহাতেও তাহার সৌন্দর্য্য-হ্রাস হয় নাই।

ধর্ম্মমাতা লুসিয়া জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যের খুব প্রশংসা করিল। সযত্নে জ্যোৎস্নার ধূলিমলিন দেহ ধৌত করিতে গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐটুকু মেয়ের বড় গোঁ! কিছুতেই সে তাহাকে স্নান করাইতে দিল না, এমন কি, তাহার সম্মুখে গাত্রা-বরণ খুলিতেও সম্মত হইল না। পিতামহীর বয়সী স্ত্রীলোককে প্রারব্ধযৌবনা বালিকার এত লজ্জার কারণ কি? কিছু না—শুধু গোঁ—ইহাই সাব্যস্ত করিয়া লুসিয়া বিরক্ত-মনে স্নানাগার হইতে চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

লুসিয়ার নিজের পুত্রকন্যা কিছুই ছিল না। লথীয়া বলিয়া একটি ভগিনী-কন্যা ছিল সে-ই তাহার স্নেহের পাত্রী। তাহার বড় লোকের বাটীতে বিবাহ হইয়াছে, কাযেই সে মাসী-মাতার বাটীতে বড় আসিতেও পারিত না, মাসান্তে এক দিন আসিত, সেই দিনই চলিয়া যাইত।

এক মাস জ্যোৎস্না লুসিয়ার গৃহে রহিয়াছে। কল্য যাত্রা করিবার দিন ছিল, কিন্তু লুসিয়ার অনুরোধে জহর পরশ্ব দিন ঠিক করিয়াছে। কল্য লথীয়ার আসিবার দিন। এই অপরূপসৌন্দর্য্যশালিনী, মিষ্টভাষিণী জ্যোৎস্নাকে লথীয়া দেখিবে

না? লুসিয়ার বাটী জ্যোৎস্নার বড় ভাল লাগিয়া গিয়াছিল। কোন লোকের সমাগম নাই। একটি বৃদ্ধা ব্যতীত দ্বিতীয় লোক নাই। কেমন সুন্দর। তাহার মণিহারটির জন্য কোন ভয় নাই। এত দিন পান্থনিবাসে সে কিরূপ ভয়ে ভয়ে ঘুরিয়াছে। জামার ভিতর বুকে সেই মখমলের বালিসটিতে কতবার হস্ত দিয়া দেখিয়াছে। সেটি বাহির করিতে হইবে বলিয়া অর্দ্ধেক দিন স্নান করে নাই। এখনও সে নিশ্চিন্তভাবে দিন কাটাইতেছে।

যে দিন লথীয়া আসিল, সেই দিন মুন্নার কঠিন পীড়ার সংবাদ আসিল। পরদিন ধরমপুর অভিমুখে যাওয়া হইবে বলিয়া স্থির ছিল। যদি আর অল্প পথ হইত, তবে জহর জ্যোৎস্নাকে ধরমপুরে পৌছাইয়া দিয়া দেশে রওনা হইত। এখনও পঞ্চদশ দিন গমন করিলে তবে তাহারা ধরমপুরে পৌছিতে পারিবে। কাযেই লুসিয়ার কাছে জ্যোৎস্নাকে রাখিয়া জহর দেশে রওনা হইল। পরচপত্র লুসিয়ার হস্তে দিয়া জহর বলিল, "আমি নিজে কিংবা আমার পত্র লইয়া কোন লোক আসিলে তবে তাহার কাছে জ্যোৎস্নাকে দিবেন। বিশ্বাসী লোক ব্যতীত যৌবনোন্মুখী বালিকাকে কাহারও হস্তে সমর্পিত করিতে পারিব না। উহার পিতার শেষ অনুরোধ যত দিন না পূর্ণ করিতেছি, তত দিন আমি শান্তি পাইব না। আর, জ্যোৎস্না খুব বড় লোকের কন্যা, উহাকে এ পাড়ার কোন বালিকা বা যুবতী কাহারও সহিত মিশিতে দিবেন না। কারণ, উহার পিতার সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। যেমন ভাবে এক মাস আপনার কাছে আছে, তেমনই ভাবে রাখিবেন।"

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জ্যোৎস্নার নীল নয়ন জবাফুলের রাগ ধারণ করিল। দেশে যাইতে আবার বিলম্ব হইবে! যদিও দেশে তাহার পিতা—মাতা—ভ্রাতা—ভগিনী, কেহই নাই, তবুও সে যে তাহার স্বদেশ! তাহার পিতার যে শেষ ইচ্ছা, সে সিংহাসনে বসিবে। রাজকন্যা হইয়া এ কোথায় কি ভাবে পরাশ্রয়ে সে দিনযাপন করিতেছে? অমূল্য মণিহার কত সাবধানে জামার ভিতর লইয়া ফিরিতেছে? স্বদেশে যাইলে, উত্তম স্থানে মণিহার রাখিয়া সে নিশ্চিন্ত-মনে বেড়াইতে পারিবে, অন্ততঃ শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিবে। এ যে সর্ব্বদা ভয়—ঘুমাইতে ঘুমাইতে জাগিয়া সে বক্ষে হস্ত দিয়া দেখে, মণিহার যথাস্থানে আছে কি না? জহর জ্যোৎস্নাকে সান্ত্বনা দিল এবং মুন্না একটু সারিলেই ফিরিয়া আসিবে, এই আশ্বাস দিয়া যাত্রা করিল। বেদনা-কাতরা জ্যোৎস্না সাশ্রু-নয়নে জহরের যাত্রা দেখিল। সেই পাহাড়ে— তাহার সেই শান্তি-নিকেতনে জহর চলিল। আর জ্যোৎস্না একা একেবারে একা—পরাশ্রয়ে রহিল। জহর মন্নার পক্ষ ছিল বলিয়া জ্যোৎস্না তাহাকে আত্মীয়ের মত ভাবিত। রাত্রি শয়নকালে সে

যুক্তকরে ভগবান্‌কে বলিল, "তোমার কাছে পিতা আমায় দিয়া গিয়াছেন, তুমি দেখিও প্রভু! তুমি করুণা করিয়া আমায় রক্ষা করিও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লখীয়া আসিল। কথা কহিবার লোক পাইয়া জ্যোৎস্না আনন্দিত হইল। লখীয়া বারংবার জ্যোৎস্নার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। সারাদিনই লখীয়া ও জ্যোৎস্না কথোপকথন করিল। অপরাহ্ণে লখীয়া এক জন বাল্যসখীর সহিত দেখা করিতে যাইবে বলিয়া সজ্জিত হইল এবং জ্যোৎস্নাকেও তাহার সঙ্গে লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। জ্যোৎস্না কিন্তু তাহাতে সম্মতি হইল না। এই ফুটফুটে মেয়েটিকে সখীকে দেখাইবার জন্য লখীয়ার বড় আগ্রহ হইয়াছিল, সেই জন্য জ্যোৎস্নাকে সে অনেক অনুরোধ করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। সারাদিন তাহার সহিত গল্প করিয়া লখীয়া খুব আনন্দিত হইয়াছিল। এখন তাহার অসম্মতিতে তাহাকে অহঙ্কারী মনে করিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিতভাবে একাকী সখীর ভবনে গমন করিল। রাত্রিতে শ্বশুরবাটী যাইবার সময় লখীয়া তাহার প্রীতিবন্ধনস্বরূপ একটি অঙ্গুরী জ্যোৎস্নাকে দিল। জ্যোৎস্না তাহার প্রশান্ত নীল নয়নদ্বয়ের দৃষ্টি লখীয়ার মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "ইহা লইয়া আমি কি করিব?"

সে বলিল, "এটি আমার বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তোমায় দিলাম। যখন আমাদের বাটী হইতে তুমি তোমার দেশে যাইবে, ইহা আমাকে তোমার স্মরণপথে আনয়ন করিবে।"

জ্যোৎস্না অঙ্গুরীটি লখীয়াকে প্রত্যর্পণ করিয়া সহাস্যে বলিল, "তোমাদের যত্ন আমার চিরদিনই মনে থাকিবে। আমি কখনও তোমাদিগকে বিস্মৃত হইব না। স্মরণের জন্য অলঙ্কার দিতে হইবে না।"

লখীয়া মাসীমাতার কাছে শুনিয়াছিল, জ্যোৎস্না খুব ধনীর কন্যা, সে অঙ্গুরী ফিরাইয়া দেওয়াতে ভাবিল, "ঐ রূপই যা আছে। ধনীর কন্যা বলিয়া মন অহঙ্কারে পূর্ণ। আমিও ধনীর বধূ। কিন্তু কখনও বন্ধুর উপহার প্রত্যাখ্যান করি নাই।"

মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করিয়া হাসিমুখে লখীয়া বলিল, "আমাদের সৌভাগ্য, যদি তুমি মনে রাখ। আমরা আর কি করিতেছি? নিজের পয়-

সায় খাইতেছ, পরিতেছ। কেবল মাসীমা'র তত্ত্বাবধানে আছ বই ত নয়। তবে আসি।"

"এবার একটু শীঘ্র আসিও, দিদি। আজ সারাদিনটি বেশ আনন্দে কাটিয়াছে।"

এইবার লখীয়া বড়মানুষী চাল চালিবার অবসর পাইল। সে গম্ভীর-মুখে উত্তর করিল, "আমার ত ইচ্ছা মাসীমা'র কাছে ঘন ঘন আসি। কিন্তু আমার শ্বশুর বধূদের বাপের বাটী পাঠাইতে ভালবাসেন না। দাদা-শ্বশুরের আমলে নাকি আরও কড়া হুকুম ছিল। আমার শাশুড়ী বৎসরে একবার করিয়া বাপের বাটী যাইবার অনুমতি পাইতেন।"

আগমনী ও বিজয়া।

কেন এত হাসি ?

কা'র তরে উছলিছে আনন্দের রাশি ?
কচি মুখখানি কা'র উঠেছে ভাসিয়া
সকল কর্ম্মের মাঝে ; এ ব্যথিত হিয়া
ভুলিয়াছে শোক দুঃখ ? স্নেহের এ ছায়
ফিরে কি এলি রে বাছা ! আয় তবে আয়,
আমার হারাণো ধন ! ভুলে যা'ব সব
অন্তরের মাঝে তোরে করি' অনুভব
একটি দিনের তরে। তা'র পরে যবে
কাঁদাইয়া গৃহ মোর হাহাকার রবে
চলে যা'বি, নিয়ে যা'বি, সর্ব্বস্ব আমার ;
রিক্ত আমি, রবে শুধু তপ্ত আঁখিধার।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

বড় বৌ।

——oo——

(১)

বড় বৌ ভারি চালাক। সংসারের খরচপত্রের ভারটা তাহার ঘাড়ে। ছোট বৌ রাঁধিতেবাড়িতে মজবুত, কাযে আলস্যবোধ নাই, কিন্তু বড় নেকাবোকা। সে খাইতে বসিবে,এমন সময়ে কেহ যদি আসিয়া বলিল,"মা, আজ খেতে পাই নাই," তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাহার নিজের অন্ন-ব্যঞ্জন তাহাকে দেয়। এই ত তাহার বুদ্ধি! বড় বৌ কিন্তু সে রকমের আব্দার আদৌ সহ্য করে না; ভিখারী দেখিলে বলে, "কেন, খেটে খাও না।" মেয়েমানুষ এতটুক বুদ্ধিমতী না হইলে কি ঘরকন্না চলে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানি ছাড়পত্র না পাইয়াও বড় ভাই অমর কলিকাতার কোন সওদাগর আফিসে বড় বাবু,—আয় ভালই। ছোট ভাই অজয় সচ্চরিত্র, সদালাপী, লোকপ্রিয়, কিন্তু ঘরকন্নার খোঁজ-খবরের ধার ধারে না, সে জানে, দাদা থাকিতে তাহার চিন্তার কোন দরকার নাই। তাহার আরও এক বিশেষ গুণ ছিল, আধ হাত দূরে বৌদিদি দাদার পাতে নানাবিধ ব্যঞ্জনের স্তূপ সাজাইয়া দিলেন, আর তাহার ডাল, চড়চড়ি, ভাত, কখন বা দুই এক টুকরা মাছের কাঁটা,—তাহাতেই সে সন্তুষ্ট। রাঁধাবাড়ার ভার ছোট বৌর উপর থাকিলেও বড় বৌ পূর্ব্বেই তাহাকে উপদেশ দিয়াছিল যে, ঘরে লোক না থাকিলে অন্যান্য কাযকর্ম্ম করিতে যদিও ভাসুরের সম্মুখে যাইতে হয়, পরিবেশনটা একান্ত নিষিদ্ধ; ইহা তাহার নিজের কথা নহে, বাপের বাড়ীর গ্রামে ভদ্রপরিবারমাত্রেই সে ইহা দেখিয়া আসিয়াছে। আসল কথাটা এই যে, যে লোকটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পয়সা রোজগার করে, তাহার সহিত তাহার মুখাপেক্ষী একজনের কোন বিষয়েই, বিশেষতঃ খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে এক দর হইতে পারে না! ছোট বৌকে বিশ্বাস কি? সে ত' অজয়ের পাতে সব সমান দিতেও পারে! সুতরাং রাঁধা শেষ হওয়ার সংবাদ যেমন বড় বৌকে দেওয়া হইত, সে অমনই আসিয়া বলিত, "আঃ! মাছগুলো ভেঙ্গে ফেলেছ? ডালটার রং একেবারে ফ্যাকসা; দেখ ছোট বৌ! একটু মন দিয়ে রান্না-বান্না করো।" মুখের কথা চলিতেছে, এ দিকে মাছের ঝোলের মাছগুলি, দধির মাথা, ঝোলের শেষ ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বড় বৌ নিজের ও স্বামীর জন্য পৃথগ্‌ভাবে সরাইয়া রাখিত। তখন আবার রন্ধনশালার ভার ছোট বৌর হাতে। অবশিষ্ট

মাত্র থাকিল, তাহাতেই তাহাকে চালাইতে হইবে। বড় বৌর নির্দ্দেশমত ভাল ব্যঞ্জনের মাত্রা এতদূর নিক্তির ওজনে হইত যে, তাহা অমর ও বড় বৌ ছাড়া অন্যের কুলাইত না।

দোষ বা গুণ যাহাই বল, অজয় পরের কাযে বড় লাফালাফি করিত। এইমাত্র খাইয়া বসিয়াছে, পাড়ার সাধু খুড়ো আসিয়া জানাইলেন, কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে একটা লোক পাঠাইতে হইবে। অজয় সেই মধ্যাহ্নে মাথায় ছাতা নাই, পায়ে জুতা নাই, ছুটিল। রমেশের কলেরা হইয়াছে, অন্যে সে দিকে যাওয়া দূরের কথা, আপন আপন ঘরে বসিয়া কপূরের নস্য গ্রহণ করিতেছে, অজয় কিন্তু সেই স্থানে হাজির,—আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুশ্রূষা করিতেছে। অমর এই সব জানিত, সময়ে সময়ে তিরস্কারের স্বরে বলিত, "ওরে! শরীরটে মাটী করিস্ না।" অজয় তখন চুপ করিয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিত। কিন্তু সে কতক্ষণ?

ঘরকন্না এই ভাবে চলিতেছিল। হঠাৎ অজয় একটা অন্যায় কায করিয়া বসিল। রাত্রি তখন ১১টার বেশী। যে গলির ভিতরে অমরের বাসা, সে গলিতে মিউনিসিপালিটীর আলোকদানের সুব্যবস্থা না থাকায় যত অন্ধকার গলির ভিতরে জমাট বাঁধিয়াছিল। ক্যাসিয়ার বাবুর বাসায় সে রাত্রিতে কি একটা কাযে অমর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে; বলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি ১২টা বাজিবে। বাড়ীর চাকর রামশরণ আহারের পর শয্যায় অঙ্গ ঢালিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে। উপরতলায় দুই বৌ আপন আপন ঘরে। বড় বৌর ঘরের আলো আসিয়া সদর-দ্বারের সম্মুখে পড়িয়াছে। ছোট বৌর ঘরের দিকে জানালার ফাঁক দিয়া কোন আলো দেখা যায় না,—তেমন সময় কোন দিনই সে ঘরে আলো থাকে না। অজয় পথে পায়চারি করিতেছিল, এমন সময়ে সদর-দ্বারে একখানি মুখ বাহির হইল, আবার সরিয়া গেল। অজয়ের দৃষ্টি সে দিকে পড়িল, সে ডাকিল,—"কে?" উত্তর নাই। অজয় ব্যস্তভাবে আবার ডাকিল,—"দোবে—ও দোবে!—চঞ্চলা! আলোটা নিয়ে আয় ত—চোর—" অজয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক বেগে বাড়ীর বাহিরে আসিল, কিন্তু অজয়কে সম্মুখে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। এ দিকে দোবে উঠিল, চঞ্চলা দাসী প্রদীপ লইয়া আসিল। এ কে? এ যে দাদার শ্বশুরের বিশ্বাসী চাকর—হারাধন! সে অজয়ের পরিচিত;—পূর্ব্বে অনেকবার আসিয়াছে। অজয় বিরক্তির স্বরে বলিল,—"ব্যাপার কি, হারাধন?" হারাধন যুক্তকরে বলিল, "ছোট বাবু! আমার কোন দোষ নেই। দিদিঠাকরুণ

কিছু টাকা কর্ত্তা ঠাকুরকে দিতে দিয়েছিলেন, তাই আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। বিশ্বাস না হয়, দিদি ঠাক্রুণকে জিজ্ঞাসা করেন।"

হারাধন বড় বৌকে দিদি ঠাক্রুণ ও তাহার পিতাকে কর্ত্তাঠাকুর বলিয়া ডাকিত। হারাধন একটি টাকার তোড়া অজয়ের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। চঞ্চলা তখন "হেই মা গো কি হবে! ছি! ছি!!" বলিয়া চলিয়া গেল। রামশরণ পুনরায় খাটিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। অজয়ও সদর-দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল।

বড় বৌ উপরের ঘর হইতে চঞ্চলাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের এত গোলমাল, ঝি!" চঞ্চলা বলিল, "কি জানি মা! কি সব কাণ্ড! ছোট বাবুর কাছে জানুন। আমরা মা! গরীব মানুষ—"

বড় বৌ লোকের কাছে পিতার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিতে ছাড়িত না বটে, কিন্তু তাহার বাপের বাড়ীর অবস্থা বড় শোচনীয় ছিল। পরদিন জমীদারের বাকী খাজনার দায়ে যে দুই এক বিঘা জমীজমা এখনও আছে, সে সমস্তই নীলাম হইয়া যাইবে, সেই জন্য এই রাত্রিতে বিশ্বস্ত ভৃত্য হারাধনের গুপ্তভাবে আগমন ও প্রত্যাগমনের বিফল চেষ্টা।

বড় বৌর সমূহ বিপদ্। অমর আসিয়া যখন এই সকল কথা শুনিবে, তখন উপায়? এ ত গেল এ দিকের কথা, ও দিকে আবার হারাধন টাকার তোড়াটা ফেলিয়া গিয়াছে, পরদিন টাকা দাখিলের আর ত কোন উপায় নাই! পিতা, মাতা, আর সেই স্নেহের ভ্রাতা যে পথের কাঙ্গাল হইল। লজ্জায় ও ক্রোধে বড় বৌ জ্বলিয়া উঠিল। সেই মুহূর্ত্তে সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল, অজয় ও ছোট বৌকে সে বাসা হইতে তাড়াইবে এবং তাহাদের স্থান পিতামাতার দ্বারা পূরণ করিবেই করিবে!

অজয়ের তলব হইল। অজয় বলিল, "বৌদিদি! হারাধন এসেছিল, তা বল্‌তে হয়।"

বড়বৌ বলিল, "তোমাকে বলে বুঝি সব কায করতে হবে? আমার বাপ তোমাদের মত ছোটলোক নন। শুধু শুধু তুমি হারাধনের অপমান করলে। আমি কি আর কখনো বাপের বাড়ীতে মুখ দেখাতে পারব?"

অজয় বলিল, "চট কেন, বৌদিদি? হারাধনের অপমান ত কিছুই করা হয় নাই।"

"তোমার নেকামি তোমাকেই সাজে। দেখ্‌ছি, কেমন ক'রে আলালের ঘরের দুলালের মত তুমি বেড়াতে পাও।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, সে পরে হ'বে, এখন এই টাকার তোড়াটা রেখে দাও। রাগ কর কেন, বৌদিদি? বল ত আমিই টাকাগুলো তাউই মশায়কে দিয়ে আসি।"

সক্রোধে বড় বৌ বলিল, "রেখে দাও তোমার ঠাট্টা। জান, ঘরে পাছে ভাঙ্গা যায় ব'লে বাবা টাকাগুলো আমার কাছে রেখে দিয়েছিলেন, দরকার হয়েছে ব'লে নিতে হারাধনকে পাঠিয়েছিলেন। আমার বাবা বুঝি তোমাদের কিছু তোয়াক্কা রাখেন?"

কথা কেবল বাড়িয়াই চলিবে, অতএব চুপ করিয়া চলিয়া যাওয়া ভাল, ইহা বুঝিয়া অজয় নীরবে নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেল। চঞ্চলা সব শুনিল, সে বুঝিল, তাহাকে দুই এক দিনের মধ্যে অন্য কোথায় চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে।

(২)

সে রাত্রিতে অমর যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল, তখন রাত্রি ১টা। তখনও বড় বৌ আলো জালিয়া বসিয়া আছে, তাহার গণ্ডদেশ অশ্রু-প্লাবিত। অমর অনেক সাধাসাধির পর শুনিল, অজয় মদ খায়। সে ক্যাসিয়ার বাবুর বাসায় যাওয়ার পর অজয় টলিতে টলিতে বাড়ী আসিয়া রামশরণ ও চঞ্চলার সাহায্যে বড় বৌর বাক্স খুলিয়া টাকার একটা তোড়া লইয়া পলাইবার উপক্রম করে, কিন্তু বড় বৌ জাগিয়া উঠায় ফেলিয়া দেয়! বড় বৌ সামান্য তিরস্কার করিয়াছিল বলিয়া নাকি অজয় বলিয়াছে যে, সে গোপনে বাপের বাড়ীতে টাকাকড়ি পাঠায়!—কি অপমানের কথা! অমর বড় বৌর কথাগুলা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করে নাই। কিন্তু বড় বৌ এমনই বুঝাইল যে, শেষে বিশ্বাস করিল, বড় বৌর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য!

প্রাতে অমর কিছুক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর রামশরণকে ডাকিয়া তাহার প্রাপ্য বেতন চুকাইয়া দিয়া জবাব দিল। চঞ্চলাকে তখন বিদায় দেওয়া হইল না, হঠাৎ ঝি কোথায় পাওয়া যায়?

সকালে উঠিয়া বড় বৌ ভারি ব্যস্ত, সে দিন সে নিজেই রাঁধিতে লাগিয়াছে। ছোট বৌ দুই একবার বলিল, "দিদি! তুমি বস, আমি রাঁধি।"

বড় বৌ নাক মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "না—গো—না, এখান থেকে যাও।"

ছোট বৌ সকল কথা শুনিয়াছে, নিজের ঘরে গিয়া গালে হাত দিয়া বসিল।

অজয় বাহিরের ঘরে গেল। অমর অজয়ের দিকে একবার বিরক্তি-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর স্নানের জন্য উঠিয়া গেল।

বেলা যখন ১২টা, তখন অজয় বাসায় আসিয়া দেখিল, রান্নাঘরে তালা লাগান। চঞ্চলা কাছে আসিয়া বলিল, "ছোট বাবু! উপরে যান।" অজয় তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছোট বৌ কাঁদিতেছে, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে? কাঁদ কেন?"

চোক মুছিয়া ছোট বৌ বলিল, "আজ তুমি কি খাবে?"

"কেন, আজ রান্না-বান্না হয়নি?"

"দিদি আজ নিজে রেঁধেচেন। আমি দু'বার গিয়েছিলাম, আমাকে কোন মতে রাঁধ্‌তে দেন নাই। বড়ঠাকুর আফিসে যাওয়ার পরে দিদি নিজে খেয়ে-দেয়ে রান্নাঘরে তালা দিয়েছেন। চঞ্চলাকেও দুটো ভাত দেন নাই।"

অজয় ধীরে ধীরে বড় বৌর ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বড় বৌ তখন দিব্য আরামে ঘুমাইতেছিল। অজয় ডাকিল, "বৌ দিদি!" বড় বৌ চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উঠিয়া বসিল, তাহার পর বিরক্তির সহিত বলিল, "কেন? কি দরকার তোমার এখন?"

অজয় ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দরকার এমন কিছু না, তবে বল্‌ছিলাম কি — আমাদের কিছু খেতে দেবে না?"

বড় বৌ হাত নাড়িয়া বলিল, "কে তোমাদের খেতে বারণ করেছে? তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে ওঁর হাত পা, পেটের ভেতর গিয়েছে। আফিসে যাবার সময় ব'লে গিয়েছেন - অজয় ঘুরে এলে বলো, সে যেন অন্য কোথাও যায়।"

"এ কথাটা দাদা আমাকে নিজে বল্‌লেই পারতেন।" বলিয়া অজয় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিল।

বড় বৌ উত্তেজিতস্বরে বলিল, "কেন, আমার কথাটা বুঝি গ্রাহ্য হ'ল না। বেশ, তবে আমার কাছে আসা কেন? দাদা! দাদা! যাও না আফিসে দাদার কাছে!"

অজয় বলিল, "তবে আজই দেশে রওনা হচ্ছি।"

বড় বৌ বলিল, "ও মা! দেশে যাবেন! কতবার জমীদারের খাজনা দিয়েছ, বাড়ী-ঘর মেরামত করেছ যে, দেশে গিয়ে দিব্যি বাবুর মত বিষয় ভোগ করবে?"

এমন কঠোরোক্তি অজয় আর কখনও শুনে নাই। তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, গলা ভার হইল। অতি কষ্টে মনের দুঃখ মনে চাপিয়া সে বলিল, "বেশ, বৌ দিদি, যথেষ্ট হয়েছে, আর কিছু বল্‌তে হবে না। আমরা দেশেও যাব না, তোমাদের বাসাতেও থাক্‌ব না। হাত পা আছে, খেটে খেতে পার্‌ব—" মাথা হেঁট করিয়া অজয় বড় বৌর ঘর হইতে বাহির হইল।

সে ছোট বৌর ঘরে প্রবেশ করিবে, এমন সময় চঞ্চলা তাহাকে ডাকিল। সে অজয়ের জন্য তৈল ও স্নানের জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। অজয় বলিল, "না, চঞ্চলা, এখনই আমাকে এ বাড়ী হ'তে যেতে হচ্ছে; এখন আর স্নান করিব না।"

চঞ্চলা মানিল না, বলিল, "উতলা হবেন না ;—আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

অজয় স্নানের পর কাপড় ছাড়িয়া দেখিল, চঞ্চলা তাহার ও ছোট বৌর জন্য খাবার আনিয়াছে। অজয় বলিল, "এ সব কেন?" কিন্তু সে চঞ্চলার কাতর অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না।

অজয়ের জল খাওয়া প্রায় সাঙ্গ হইয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে কে ডাকিল, "ছোট বাবু!"

"কে?"

"আমি নকু।"

"খবর কি? এ দিকে এস।"

নকু দাস ঘরের মধ্যে আসিয়া অজয়কে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনাকে একবার আমার বাড়ীতে যেতে হবে।"

অজয় বলিল, "কেন?"

নকু দাস বলিল, "আসুন ত একবার, বলছি।"

অজয় নকু দাসের অনুসরণ করিল। বাড়ীতে যাইয়া নকু দাস অজয়কে বসিবার আসন দিয়া বলিল, "দেখুন, বাবু! সেবার যখন আমার কলেরা হয়, আমার নিজের ত কেউ নাই, পাঁচ পর যা'রা সুসময়ে খুব আত্মীয়তা দেখায়, তারাও সে সময়ে একবার উঁকি মারে নাই। সেবার কেবল আপনার যত্নেই আমি বেঁচেছি।"

অজয় বাধা দিয়া বলিল, "সে কথা কেন?"

নকু দাস কিছু অপ্রতিভভাবে বলিল, "আজ্ঞে না—আপনার গিয়ে—সে কথা বল্‌ছি না। তবে শুনলাম, বড় বাবু নাকি আপনাকে অন্য জায়গায় যেতে বলেছেন। তা' বল্‌ছিলাম কি, দয়া ক'রে যদি এই গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলা দেন ত ভাল হয়।"

অজয় জিজ্ঞাসা করিল, "মাসিক কত ভাড়া লাগ্‌বে?"

নকু দাস সবিস্ময়ে বলিল, "সে কেমন কথা, ভাড়া! আমার এত বড় বাড়ী প'ড়ে আছে, আপনি হচ্ছেন গিয়ে ব্রাহ্মণ, দুটা ঘর ব্যবহার ক'র্‌বেন ব'লে আমি ভাড়া নেব?"

অজয় বলিল, "বুঝ্‌লাম। কিন্তু—আমি ছাড়া দেশে ত ঢের ব্রাহ্মণ আছে।"

নকু দাস জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাবেন ?"

অজয় বলিল, "দেখি, খাওয়া পরা চলে এমন এক্‌টা কায কি আমার জুট্‌বে না ?"

নকু দাস বলিল, "কিন্তু হঠাৎ কায কোথায় পাবেন ?"

অজয় বলিল, "সেটা বটে, হঠাৎ—"

নকু দাস বলিল, "আপনি অবসরমত আমার দোকানের খাতাপত্র দেখ্‌বেন, তার পরিবর্ত্তে আমি আপনার যা' কিছু খরচ, তা'র ভার নেব।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, আপাততঃ তোমার এখানেই থাকা যাক্ ?"

(৩)

অনতিবিলম্বে ছোট বৌ নকু দাসের বাড়ীতে আসিয়া ক্ষুদ্র সংসার পাতাইয়া বসিল। চঞ্চলা ছোট বৌর সঙ্গে আসিয়াছে। সে আর ফিরিয়া যাইতে চাহে না। অজয় বলিল, "চঞ্চলা! হঠাৎ দাদার বাসা ছেড়ে দিলে, দাদার যে ভারি কষ্ট হবে।"

চঞ্চলা উত্তর দিল, "আমি ত আর দাসখত লিখে দিই নাই। ইচ্ছে হ'ল না, গেলাম না।"

এ দিকে এত শীঘ্র পাপ বিদায় হইল দেখিয়া বড় বৌ বড় খুসী। এখন বাপ-মা'কে আনিতে হইবে।

অমর আফিস হইতে বাড়ী আসিবামাত্র বড় বৌ বলিল, "আর জান ?"

"কি ?"

"ঠাকুর পো ছোট বৌকে নিয়ে কোথায় চ'লে গিয়েছে।"

"সে কি কথা! কোথায় গেল ?"

"তা' কি আর আমাকে বল্‌লে ? তুমি আফিসে যাওয়ার পরই গাড়ী ডেকে এনে ছোট বৌকে যেতে বল্‌লে। আমি কত সাধাসাধি কর্‌লাম, কিছুতেই শুন্‌লে না। তোমাকে আমাকে যা' তা' ব'লে গালাগালি দিয়ে চ'লে গেল।"

অমর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া অফিসের পোষাক খুলিতে খুলিতে বলিল, "ঝি কোথায় ?"

"বল্‌ব কি আর দুঃখের কথা, সে-ও সেই সঙ্গে গিয়েছে।"

অজয় যে পাপী, এ কথা অমর কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না।—কিন্তু বড় বৌর কথাগুলিই বা কেমন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া যায় ? অজয় ত যাইবার পূর্ব্বে একবার অমরের সহিত দেখা করিতে পারিত!

অমর অনেকক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি নাই, চাকর নাই, অন্য লোক নাই ; তবে চল্‌বে কেমন ক'রে ?

বড় বৌ বলিল, "রাত্রির মতন জল খেয়ে থাক, সকালে একটা ঝি দেখে নিয়ে এস। চাকরে দরকার নাই।"

"ভাল ঝি পাওয়াই ত মুস্কিল।"

"একটা কায করলে কিন্তু মন্দ হয় না।"

"কি ?"

"আমার শরীর ত ভাল নয়, জানই, রোজ রোজ উনোনের ধারে যাবার ক্ষমতা আমার নাই। একটা বামুন ঠাকরুণ রাখ্‌তে গেলে, তা'তে আবার মাইনে লাগ্‌বে। তাই বলি, মা'কে কিছু দিনের জন্য নিয়ে এলে হয় না ? মা এলে ভাতজলের আর কোনই কষ্ট থাক্‌বে না।"

পরদিন বড় বৌর মা, বাপ ও ভাই আসিয়া অমরের বাসাখানি সজীব করিয়া তুলিলেন। ও দিকে নকু দাসের বাড়ীতে ছোট বৌ অজয়কে খাইতে দিয়া বলিল, "এত দিনে আমার সাধ মিট্‌ল ; ও বাসায় পাঁচ রকম রাঁধ্‌তাম, কিন্তু তোমার পাতে কিছু দিতে পেতাম না।"

(৪)

তাহার পর এক মাস চলিয়া গিয়াছে। অমরের সহিত অজয়ের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইহার মধ্যে অমরের সংসারটির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। অমরের বৃদ্ধ শ্বশুর তাঁহার জীর্ণ দেহখানি কিঞ্চিৎ মেরামত করিয়া লইয়াছেন। নূতন ভৃত্য সনাতন দুই বেলা তাঁহার অঙ্গ ডলিয়া-মলিয়া দেয়, তামাক সাজে, ইহাই তাহার কায। শাশুড়ীর পরণে আর ছেঁড়া কাপড় নাই। আর বড় বৌর ভাই ? সে এখন পূরা বাবু।

প্রতিবৎসর পূজার বন্ধে অমর বাড়ী গিয়া দুর্গোৎসব করিত, এবার তিন দিন হইল জরে পড়িয়াছে, এবার আর তাহার বাড়ী যাওয়া ঘটিল না। জর সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ডবল নিউমোনিয়া।"

পূজার সময়ে সকলেই বাড়ী যাইতেছে, বড় বৌর ভ্রাতা বলিল, তাহাকে বাড়ী যাইতে হইবে। বাপমা ছেলের মতে মত দিলেন। বড় বৌ কত অনুনয় করিয়া বলিল, "ওঁর অসুখ, এখন যাওয়া ঠিক হয় না।" কিন্তু সে কথা কে শুনে ? অমরের আজ অসুখ, কাল সারিয়া যাইবে ; কিন্তু তাহার শাশুড়ীর যে দুইখানি কাপড় চোপড় হইয়াছে, তাহা যদি তিনি এই পূজার বাজারে গ্রামের মেয়েমহলে দেখা-ইতে না পাইলেন, তবে তাঁহার সাধ যে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুতরাং তিনি

নাছোড়বান্দা! আর, শ্বশুরের গৃহিণীর মতেই মত। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। বড় বৌ তাঁহাদের যাওয়ার সংবাদ অমরকে দেওয়ায় সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অজয় থাকলে, সে আজ কখনই আমাকে ফেলে যেতে পারত না।" কথাটা বড় বৌর ভাল লাগিল না। আবার সেই অজয়।

বিজয়া-দশমীর রাত্রিতে বিসর্জ্জনের পর অজয় বাসায় ফিরিয়া আসিলে চঞ্চলা বলিল, "শুনেন নাই, ছোটবাবু! বড় বাবু যে বড় কাহিল, অবস্থা শুন্‌লাম এখন তখন।"

অজয় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ? কত দিন হয়েছে?"

চঞ্চলা বলিল, "তা' এত জানি না।"

অজয় বাসা হইতে বাহির হইল, যাইবার সময়ে ছোট বৌ ও চঞ্চলাকে বলিয়া গেল, সে রাত্রিতে সে আর ফিরিবে না।

যতদূর সম্ভব দ্রুতপদে অজয় অমরের বাসায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, বড় বৌ বারান্দায় একখানি মাদুরের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছে, আর, অনতিদূরে ঝি ষ্টোভে দুধ গরম করিতেছে। অজয় ডাকিল, "বৌ দিদি!"

আন্তরিক অনিচ্ছার সহিত বড় বৌ উত্তর দিল, "কি?"

"দাদার নাকি ভারি অসুখ?"

"কই না! এমন কিছু না; অসুখ হয়েছিল, তা' তা' সেরে এসেছে।"

"কোথায় আছেন তিনি? একবার দেখ্‌ব।"

"না, তাঁর কাছে যেতে হবে না। কাউকে যেতে নিষেধ করেছেন।"

"বোধ হয় আমি গেলে কিছু বল্‌বেন না।"

"কেন, তুমিই বা কি, আর অন্যেই বা কি?"

অমর রোগশয্যায় পড়িয়া সকল কথা শুনিল। অজয় তাহার অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছে; কিন্তু বড় বৌ তাহাকে কোনমতে আসিতে দিবে না! অজয় কি তাহার এমন অনিষ্টকারী শত্রু? সে যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া ডাকিল, "অজয়, এ দিকে আয়। এই ঘরে আমি।"

বড় বৌকে আর কোন কথা না বলিয়া অজয় তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অমরের রোগজীর্ণ দেহ বিছানার সঙ্গে মিলাইয়া আছে। অজয় ডাকিল, "দাদা!"

অমরের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতেছিল। সে অতি কষ্টে অশ্রুবেগ রুদ্ধ করিয়া বলিল, "ডবল নিউমোনিয়া; আর বাঁচ্‌ব না, ভাই!"

"ভয় কি, দাদা! নিউমোনিয়া কত লোকের হচ্ছে, দুই দিনে সেরে যাবে।"

অজয় দাদার শুশ্রূষা করিতে বসিল।

অমর একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "বড় বৌকে ডাক্।" বড় বৌ আসিলে অমর জিজ্ঞাসা করিল, "অজয়কে আস্‌তে দিচ্ছিলে না কেন?"

বড় বৌ নীরব।

অমর অজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তুই কি মদ খাস্?"

অজয় বলিল, "মদ! আপনি কি বিশ্বাস করেন?"

অমর বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে কোথায় গিয়েছিলি? ছোট বৌমা কোথায় এখন?"

তখন অজয় আদ্যোপান্ত সব কথা দাদাকে বলিল।

অমর উত্তেজিতভাবে বড় বৌকে বলিল, "ব্যাপার কি?"

বড় বৌ পূর্ব্ববৎ নীরব।

অমর আবার বলিল, "ওঃ— এত মিথ্যা ব্যবহার!"

বড় বৌ তথাপি নীরব।

অমর অজয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। আমি তোর দাদা, আমার আদেশ—তুই এই এখনই ছোট বৌমাকে বাসায় নিয়ে আয়, আর বড় বৌ যদি বাপের বাড়ী যেতে চায় ত তার ব্যবস্থা ক'রে দে।"

বড় বৌ কাঁদিয়া অজয়ের হাত ধরিয়া বলিল,"ঠাকুরপো! আমাকে ক্ষমা কর।"

অজয় বলিল, "সে কি বৌদিদি! বাপের বাড়ী যাবে কেন? আমরা কি আর, তোমার ভার নিতে পারব না?

সেই রাত্রিতেই ছোট বৌ চঞ্চলার সহিত অমরের বাসায় ফিরিয়া আসিল সুচিকিৎসা ও অজয়ের শুশ্রূষাগুণে অমর সে যাত্রা রক্ষা পাইল।

আর বড় বৌ? তাহার কথা লইয়া আমরা বেশী নাড়াচাড়া করিতে ইচ্ছা করি না। তবে চঞ্চলা এখনও সময়ে সময়ে বলে—"অতি বাড় ভাল নয়।"

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামগোপাল ঘোষ।

রামগোপাল ঘোষের জীবন-কথা বিবৃত করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা নহে। ১২২১ বঙ্গাব্দে কার্ত্তিক মাসে আমাদের জাতীয় নবজীবনের সূচনা করিয়া, আমাদের জন্মভূমি পবিত্র করিয়া যে যুগাবতার আবির্ভূত হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার শততম জন্মদিনে তাঁহার দেশবাসীকে ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কথা স্মরণ করানই আমাদের উদ্দেশ্য।

অমর কবি দীনবন্ধু চারিটি পংক্তিতে তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় রামগোপালের চরিত্রের প্রধান গুণগুলির বর্ণনা করিয়াছেন—

'প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর
স্বদেশ-বক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসমসাহসভরা, অন্যায়ের অরি
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী।"

রামগোপাল সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করেন নাই। অসাধারণ অধ্যবসায়, প্রশংসনীয় স্বাবলম্বন, সুদুর্লভ সাধুতা ও নিরবচ্ছিন্ন সত্যবাদিতার দ্বারা তিনি হীনতম অবস্থা হইতে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু রামগোপালের স্মৃতিসভায় বাঙ্গালার তৎকালীন অন্যতম দেশনায়ক 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ যথার্থই বলিয়াছিলেন,—

"Baboo Ramgopaul was certainly a most successful man. But the concern of the country was not with his success"

রামগোপালের সাফল্যে দেশের কি? তবে রামগোপালের মহত্ত্ব কিসে? গিরিশচন্দ্রের বক্তৃতায় ইহার উত্তর মিলিবে—

"He (the speaker) valued him most as a typical man, as one who had succeeded in exercising a gigantic influence over the minds of his fellow men A certain philosopher had said that the theory of the immortality of the soul resolved itself only to this that man lived for ever in his son man. In the case of Baboo Ramgopaul Ghose, the theory was most forcibly illustrated He (the speaker) could not believe that the great and good man whose memory had called together such a crowded assembly, an assembly representing every section of the vast community of Calcutta, Hindoo, European, Parsee and Mahomedoan, had actually



রামগোপাল ঘোষ।

passed away. His spirit animated every individual member of that assembly, his mind was still influencing and operating upon the minds of his admirers. The very act of admiration involved a certain degree of elevation to the great ideal which Ramgopaul had left behind as a legacy to succeeding generations. The speaker further declared that the highest value which he was disposed to attach to the life of Ramgopaul was founded upon the circumstance of his having formed a link—a strong and abiding link, between the European and native communities. He stood forward as a middleman, a bridge, an interpreter between the two races, which he explained and expounded to each other. This was perhaps the highest service which he had performed to his educated countrymen. He filled the European with respect and affection for the native, he warmed the native into a reverence for and attachment towards the European."

সত্যই তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের উপর রামগোপালের প্রভাব অসাধারণ ছিল। তিনি তখন নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। আর তিনি য়ুরোপীয় ও ভারতবাসীর মধ্যে সেতুস্বরূপ ছিলেন।

বাস্তবিকই রামগোপাল দেশের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অল্প-লোকই করিতে পারিত। আমরা প্রাচীন ব্যক্তিগণের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই যে, সেকালে যেরূপ সহৃদয় মহাপ্রাণ য়ুরোপীয়গণ এদেশে আসিয়া দেশবাসীর উন্নতিকল্পে আন্তরিক চেষ্টা করিতেন, আজি কালি সেরূপ য়ুরোপীয় বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমাদের কি কোন দোষ নাই? যে সকল উচ্চপদস্থ দেশবাসীর সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয়গণের সহিত ঘনিষ্ঠতা আছে, তাঁহারা যদি রামগোপালের ন্যায় আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাদের সহিত মিশিতে পারেন, জীবনে সর্ব্বদা সাধুতা, সৌজন্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, ও স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয়ের পরিচয়প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালীর জাতীয় গুণসমূহের বিষয় অনুক্ষণ স্মরণ করাইয়া দেন, তাহা হইলে কোনও য়ুরোপীয় আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইতে পারেন না। আর, যাঁহারা বিদেশীয়দিগকে দেশবাসীর প্রতি প্রীতিপরায়ণ করিতে পারেন, দেশবাসীরা যে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি করিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? অপর পক্ষে যদি আমাদের সমাজের নেতৃগণ য়ুরোপীয়গণের দোষগুলির পর্য্যন্ত অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে য়ুরোপীয়গণ যে আমাদিগের জাতিকে অনুকরণপ্রিয় জীববিশেষের সহিত তুলনা করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ কোথায়?

রাম গোপালের সৌভাগ্য, তিনি দেশবাসীর নিকট যেরূপ পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি-

লেন, য়ুরোপীয় বণিকসমাজ হইতে ও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতেও তেমনই প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেশবাসী কর্ত্তৃক টাউনহলে তাঁহার প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে সুন্দর তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। রামগোপালের মৃত্যুর পর বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিঃ এইচ, এল্, ডাম্পিয়ার ৺প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরিচয় দিবঃ—

The Lieutenant-Governor is fully aware of the high opinion which the Bengal Government has always entertained of Baboo Ramgopaul Ghose's ability and qualifications for public business; and I reed scarcely say that the intelligence of his death was received by His Honour with great regret. How highly the Govt. valued Baboo Ramgopaul Ghose's opinion is evinced by the number of occasions on which he was called on by Govt, to give his assistance as a member of a commitee during the last quarter of a century. Baboo Ramgopaul Ghose was a member of the Police Committee of 1845, of the Small Pox Committee of 1850, of the Central Committees for the collection of works of Industry and Arts for the London Exhibition of 1851 and Paris Exhibitions of 1855 and 1867, and of the Bengal Agricultural Exhibition of 1864.

He was also a member of the Council of Education from September 1848 to its dissolution in January, 1855, and an Honorary Magistrate and a Justice of the Peace for the Town of Calcutta. He was, besides, a member of the Lieutenant-Governor's Legislative Council from October, 1862 to October, 1864.

On the expiration of his term of office in the Legislative Council, Baboo Ramgopaul Ghose was addressed as follows:—

"The Lieutenant-Governor fully recognises the value of the services, you have rendered to the State, as a member of the Loca Legislature, and desires to express his acknowledgments for the valuable counsel and advice he has received from you."

দেশবাসীর মধ্যে উচ্চশিক্ষাবিস্তারই দেশোন্নতির একমাত্র উপায় বলিয়া রামগোপালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই জন্য তিনি তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের বিরল-প্রাপ্ত অবসর বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন, ছাত্রদিগকে উৎসাহদান প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয়িত করিতেন। কত বিদ্যালয়ে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন, কত ছাত্রকে তিনি পুস্তকাদি পারিতোষিক প্রদান করিয়া প্রোৎসাহিত করিতেন, তাহার ইয়ত্তা করা

যায় না। শিক্ষা পরিষদের তৎকালীন সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবকর্ত্তা ডাক্তার এচ্, জে, মৌয়ট এক পত্রে প্যারীচাঁদ মিত্রকে লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিক্ষাবিষয়ক সকল উদ্যমের সহিতই রামগোপাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডাক্তার মৌয়টের পত্রখানিতে রামগোপালের চরিত্র-চিত্র এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়াছে যে, উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য :—

Ranchee—Chota Nagpore,
12th February 1868

My dear friend,

Your note of the 8th reached me on my arrival here this morning, and I lose no time in replying to it in the hope that it may reach you in time to make known to your meeting my estimate of the late Ramgopaul Ghose with whom I was associated for so many years, from my intercourse with whom I always derived pleasure and advantage, and whose loss I mourn sincerely as that of one of my earliest and most esteemed native friends. My acquaintance with him began more than a quarter of a century ago. I scarcely remember how in all the great questions of that time I used to consult him freely and frequently—and always with benefit. His judgment was sound, his views were large, and his sympathies were always enlisted in every matter tending to the advancement of education.

As a speaker and writer he had a singular command of pure and idiomatic English, and so thoroughly he identified himself with the subject he was discussing or advocating as to render it difficult to belive that English thought and expression were foreign to him and that he had not been brought up in our English household.

When I first thought that Education in India had advanced far enough to need and warrant the establishment of universities, he was one of the first whom I consulted and to him, and to some other honored native friends—one at least of whom is still alive—I submitted my plan some time before it was seen by the Council of Education.

When I established the Bethune Society he was one of those who met in my house and assisted me heart and soul in its early working. In fact I can look back upon no part of my early career in connection with education which is not associated with him.

As a citizen his worth and intelligence are as well known to you as they are to me. As a public man he was upright, disinterested and singularly free from prejudice, in private life he was charitable, hospitable to a fault, and ever ready to contribute to any good effects whether for the benifit of his own countrymen or of mine. He was in the highest sense of the word a just and upright man, and I know of few whose example

I would more strongly recommend for imitation by his younger countrymen in the bright side of his character.

He was not without faults—which of us are—but his virtues so far outweigh his foibles that I can remember naught but good of him

This is but a feeble expression of my estimate of Ramgopaul Ghose So long as Bengal produces such sons she need have no misgivings to her future place among nations.

Beleive me, my dear friend, ever yours most truly.

F. J. Mouat.

৪৫বৎসর বয়সে রামগোপাল দেহত্যাগ করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি দেশের সামাজিক, মানসিক ও রাজনীতিক জীবনে এক যুগান্তরের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার অকাল মৃত্যুতে খেদ হয় না।

আজি আমরা বঙ্গবাসীকে রামগোপালের উদ্দেশ্যে নীরবে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

সর্ব্বস্ব সঙ্কল্প করি' মাতৃভাষা পদে,
এমন অর্চ্চনা কেবা করিয়াছে আর।
নাট্যকলা-কমল ফুটালে বঙ্গ-হ্রদে,
মহাযশ জয়স্তম্ভ ভারত তাঁহার।
যতকাল বঙ্গভাষা রহিবে ধরায়,
কার সাধ্য তাঁর নাম হবে বিস্মরণ?
কীর্ত্তির মন্দারমালা পরিয়া গলায়,
চিরদিন উজলিবে এ বঙ্গভুবন।
গৃহে গৃহে মহাগ্রন্থ আদৃত যেমন
গ্রন্থে গাঁথা কালী নাম নিত্য স্মরণীয়,
ভারত মূর্খের যথা সম্মানভাজন
পণ্ডিতজনের সেই মত বরণীয়।
শান্তিদাতা এ ভারতে ভারত তোমার,
তার মাঝে তব নাম সুধার আগার।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।

সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক নেতা ও ব্যবহারাজীব রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের কথায় কালিদাসের "আচারশুদ্ধোভয়বংশদীপ" সুষেণের বর্ণনা মনে পড়ে—

"গুণৈর্যমাশ্রিত্য পরস্পরেণ
নৈসর্গিকোঽপ্যুৎসসৃজে বিরোধঃ।"

অসামঞ্জস্যের এমন সামঞ্জস্য সচরাচর লক্ষিত হয় না। তিনি বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু উৎসাহে যুবক; পরম পণ্ডিত, কিন্তু অত্যন্ত সামাজিক; প্রভূত ধনশালী, কিন্তু সর্ব্বত্র বিনয়ী; আর, তাঁহার হৃদয় "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি"—কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না, কিন্তু শোক-দুঃখ তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

রাঢ়ে বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আলমপুর নামক গণ্ডগ্রামে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সম্ভ্রান্ত কিন্তু দরিদ্র বৈদ্যবংশে বৈকুণ্ঠনাথের জন্ম হয়। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি বহরমপুরে নীত হয়েন। তথায় তদীয় পিতা জজ-আদালতে চাকরী করিতেন। তিনি অত্যন্ত ধর্ম্মানুরাগী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। এক দিন তিনি কক্ষ দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলে কক্ষমধ্যে একটি বিষধর সর্প বাহির হয়। মুক্ত বাতায়নপথে তাহা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তিনি তখন এমনই তন্ময় যে, সে কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে না। তিনি যথারীতি পূজা শেষ করিয়া যখন আসন ত্যাগ করেন, তখন সর্পটি অন্তর্হিত হইয়াছে। বৈকুণ্ঠনাথের জন্মসম্বন্ধে পরিবারমধ্যে যে বিশ্বাস বর্ত্তমান, তাহার অলৌকিকত্বের আমরা করিব না। দেশনায়ক বৈকুণ্ঠনাথের কর্ম্মজীবনই আমাদের আলোচ্য।

বহরমপুরে আসিয়া তিনি সৈয়দাবাদ হার্ডিঞ্জ বঙ্গ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়েই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও একাগ্রতা শিক্ষকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল। প্রতিভা জগতে সুলভ নহে সত্য; কিন্তু প্রতিভা যদি একাগ্রতার সহিত সম্মিলিত না হয়, তবে তাহার স্ফূরণ হয় না। বৈকুণ্ঠনাথ প্রতিভার সহিত একাগ্রতার সম্মিলনসাধনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন বলিয়াই তিনি জীবনের সর্ব্বকার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রথম বিভাগে স্থান লাভ করিয়া মাসিক ৮৲ টাকা জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। দুই বৎসর পরে তিনি সসম্মানে সিনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক ২০টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর বৃত্তি সম্বল করিয়া তিনি কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিয়া ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে এফ, এ, ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পর বৎসর তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকৃত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করেন।

সত্য বটে, বৈকুণ্ঠনাথের জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে অদ্যাপি ছাত্র-জীবনের সীমা অতিক্রম করিতে দেয় নাই; কিন্তু সাধারণ হিসাবে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টের উকীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠনাথের ছাত্রজীবনের শেষ হইল। এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দারুণ দারিদ্র্যের দংশনযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল। জননীর ছিন্ন বস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করিয়া দুই ভ্রাতা পরিধান করিয়াছেন, পুস্তকের ক্রয়োপযোগী অর্থের অভাবে তিনি অপরের পুস্তক দেখিয়া পাঠ অভ্যাস করিয়াছেন। দারিদ্র্যের অনলে বৈকুণ্ঠনাথের খাদিকা ভস্মীভূত হইয়াছিল—বিশুদ্ধ অংশ বিনষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, সমুজ্জ্বল দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। অস্মদ্দেশে অনেক সময় দেখা যায়, দারিদ্র্য হইতে সমৃদ্ধির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারিলে লোক দরিদ্রদশার কথা গোপন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠনাথ কিন্তু সে প্রকৃতির লোক নহেন। তিনি দারিদ্র্যকে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলেন—দারিদ্র্য লজ্জার কারণ মনে করেন না। অর্থাভাবে বিদ্যার্জ্জনের পথ বিঘ্নবহুল হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রায় ২০ জন ছাত্রকে স্বীয় পরিবারস্থবৎ পালন করিয়া থাকেন, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। প্রার্থী কখনও তাঁহার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে ফিরে না। দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সাহায্যেও তিনি মুক্তহস্ত। আর, গত অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে এ দেশে যে সকল লোকহিতকর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সকলেই তাঁহার সহানুভূতি ও সাহায্য অকাতরে প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি আগ্রায় যাইয়া ওকালতী করিবেন সঙ্কল্প করিয়া কায শিখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় ওকালতী আরম্ভ করেন। দুই বৎসর তথায় কায করিবার পর তাঁহাকে আগ্রায় যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বহরমপুরে আসিয়া ওকালতী আরম্ভ করিতে হয়। এই সময় তাঁহার এক ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাতুরা জননী তাঁহাকে দূরদেশে যাইতে নিষেধ করেন। মাতার আজ্ঞা বৈকুণ্ঠনাথের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় ছিল। তিনি মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন ও অত্যল্প-কালমধ্যে বহরমপুরের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারাজীব বলিয়া পরিগণিত হয়েন। এখনও

তিনি ওকালতী করিতেছেন এবং আইনের জটিল সমস্যার সমাধান জন্য তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্র বহরমপুর হইতে অন্যান্য জিলাতেও যাইতে হয়।

যাঁহারা বৈকুণ্ঠনাথের সাফল্যে সহায় ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কাশিমবাজার রাজ-সরকারের দেওয়ান স্বনামধন্য রাজীব বাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বল্পায়ু, উদারহৃদয়, উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি রাজা কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আপনার বিপুল সম্পত্তি বঙ্গে শিক্ষাবিস্তার জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া উইল করিয়াছিলেন। রাজীব বাবু সে উইল রদ করাইয়া সমস্ত সম্পত্তিতে কৃষ্ণনাথের বিধবা মহারাণী স্বর্ণময়ীর অধিকার প্রতিপন্ন করেন। তিনিই দীর্ঘকাল দেওয়ান থাকিয়া সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন। রাজীবলোচন লোকচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি যুবক বৈকুণ্ঠনাথকে দেখিয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হয়েন। কলিকাতায় পাঠকালে একবার পীড়িত হইয়া বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহারই যত্নে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। কাশিমবাজার-সরকারের কার্য্য-নির্ব্বাহে বৈকুণ্ঠনাথের আইনজ্ঞানে ও রাজীব বাবুর বিষয়বুদ্ধিতে মণি-কাঞ্চন-যোগ হইয়াছিল।

ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠনাথের সাফল্যলাভে অধিক বিলম্ব হয় নাই। এই সময় হইতেই তিনি রাজনীতিচর্চ্চা আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনীতি কেবল ধনীদিগের অবসর-বিনোদনের ও যশ-অর্জ্জনের উপায়মাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বৈকুণ্ঠনাথ কখনও সে ভাবে রাজনীতি-চর্চ্চা করেন নাই। তিনি রাজনীতির জন্য সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে কখনও কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নাই। তিনি বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্বে কংগ্রেসে স্বদেশী শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী' পত্রিকায় শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র সেন বৈকুণ্ঠ বাবুর সেই প্রস্তাব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"সে দিন শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রস্তাব করিলেন, কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে যথাসম্ভব স্বদেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। অমনি কংগ্রেসের প্রধান নেতা ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত ফেরোজ সা মেটা সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। যাঁহারা দেশের জন্য নিজেদের বিলাসের সামান্য অংশটুকুও ত্যাগ করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত ও পুষ্ট কংগ্রেস দেশের কি উপকারে আসিবে? ত্যাগে অক্ষম স্বার্থরত বিলাসী নর-শ্রেণীর দ্বারা কোন জাতি কস্মিন্‌কালে উন্নত হয় নাই এবং উন্নত হইতেও পারে না। অন্য সমুদয় প্রস্তাব বিনা-পত্তিতে গৃহীত হইল; কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রস্তাব গৃহীত হইল না কেন? ইহার

উত্তর অতি সহজ। অন্য সমুদয় প্রস্তাবই রাজার স্কন্ধে দোষার্পণ ও রাজার নিকট ভিক্ষা—ইহাতে জাতির কিছুই পরিশ্রম লাগে না—জাতিকে ইহার জন্য কিছু করিতে যাইতেছে না বা দিতে হইতেছে না। কিন্তু বৈকুণ্ঠ বাবুর প্রস্তাবে প্রত্যেকেরই কিছু করিতে হইত, প্রত্যেকেরই কিছু বিলাস ও স্বচ্ছন্দতা ত্যাগ করিতে হইত। ইহা স্বার্থত্যাগ, ইহা স্বাবলম্বন, তাই ভিক্ষাজীবী কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অসম্মত। যাঁহারা নিজে স্বার্থ-ত্যাগে অক্ষম, তাঁহারা রাজাকে স্বার্থত্যাগ-নীতি শিক্ষা দিতেছেন—নীতি-শাস্ত্রের গুরু হইতেছেন, ইহাপেক্ষা বিচিত্র জগতে আর কি আছে? কংগ্রেস ভিক্ষাশীলতা পরিত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বন-নীতি গ্রহণ করিয়া নিজেকে পুনর্গঠিত না করিলে, উহার দ্বারা দেশের কোন উপকারের আশা নাই, বরং অনেক আশঙ্কা আছে। ইহা জাতিকে স্বাবলম্বনে অসমর্থ করিয়া ক্রমে গভীরতর দুর্গতিতে পাতিত করিবে।”

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি যাযাবর হইলে বৈকুণ্ঠনাথের যত্নে বহরমপুরেই তাহার প্রথম অধিবেশন হয়। তাহার পর মেদিনীপুরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পরবৎসর উড়িষ্যায় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস তাহাতে অস্বীকৃত হইলে যখন এক বৎসর সমিতির অধিবেশন বন্ধ থাকে, তখন বৈকুণ্ঠনাথই আবার বহরমপুরে সমিতিকে আহ্বান করেন। বরিশালে সমিতির অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তিনি আবার বহরমপুরে সমিতির অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে তাঁহাকে প্রভূত সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। কংগ্রেসে দলাদলির পর হুগলীতে প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি হইয়া তিনি উভয় দলকে একযোগে দেশের কল্যাণকামনায় কায করিবার জন্য যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহার আন্তরিকতায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

তিনি কর্ম্মস্থান বহরমপুরে কলেজের জন্য, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হইয়া নানা কার্য্য করিয়াছেন। বহরমপুরে রাজনীতিক জীবন-গঠনে তিনি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান বিভাগের জিলাবোর্ডের প্রতিনিধিরূপে ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটীর প্রতিনিধিরূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। দুইবারই তিনি বিবিধ দেশ-হিতকর কার্য্যের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বৃদ্ধ হইলেও বৈকুণ্ঠনাথ দেশহিতকর কার্য্যে যুবাজনোচিত উৎসাহ সহকারে ব্রতী হইয়া থাকেন। তিনি সরলহৃদয়। তাঁহার জীবন বিলাসবর্জ্জিত। আর প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে বাঙ্গালীর জীবন হইতে যে আন্তরিকতা অন্তর্হিত হইতেছে,



শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ সেন।

তাঁহার সকল কার্য্যে সেই আন্তরিকতা সপ্রকাশ। বাঙ্গালায় যে শ্রেণীর "ভদ্র লোক" বিরল হইতেছে, তিনি সেই শ্রেণীর ভদ্রলোকের আদর্শ। বাঙ্গালায় যেরূপ "গৃহকর্ত্তা"র আদর্শ বিলুপ্ত হইতেছে, তিনি সেইরূপ গৃহকর্ত্তা।

তাঁহার জীবনে যাঁহার কল্যাণময় প্রভাব সপ্রকাশ, যাহার গুণে তাঁহার গৃহে শ্রী ও শান্তি বিরাজ করিত, যাঁহার সামাজিক গুণ বৈকুণ্ঠনাথের স্বাভাবিক সামাজিক গুণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাকে পুষ্ট ও পূর্ণ করিয়াছিল, যিনি তাঁহার গৃহে গৃহিণী ও সর্ব্বকার্য্যে সচিব ছিলেন, সংপ্রতি বৈকুণ্ঠনাথ সেই গৃহিণীকে হারাইয়াছেন।

তিনি এখনও দীর্ঘকাল সুস্থ থাকিয়া দেশের কল্যাণকর কার্য্য করুন্, দেশে স্বার্থত্যাগের আদর্শ সমুজ্জ্বল রাখুন, আমাদের সামাজিকগুণের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখুন—ইহাই আমাদের কামনা।

তাঁহার ওকালতীকালের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে সুকবি শ্রীমান্ কালিদাস রায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব—

জীবনের পরিমাপ নহে দণ্ডে ঘড়ির কাঁটায়
শূন্যগর্ভ লক্ষবর্ষ নিষ্ফল যে কর্ম্ম-হীনতায়,
ঘটনার অগণ্যতা, ভাব কর্ম্ম নিবিড় জনতা,
জীবনেরে দীর্ঘ করে ক্ষুদ্রেরেও দেয় সফলতা—
ওগো কর্ম্মি, চিন্তাঘন দণ্ড পল মুহূর্ত্ত তোমার
দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'ক তব জীবন-বিহার।
তব কর্ম্ম, তব চিন্তা, আয়ুষ্মন্, তব পরমায়ু
শুধু ত তোমার নহে—এ দেশের নিশ্বাসের বায়ু
ভাগ্যবতী বঙ্গমাতা মাতৃগর্ব্বে ধরিলা তোমায়,
দিলে ধিক্ বাঙ্গালীর জীবনের সফরী-লীলায়।
বিত্তমাঝে চিত্ত তব সত্যে নিত্য করিয়াছে সেবা
কুবেরের বন্ধুমধ্যে হেন নম্র হৃদি ধরে কেবা?
সুচির সাপত্ন্যদ্বন্দ্ব দূর করি কমলা ভারতী
তব গৃহে নিত্য দোঁহে পাশাপাশি লভিলা আরতি।
বসাওনি দম্ভে তব গৃহমাঝে দেবমূর্ত্তি সাজে।
সুবর্ণ-দেউলে তব কল্যাণের জয়শঙ্খ বাজে।

তোমার কাঞ্চনপদ্ম নহে শুষ্ক নীরস কঠিন
করুণা-সৌরভে, প্রেম-মধু-রসে সজীব নবীন।
কঠোর কর্ম্মের মাঝে রাখিয়াছ চিত্ত প্রেমময়
প্রাবীণ্যের জ্ঞানমঞ্চে শিশুসম সরল হৃদয়।
হে কান্ত কোমলপ্রাণ, করুণার জাহ্নবী-ধারায়,
রজতের গজপতি খরস্রোতে ভাসালে হেলায়।
চারিদিকে শত বন্ধ অমৃতেরে ভুলনিক তবু
অনিত্যের সিংহাসনে শাশ্বতেরে হারাওনি কভু
বিষয়-বিষের সরে ভক্তিরাঙ্গা চিত্ত-শতদল
বিধাতার পাদপীঠ রচিয়াছ পবিত্র অমল।
'অয়স্কান্ত'-সূচিসম অকপট চিত্ত ধর্ম্ম ধরি
ইহলোক পরলোক দুই দিক্ আছে লক্ষ্য করি'।
কণ্ঠে তব মণিমাল্য, শীর্ষে তব নির্ম্মাল্যপ্রসাদ
করে তব রূঢ় দণ্ড, মুখে বাজে পুণ্য আশীর্ব্বাদ।
পাষাণে যা জনমিল, ছুটিল তা পারাবারপানে,
শ্যাম শস্য শুভাশীষ দুই তটে অবিশ্রান্ত দানে।
সংসারের রণক্ষেত্রে অস্ত্রক্ষত লভনি কি বুকে?
জীবন উঠেনি কাঁপি বহুবার শক্তিশেল মুখে?
হস্ত হ'তে গাণ্ডীবের স্খলিবার হয়নি কারণ?
জীবনে সকলি ছিল তবু তব টলেনি চরণ;
তবু তুমি যুঝিয়াছ—যুঝিতেছ—বুঝিয়াছ সার
ফলে স্পৃহা ভ্রান্তি মাত্র—কর্ম্মে শুধু আছে অধিকার
শান্তিপর্ব্ব সান্ত্বনায় লভিয়াছ চিত্তে ধীরবল
সব কাঁটা কমলের মকরন্দে হয়েছে সফল।

পাশী

(২)

দত্তক পুত্রগ্রহণ—সাধারণতঃ ভ্রাতৃ পুত্রকে পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া দত্তক-পুত্র গ্রহণ করা হয়। দত্তকগ্রহণ সময়ে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই।

স্বত্বাধিকার—সন্তানগণ পিতার উত্তরাধিকারী; সন্তান অভাবে জ্ঞাতি বা জ্ঞাতিপুত্রগণ। দায়ভাগে জ্যেষ্ঠপুত্রের অংশ—অপর পুত্রগণ অপেক্ষা অধিক হইবে। অন্যান্য পুত্রগণ এক এক শত টাকার অংশ পাইলে, জ্যেষ্ঠ পুত্র একশত পঁচিশ টাকা পাইবে। বিধবা যদি সচ্চরিত্র হয় ও 'সাগাই' প্রথানুসারে বিবাহ না করে, তবে যাবজ্জীবন বিষয়ের ভোগ-দখল করিবে। কন্যার অভাবে কন্যার পুত্র ও তদভাবে মুখাগ্নিকারী মৃতের বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়।

গর্ভ—পূর্ব্বাঞ্চলীয় পাশীগণ স্ত্রী গর্ভবতী হইলে গ্রাম্য দেবতা বির্ত্তিয়া ও ফলমতিদেবীর নিকট পূজা মানিয়া থাকে। যদি গর্ভিনী সহজেই প্রসব করে, কোন প্রকার কষ্ট না পায় অথবা মৃত সন্তান প্রসব না করে তবে উক্ত দেবতা-দিগকে সুরা (থাপ্পার) ও শূকর (মাল) বলি প্রদান করে। ষষ্ঠ (ছুঠী) দিনে কোন সংস্কার নাই। চামারিণ (চর্ম্মকার জাতীয় স্ত্রীলোক ধাত্রী) ছয় দিন প্রসূতির সেবা করে। তাহার পারিশ্রমিক চারি সের শস্য ও চারিটি পয়সা। কিন্তু কন্যা জন্মিলে সে এই পারিশ্রমিকের অর্দ্ধাংশ মাত্র প্রাপ্ত হয়। দ্বাদশ (বারাহি) দিনে গৃহাদি পরিষ্কার করা হয় এবং মাটীর বাসন সকল ফেলিয়া দিয়া নূতন (মাটীর) বাসন ব্যবহার করা হয়। নাপিত-পত্নী আসিয়া মাতার ও শিশুর নখ কাটিয়া আলতা (মাহাওয়ার) পরাইয়া দেয়। এদিকে পিতা বির্ত্তিয়ার নিকট শূকর বলি দিয়া ভূমির উপর একটু সুরা ঢালিয়া দেয়। পরে জ্ঞাতিগণকে শূকরের মাংস ও ভাত খাওয়ায়। বার দিনেই জাতাশৌচ দূর হয়। মাতা শুদ্ধ হইয়া কুয়া (কূপ) হইতে জল তুলিতে যায়। প্রথমে কুয়ার উপর এক মুষ্টি চাউল রাখিয়া নত হইয়া প্রণাম করে। প্রসবের পর স্বামী ছয় মাস পর্য্যন্ত স্ত্রীকে স্পর্শ করে না। সন্তান ৫।৬ বৎসর বয়স্ক হইলে গ্রাম্য সোণার (স্বর্ণকার) তাহার কাণ বিঁধাইয়া দেয়। সে তজ্জন্য আপন পরিশ্রমের মূল্য এক পয়সা প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম 'কাণ ছেদন' বা 'কাণ বেধ'।

বিবাহ—কন্যার পিতা বরের বাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক 'রাম' 'রাম' বলিয়া অভিবাদন করে। পরে পাত্রকে ডাকিয়া পাত্র আসিলে সম্বন্ধ পাকা হয়। পণ্ডিত আসিয়া বরকন্যার কোষ্ঠী দেখিয়া রাশি ও গণ (রাশবর্গ) মিলান। কন্যা-কর্ত্তা ভাবী জামাতাকে একটি টাকা দেন। ইহাতেই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইল। ইহার নাম 'মাঙ্গনি'। কন্যা কর্ত্তা বরের ললাটে তিলক দেন। পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা তিলককে 'পানি পিনা' (জলযোগ?) কহে। কন্যাপক্ষ পুরোহিত নাপিতের সহিত, একখানি থালে একটি নারিকেল, এক বা দুইখানি বস্ত্র, কিছু মিষ্টান্ন ও আট আনা কিংবা একটি টাকা লইয়া বরের বাড়ী লইয়া আইসে। ভাত ও শূকরের মাংস দিয়া ভোজ হয় এবং এই দিন বিবাহের দিন স্থির হয়। ইহার পর 'মাঠ মাঙ্গারা' (মাটী আনা) ও বিবাহের মানরো (মণ্ডপ) নির্ম্মাণ করা হয়।

অঙ্গনের চারি কোণে চারিটি বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর খড় বা কশাড় দিয়া ছাইয়া অথবা কাপড় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। ইহার নাম মণ্ডপ। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণ হইতে অতি নীচ জাতি পর্য্যন্ত সকল জাতির বিবাহে মাটী আনা ও মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মণ্ডপের নিয়ে কন্যাদান প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে।

মণ্ডপের মধ্যে লাঙ্গল (হারিস্) ও কতকগুলি শুকপক্ষীর কাষ্ঠময়ী মূর্ত্তি থাকে। পণ্ডিত (পুরোহিত) বরের মণিবন্ধে (লৌহের সহিত আম্রপত্র ও সর্ষপ) কঙ্কণ বাঁধিয়া দেন। ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। বর ও কন্যাকে উত্তমরূপে তৈল ও হরিদ্রা মাখান হইয়া থাকে। ইহার নাম 'উপটান।' যে দিন বিবাহের শোভাযাত্রা কন্যার বাটীতে যাইবে তৎপূর্ব্বদিন বরের পিতা আগোয়ান দেব, পাঁচপীর ও ফুলমতি দেবীর উদ্দেশে একটি শূকর বলি দিয়া ভূমির উপর কিঞ্চিৎ সুরা নিক্ষিপ্ত করে। বিবাহে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে মণ্ডপস্থ লাঙ্গলের ফলায় সিন্দূর দিয়া সেই সিন্দূর বধূর সীমন্তে দেওয়া হয়, পরে বরবধূ পাঁচবার লাঙ্গল প্রদক্ষিণ করে। অবশেষে বরকন্যা বাসর ঘরে (কোহাবারে) গমন করে। বর বধূ লইয়া গৃহে আসিলে পাঁচ দিন পরে বরের ভগিনী বিবাহের কলস (কলশ্য) ইত্যাদি নিকটবর্ত্তী নদীতে ফেলিয়া দেয় এবং বাটীতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যেক অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষকে কিছু চাউল ও জল দিয়া পূজা করে।

মৃত্যু।—পাশীগণ শব দাহ করে; কিন্তু মড়কে মরিলে পুতিয়া ফেলে। সমাহিত করিবার সময় শবের মস্তক উত্তর, পদদ্বয় দক্ষিণ ও মুখ পূর্ব্বাভিমুখে রাখিয়া দেয়। মৃত্যুর পরক্ষণেই শবের মুখে একটু চিনি দেওয়া হয়। দাহ করিয়া সকলে নিমের পাতা মুখে দিয়া পরে চিনি খাইয়া মিষ্টমুখ করে। নদী বা পুষ্করিণীর তীরে প্রেতাত্মার অবস্থানের জন্য কুশ পুতিয়া রাখে এবং দশ দিনে অশৌচান্ত হওয়া

পর্য্যন্ত মুখাগ্নিপ্রদানকারী প্রতিদিন সেই কুশের উপর জল প্রদান করে। প্রতি-নিশায়, যে পথ দিয়া শব বাহিত হইয়াছিল, সেই পথিপার্শ্বে প্রেতের আহারার্থ খাদ্য রাখিয়া দেওয়া হয়। চিতাভস্ম চিতায় পড়িয়া থাকে; কেহ কেহ যত্ন পূর্ব্বক চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখে এবং সুযোগ পাইলে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করে।

ধর্ম্ম—এই প্রদেশের পূর্ব্ব অংশে যে সকল পাশী বাস করে, তাহারা আপনা-দিগকে শাক্ত বলিয়া থাকে। মির্জ্জাপুরে অনেকে বন্দী মাইর (দেবীর) পূজা করে। বন্দী মাইর কোন নির্দ্দিষ্ট মন্দির নাই। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বেদীর (চৌরি) উপর পিত্তল বা রৌপ্যমূর্ত্তি স্থাপিত। এই মূর্ত্তিকে মাল্য দিয়া পূজা করা হয়। পরিবারের মধ্যে প্রত্যেক পুত্রের বিবাহে স্বর্ণের ও প্রত্যেক কন্যার বিবাহে রৌপ্যের একটি দানা দেবীর গলদেশস্থ হারে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ইঁহার পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নাই। পূজা মাননা থাকিলে কিংবা মানস পূর্ণ হইলে অথবা বিবাহাদি শুভকর্ম্মে পূজা দেওয়া হয়। আগোয়ান দেব ফুলমতি কিংবা পাঁচপীরেরও (পাঁচোপীর) উপাসনা হয়। এই দেবতাদিগকে শূকর-শাবক ও মদ্য দিয়া পূজা করা রীতি। তিন মুখবিশিষ্ট বর্শা (লৌহময়) বা অঙ্গনে পাঁচটা খোঁটা পুতিয়া গৃহদেবতা পাঁচপীরের পূজা হয়। ঐ বর্শার নাম 'সাঙ্গ'। প্রতাপগড়ে ইহাদের স্থানীয় দেবতা অনেক, যথা—কারাদেও, মিঞা, কাসবীর, ক্ষেত্রপাল বা ভূমিয়া ও বাহিরওয়ার। শেষোক্ত দুই দেবতার পূজায় লোক শূকরশাবক ও মদ্য প্রদান করে এবং পূজাদাতা মদ্যমাংসে উদর পূর্ণ করে। বুধ ও শনিবার পূজার দিন। পিলিভিত জিলায় ভূমিয়ার নাম ভূমসেন। পাশীগণ সুবিধা পাইলে প্রত্যেক পীরের কবর দর্শন করে; প্রেতপক্ষের পঞ্চদশ দিন তর্পণ করে এবং মৎস্য মাংস আহার করে না। এই প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্বাংশের অধিবাসি-গণ রাম ঠাকুর, ভৈঁরো ও মহাবীরের পূজা দেয়। বিবাহ উপলক্ষে রাম ঠাকুরের নিকট খাসী বলি দেওয়া হয়। মহাবীর ও ভৈরবের পূজায় কোন জীবহত্যা নাই। মহাবীরকে লাড্ডু ও ভৈঁরোকে বড়া (একপ্রকার কচুড়ি) দিয়া পূজা দেয়। বসন্ত রোগের অবির্ভাব হইলে স্ত্রীলোকরা শীতলার পূজা করে। শীতের প্রারম্ভে খেজুরগাছ কামাইবার অস্ত্রবিশেষ ও সেই অস্ত্রে শাণ দিবার কাষ্ঠখণ্ডকে পূজা করে। এই পূজার সময় সমস্ত বন্ধুবান্ধব একত্রিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ইহাদের পৌরোহিত্য করিতে কোন দ্বিধা বোধ কিংবা ইহাদিগের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করেন না। পাশীদিগের পর্ব্ব হিন্দুদিগের ন্যায়। হোলী বা ফাগুয়া (দোলযাত্রা), দশমী (বিজয়া দশমী), দেওয়ালী (দীপান্বিতা অমা-বস্যা), কাজরী (শ্রাবণ মাসের ব্রতবিশেষ) নারীগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়)।

তিজ (তৃতীয়া) উপলক্ষে স্ত্রীলোকগণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে ভোজন করে। ইহারা পুরাতন বৃক্ষকে অতিশয় মান্য করে, কারণ, এই সকল বৃক্ষ ভূত, দেও ও বীরের আবাসস্থান। সুতরাং ইহারা অঘান (অগ্রহায়ণ) মাসে একটি শূকরশাবক কাটিয়া এবং মৃত্তিকার উপর কিছু মদ্য ঢালিয়া দিয়া অপদেবতাগণকে সন্তুষ্ট রাখে। ইহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে এবং ধনবান্ হইলে গয়াধামে গমন করিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকে। ইহারা অশ্বত্থবৃক্ষ কর্ত্তন বা কোন প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতি বা অপকার করে না। কারণ, তাহারা কহে যে, অশ্বত্থ বৃক্ষ বাসুদেবের আবাসস্থান। স্ত্রীলোকরা হাতে কাচের বা গালার চুড়ী, গলায় হার, কর্ণে কর্ণফুল (করণফুল) ও পদে দস্তার খুব ভারি পাঁইজোড় (পাইরি) পরিধান করে। পুরুষরা কর্ণে একপ্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করে, উহার নাম লুড়কা, গলদেশে একটি মোহর বা একটি সোণার দানা কিংবা কোন মূর্ত্তি সূত্রগ্রথিত করিয়া পরিধান করে। যে ব্যক্তি বসন্ত রোগের হস্ত হইতে একবার নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, সে আমৃত্যু শীতলা দেবীর মূর্ত্তি গলায় ঝুলাইয়া রাখে। মৃতপত্নীক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিলে মৃতা স্ত্রীর মূর্ত্তি গলায় ঝুলাইয়া রাখে এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীকে কোন অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি দিতে হইলে প্রথমে ঐ মূর্ত্তিকে নিবেদন করিয়া দেয়, নতুবা মৃতার প্রেতাত্মা ঈর্ষানলে দ্বিতীয়া স্ত্রীকে (সৌতিন্) ভস্মীভূত করিতে পারে।

শপথ।—দিব্য বা শপথ করিতে হইলে ইহারা জল স্পর্শ বা জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম লইয়া শপথ করে।

'ডাইন্', ভূতে পাওয়া বা নজর লাগায় ইহাদের দৃঢ়-বিশ্বাস। সেরূপ ঘটনা ঘটিলে ইহারা ওঝা ডাকে।

ইহারা গো, মহিষ, কুম্ভীর, বানর, অশ্ব, শৃগাল বা টিকটিকির মাংস আহার করে না; কিন্তু অধিকাংশই কুক্কুট, শূকর, মূষিক (শস্যক্ষেত্রের) ছাগ, মেষ ও হরিণের মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা অপর পক্ষের পঞ্চদশ দিন কেবল নিরামিষ ভোজন করে। পুরুষগণের ভোজন সমাপ্ত হইলে তবে স্ত্রীলোকরা ভোজন করে। পাশীগণ মদ্যপ। ইহারা স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে "পায় লাগি" (পদে পতিত হই) এবং উচ্চতর জাতিগণকে "রাম রাম" বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে। (১)

কিন্তু এতদ্দেশে কেবল ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ 'পায় লাগি' বলিয়া অভিবাদন করে। ব্রাহ্মণগণ 'আশীর্ব্বাদ' শব্দ উচ্চারণ করেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত

(১) Tribes and Castes of N. W. P. and Oudh Vol IV

অপর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে 'রাম' 'রাম', 'জয় গঙ্গাজী', 'জয় গোপালজী' ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

পাশীগণ 'কাচ্চি' (দাইল, ভাত ও রুটী) কেবল ব্রাহ্মণে রন্ধন করিলে খাইবে। 'পাক্কী' (লুচি ও মিষ্টান্নাদি) রাজপুত হালুয়াই (মিষ্টান্নবিক্রেতা) ও রস্তগীর বা আগরওয়ালা বেণিয়াগণ প্রস্তুত করিলে অনায়াসে আহার করে।

ইহাদের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোক ভূস্বামী, অধিকাংশ শ্রমজীবী। খেজুর বা তালের রস বাহির করা এবং পাতর কাটিয়া শীল, নোড়া ও জাঁতা প্রস্তুত করাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। অনেকে চৌর্য্যবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ এবং এই কার্য্যের জন্য অতি দূরদেশে চলিয়া যায়। শ্লীম্যান বলেন যে, তাঁহার কার্য্যকালে অযোধ্যা প্রদেশে পাশীদের বহুসংখ্যক পরিবার ছিল। সকলেই দস্যু তস্কর ও প্রবঞ্চক। ইহারা বিষপ্রদানে নরহত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। ইহারা অযোধ্যা প্রদেশের ভূস্বামীদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিল। পাশীগণ তালুকদারগণের পক্ষে লড়াই করিত, তালুকদারগণ তাহাদের বেতন দিতেন বটে, কিন্তু সে ব্যয় পাশীগণের লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতেই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত এবং উদ্বৃত্ত অংশে ধনাগার পূর্ণ হইত। পাশীগণের অস্ত্র তীর ও ধনুক। রাত্রিকালে ইহারা অতিশয় দুর্দ্দম্য। (২)

মতপরিবর্ত্তন।

গ্রীষ্মের ছুটীর পূর্ব্বে যে দুইখানা ফটো বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাহা লইয়াই যোগেশ ও রমেশের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইয়াছে। যোগেশ রমেশের সহোদর, বয়সে দুই এক বৎসর পার্থক্য থাকিলেও তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের ভাব ছিল না—দাদা বলিয়া যোগেশের নিকট কোন কথা বলিতে রমেশের বাধা ছিল না, ছোট ভায়ের সঙ্গেও যোগেশ ইয়ার্কি দিতে ছাড়িত না—তাহাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য ত ২।১ বৎসরের বেশী নয়। ফটো দুইখানির একখানির নীচে লিখা আছে 'সরযূ', অপরখানিতে 'সরলা'। বলা বাহুল্য, এই দুইখানিই দুই ভ্রাতার প্রস্তাবিত পত্নীদ্বয়ের ফটো, তাহাদের অভিমত হইলে আগামী গ্রীষ্মের বন্ধেই বিবাহ হইবে। ফটোর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর 'সরকারে'র এক চিঠি আসিয়াছে। তাহাতে এইরূপ লিখা ছিল,—"কর্ত্তা দুই মেয়েই দেখিয়া আসিয়াছেন, 'সরযূর' সহিত বড় বাবুর ও 'সরলার' সহিত মেজ বাবুর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে। আপ-

(২) Journey through Oudh

নাদের মতামত আমাকে জানাইবেন।" চিঠি পড়িবার পূর্ব্বে যেরূপই হউক, চিঠি পড়িবার পরে যোগেশ 'সরযূ'কে ও রমেশ 'সরলাকে' প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। এই পক্ষপাতিত্ব লইয়াই তাহাদের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হইল।

যোগেশ যখন বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষার ও উক্ত ভাষাদ্বয়ের খিচুড়ি দ্বারা সরযূর রূপের পূজা শেষ করিল, তখন রমেশ বাহবা দিয়া উঠিল আর বলিল,—"তোমার কি রকম পছন্দ, দাদা! শূর্পনখার মত নাকই তোমার ভাল লাগিল? আর দেহযষ্টি দেখিয়া ত Euclid এর Straight Line এর definition মনে পড়ে —having length without breadth আর দেখ ত এই মেয়েটি ('সরলা'র ফটো দেখাইয়া) কেমন হৃষ্ট-পুষ্ট মুখখানি লাবণ্যে ভরা—'গুচ্ছঝরা নোলকপরা'—মরি, মরি, এই নাকেই ত নোলক শোভা পায়!" যোগেশ রমেশের প্রশংসাবাক্যে ধিক্কার দিয়া বলিল,—"তোর পছন্দ করিবার ক্ষমতা নাই। খাঁদা নাকের আবার প্রশংসা! আর যে লাবণ্যের কথা বলিতেছিস্, ইহাতে তাহার নিতান্তই অভাব। লাবণ্য দেখিতে হয় ত এই চেহারাখানিতে পাইবে। কালিদাস যখন শকুন্তলাকে 'সৃষ্টিরপরা' বলিয়াছিলেন, তখন বোধ হয়, তিনি এইরূপই একটি নারীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। এ চেহারায় এমন একটি সরলতা আছে, যাহা প্রায় দেখা যায় না। ইত্যাদি।" এইরূপে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রস্তাবিত পত্নীর প্রশংসা করিয়া 'সরকার'কে তাহাদের প্রস্তাবিতরূপ বিবাহে সম্মতি জানাইল।

(গ্রীষ্মের ছুটীর পর)

রমেশ। দাদা, তোমার কথাই ঠিক। (সরযূর ফটো দেখাইয়া) এ চেহারাতে এমন একটি কমনীয়তা আছে, যাহা খুবই দুর্লভ। ইহার মাধুর্য্য অনুভব করিবার জিনিস, ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

যোগেশ। রমেশ, তুই যে বলেছিলি, শূর্পনখার মত নাকে নোলক শোভা পায় না, তাহা যথার্থই। (সরলার ফটো দেখাইয়া) বাস্তবিক 'নোলকপরা গুচ্ছঝরা' মুখখানি লাবণ্যে ভরা। এই রকম নাকের জন্যই বুঝি নোলকের সৃষ্টি।

(টিপ্পনি)

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, যোগেশের সঙ্গে সরযূর ও রমেশের সঙ্গে সরলার বিবাহ না হইয়া যোগেশের সঙ্গে সরলার ও রমেশের সঙ্গে সরযূর বিবাহ হইয়াছে। পাঠক-পাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—এ রকমটি কেন হইল? তাহার উত্তরে বলিতে হইবে যে, 'সরকার' ফটো দুইখানি পাঠাইবার সময় ভুল করিয়া সরযূর ফটোতে 'সরলা' ও সরলার ফটোতে 'সরযূ' লিখিয়া দিয়াছিল।

শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মজুমদার।

বাহিক ইন্সিওর করিতে হইলে
হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেডে
পত্র লিখুন।
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা।

৬ষ্ঠ বর্ষ। | অগ্রহায়ণ, ১৩২২ | ৮ম সংখ্যা।

আর্য্যাবর্ত্ত

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ
সম্পাদিত।

সূচী।

সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৩২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

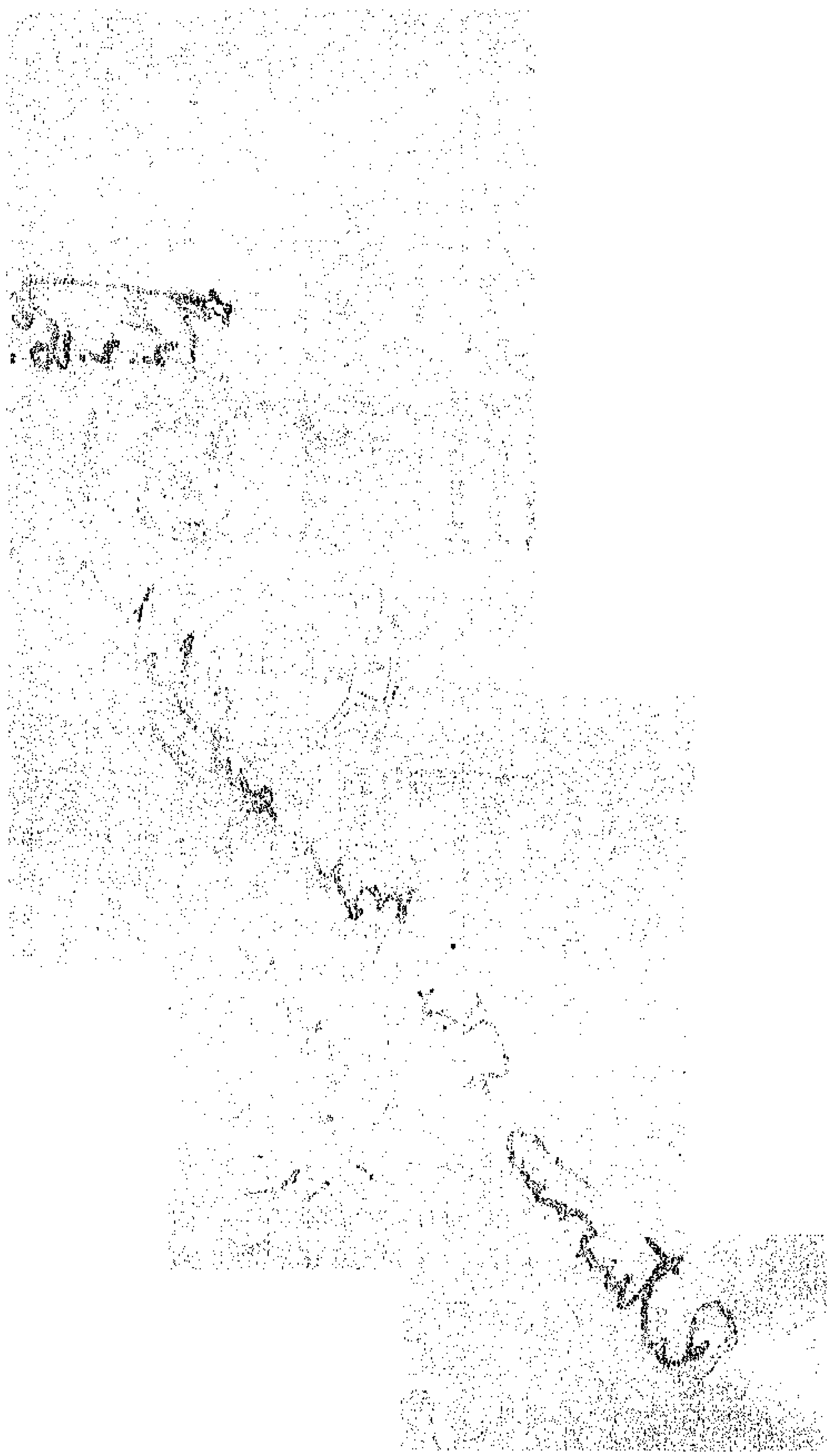
প্রতি সংখ্যা [illegible] আনা।] [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা।

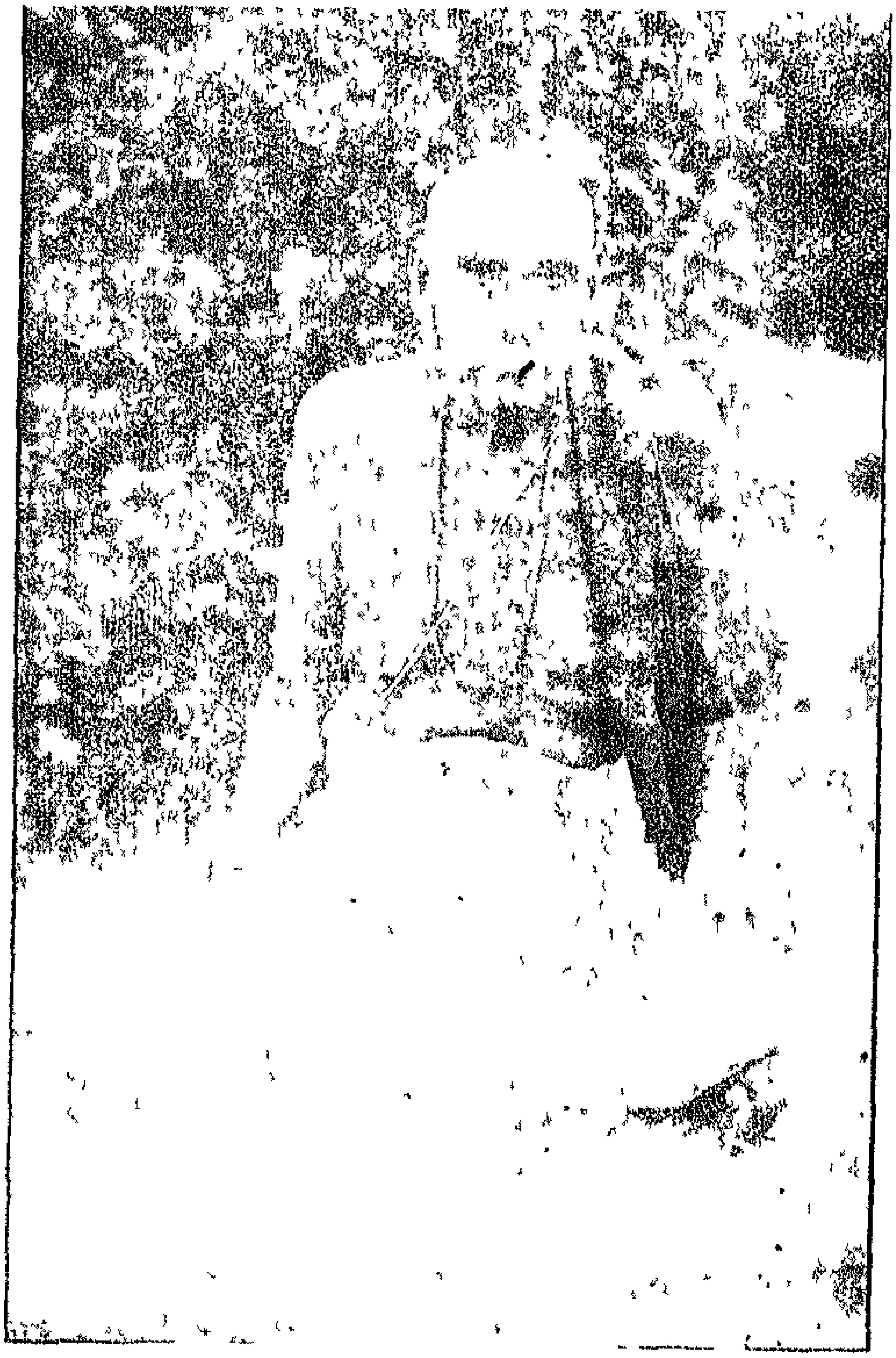
সেট এণ্ড কোং
জুয়েলার্স
বিনা পানে
গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার-
নির্ম্মাতা



আসল গিনি স্বর্ণের
পাশি মাকড়ি
প্রতি জোড়া
১০, দশ
টাকা।

২০৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।





মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় রাখালদাস ন্যায়রত্ন।

অবিশ্বাস।

মথুরার রথ এসেছে লইতে
ব্রজের রাখাল-রাজে ;
এ কথা কোথায় শুনে এলি তোরা ?
শুনে হাসি পায় লাজে।
পিতামাতা বাঁধা পাষাণ কারায়
একি কথা কাণাকাণি ?
কি হবে গোকুলে এ কথা শুনিলে
মোদের যশোদা-রাণী ?
রাজার পীড়নে পীড়িত প্রজারা
রাখালে করিবে রাজা।
বাঁশী বিনা যা'র অসি নাই সে-ই
নৃপতিরে দিবে সাজা।
বনে বনে ধেনু শুনি যা'র বেণু
সাঁঝে গৃহে ফিরি' চলে ;
বাঁশীসুরে যা'র গৃহ-কাজ ফেলি,
গোপবালা যায় জলে ;—
পীত ধড়া যা'র শ্যাম দেহে শোভে,
শিখিপাখা শোভে শিরে ;—
ছাড়িয়া গোকুল, ছাড়িয়া গোপিকা,
ছাড়িয়া যমুনা-তীরে,
যা'রে রে কোথায় কোন মথুরায় ?
রাজা হয়ে কিবা সুখ –
যদি মনে জাগে নিশিদিন তা'র
গোপীর মলিন মুখ ?
সে যে গোপিকার, গোপিকা তাহার,
সে যে ব্রজবাসীপ্রাণ

BENGAL LIBRARY
WRITERS BUILDINGS.
- 1 - 1916

সে যে রাধিকায় আপনা বিকায়
রাধার নিঠুর কান।
ব্রজের কানাই যা'বে মথুরায় ?
কথা শুনে পায় হাসি—
পাষাণে কখন ফুটে কি নলিনী
সলিলে অনলরাশি ?
এ কথা কোথায় শুনে এলি তোরা ?
কি হ'ল তোদের বল ?
এখনি বাঁশরী বাজিবে—ডাকিবে,
মুছে ফেল আঁখিজল।
তুলে আনা ফুল ফেলে দিলি তোরা !
গাঁথিবি না ফুলমালা ?
বনমালা গলে দোলায়ে না দিলে
মনে কি করিবে কালা ?
অভিমানে ম্লান হ'বে মুখ তা'র
বাজাবে না আর বাঁশী,
নয়নে অধীরে উঠিবে না ফুটি'
ভুবন-ভুলান হাসি।
হেরিয়া সে মুখ ফেটে যাবে বুক,
কেমনে বাঁধিব হিয়া ?
যা' ছিল সকলি সঁপেছি চরণে,
তুষিব আর কি দিয়া ?
চল সবে চল যমুনার কূলে,
ওই শুন বাঁশী বাজে।
বাঁশী নয় ? তবে ও বাঁশী কি বাজে
আমারি হৃদয়-মাঝে ?

অশ্রু।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জয়।

অনেক সময় বাক্য, দৃষ্টি, মুখভাব শাণিত অস্ত্রের অপেক্ষা অধিক আঘাত দিতে পারে। অশোকের কথা—তাহার দৃষ্টি—তাহার মুখভাব অশ্রুকে আহত করিয়াছিল। তাহার মনে হইল,তাহার পদতল হইতে হর্ম্ম্যতল সরিয়া যাইতেছে। সে টেবল ধরিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের মধ্যেই এই ভাব জয় করিয়া প্রবল চেষ্টায় আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল। দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা যাহাকে আত্মনির্ভরশীল করে, সে সহজে ভাবাবেশে অভিভূত বা বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয় না। অশোকের দয়া তাহাকে যে ঋণে বদ্ধ করিয়াছে, তাহা হইতে মুক্তি সম্ভব হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্নেহের ঋণ কি সে শোধ করিতে পারে? বিশেষ, অশোকের সাহায্যে সে তাহার দুর্ভাগ্যদাবানলদগ্ধ জীবনে যে আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছে, সে যে কখনও সে আনন্দ—সে শান্তি পাইবার আশাও করিতে পারে নাই! অশোক তাহার জন্য বেদনা পাইয়াছে মনে করিয়া সে হৃদয়ে বেদনা অনুভব করিল। অশোকের বেদনা দূর করিবার জন্য সে জীবন দিতে পারে; কিন্তু যে হৃদয় দিতে পারিলে সে বেদনা অপনীত হয়, সে হৃদয় ত সে দিতে পারে না। যদি—

অশ্রু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

অশোকের দৃষ্টি তখনও যেন তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছিল, অশোকের কথা তখনও যেন তাহার শ্রবণে তীব্র তিরস্কারের মত ধ্বনিত হইতেছিল। অশোক বেদনা পাইয়াছে মনে করিয়া সে যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল সে বেদনা বুঝি অশোকের বেদনা হইতেও তীব্র। হতাশার বেদনা সান্ত্বনার প্রলেপে প্রশমিত হয়—কালের ভেষজে দূর হয়, মনস্তাপের বেদনাবহ্নি চিন্তার ইন্ধনে পুষ্ট হয়—তাহার নির্ব্বাণ নাই। অশ্রু যতই অশোকের কথা মনে করিতেছিল, ততই তাহার হৃদয় বেদনায় অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল। সে বুঝিল, অশোক তাহাকে

ক্ষমা না করিলে সে শান্তি লাভ করিতে পারিবে না। যে জীবন-কথা সে এত দিন সযত্নে সংগোপনে রাখিয়াছে—আজ তাহা প্রকাশের সময় উপস্থিত; আজ আর সঙ্কোচের সময় নাই। সে বুঝিল, তাহার জীবনের অন্ধকারে সে অল্পকালের জন্য যে আলোক উপভোগ করিয়াছে, এবার সে আলোক নির্ব্বাপিত হইতেছে। কিন্তু যদি তাহার ভাগ্যে আলোকলাভ নাই, তবে সে কেমন করিয়া আলোকলাভের আশা করিবে? সে কর্ত্তব্য স্থির করিল। যে জীবনে কোন আশায় কখনও হতাশ হয় নাই, প্রাচুর্য্যপরিবেষ্টিত হইয়া সকল কাযেই সাফল্য লাভ করিয়াছে, সে হতাশার বেদনায় অত্যন্ত ব্যথিত—বিচলিত হয়। অশোকের তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ, আজ অশ্রুর কথায় সে যে আশায় হতাশ হইয়াছে—সে আশার বিস্তারও যেমন বিশাল বেগও তেমনই প্রবল। তাই সে অশ্রুর উত্তরে এমনই বিচলিত হইয়াছিল যে, তাহার স্বাভাবিক সংযমও সংরক্ষিত করিতে পারে নাই, তখন তাহার হৃদয়ে বিচারের অবকাশও যেন ছিল না। কিন্তু তাহার যে স্বাভাবিক স্থিরবুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা অশ্রুর অপ্রত্যাশিত উত্তরে মুহূর্ত্তের জন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সে আপনার ঘরে ফিরিতে না ফিরিতেই সেই স্থিরবুদ্ধি ও বিচারক্ষমতা প্রবল হইয়া উঠিল।

তখন সে আপনার ব্যবহারের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইল। বিশ্লেষণ করিয়া সে লজ্জিত হইল।

সে ভাবিল, অশ্রুর অপরাধ কি? অশ্রুর যে অনাবিল সরলতায় সে মুগ্ধ হইয়াছে, সে সরলতায় চাতুরীর কলঙ্ক স্পর্শিতে পারে না। তাহার সহিত ব্যবহারে অশ্রু ত কোনরূপ চাতুরী করে নাই! সে ইচ্ছা করিয়া কোন দিন অশ্রুর জীবন-কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; পাছে অশ্রু ব্যথা পায় বলিয়া মা'কেও জিজ্ঞাসা করিতে দেয় নাই।

অশ্রুর জীবনের যে কথা অশ্রু স্বেচ্ছায় তাহাকে বলে নাই, তাহার সে সকল কথা জানিবার অধিকার কি? বিপন্না—অসহায়া—মরণাহতা অশ্রুকে সে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। সে মানুষের স্বাভাবিক করুণাপ্রণোদিত হইয়া সে কার্য্য করিয়াছিল। এই করুণার বশে কত শত্রু শত্রুর বিপদে শত্রুতা বিস্মৃত হয়—করুণা ঘৃণাকে পরাজিত করে; কত লোক করুণাবশে কত স্বার্থত্যাগ করে। সে সেরূপ কিছুই করে নাই। আর আজ সে সেই সামান্য উপকারের ভিত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে? অশোক আপনার স্বার্থপরতায় আপনি লজ্জিত হইল, আপনার শিক্ষাকে ধিক্কার দিল।

তাহার পর সে অশ্রুর কি করিয়াছে? জাহাজে প্রথম পরিচয়ে অশোক যখন

তাহাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিবার কথা বলিয়াছিল, তখনই অশ্রু বলিয়াছিল, "আমার জন্য তোমার কায ফেলিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছি; আর দিতে চাহি না।" একে একে কত কথা আজ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যখন জমীদারীতে যায়, তখনও অশ্রু বলিয়াছিল, "তোমার কায না সারিয়া তুমি আসিও না। আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ আর বাড়াইও না।" তখন যে তাহার সব হারাইয়াছে—রিক্ত—অসহায় অবস্থায় সংসার-সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়াছে। সে সময় তাহার পক্ষে আপনার হৃতসর্ব্বস্বের সন্ধান না করিয়া, তাহার অসুবিধা হইবে বলিয়া সেই নিঃসঙ্গ প্রবাসে কালযাপন কত কষ্টকর, তাহা মনে করিয়া সে বিস্মিত হইল। তাহার মনে অশ্রুর প্রতি শ্রদ্ধারই আবির্ভাব হইল।

আবার কলিকাতায় আসিয়াই অশ্রু অশোকের গৃহত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইয়া জীবনের একটা স্বাধীন অবলম্বন সন্ধান করিতে চাহিয়াছিল। মা তাহাকে যাইতে দেন নাই; অশোক তাহাকে যাইতে দেয় নাই। সত্য সে অশোকের পরিবারে আশ্রয় পাইয়াছে। কিন্তু সে তাহার পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছে, তাহা কি সামান্য? সে তাহার গৃহে নূতন সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত করিয়াছে, মা'কে ঈপ্সিত বিশ্রামের সুখ দিয়াছে, আর তাহাকে নূতন জীবনের আস্বাদ দিয়াছে। সে সকলের মূল্য কত? পুরুষের ভালবাসা স্বার্থসর্ব্বস্ব। যে কেবল আপনার সুখের জন্যই ভালবাসিতে পারে—আপনার সুখ বিস্মৃত হইয়া প্রেমাস্পদের সুখের জন্য তাহাকে ভালবাসিতে পারে না, সে ভালবাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অশোক মনে করিল, সে যে ভালবাসা অশ্রুকে দিতে গিয়াছিল এবং যাহাতে আঘাত পাইয়া সে আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল—সে ভালবাসা কোন রূপেই অশ্রুর গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এই সামান্য কথাটাও সে বুঝিতে পারে নাই কেন?

অশোক লজ্জায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে মনে করিল, তাহার ব্যবহারে অশ্রু নিশ্চয়ই হৃদয়ে বিষম বেদনা পাইয়াছে। সে স্থির করিল, সে তাহার সেই ব্যবহারের জন্য অশ্রুর কাছে ক্ষমা চাহিবে। অশ্রু কি তাহাকে ক্ষমা করিবে না? সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সেই সময় অশ্রু সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার ব্যবহারে চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র নাই—কেবল তাহার মুখের বিবর্ণতায় তখনও তাহার পরিচয় রহিয়াছে।

অশ্রু বলিল, "অশোক, আমাকে ক্ষমা কর।"

অশোকের মনে হইল, এই রমণীর উদার ব্যবহারে তাহার যে দীনতা—হীনতা তাহার আপনার নিকট সপ্রকাশ হইল, তাহা লইয়া সে অশ্রুর সম্মুখে দাঁড়াইতেও লজ্জিত হইল। সে বলিল, "আমি তোমার কাছেই যাইতেছিলাম। আমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ক্ষমা চাহিয়া আমাকে আর লজ্জিত করিও না।"

"তোমার ক্ষমা চাহিবার কোনই কারণ নাই। আমারই অপরাধ। তোমার কাছে আর একটু কায আছে।"

"কি কায, অশ্রু ?"

"এত দিন তোমার কাছেও যে কথা গোপন করিয়াছি, আজ আমি তাহাই ব্যক্ত করিতে চাহি। তোমাকে আজ আমার জীবন-কথা বলিব।"

অশোক ব্যস্তভাবে বলিল, "না ! না ! আমার তাহা শুনিবার অধিকার নাই। আমি তাহা শুনিব না। আমি তাহা শুনিতে চাহি না।"

অশ্রু স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, অশোক ?"

"আমার একান্ত অনুরোধ—আমার প্রার্থনা, তুমি আমার এই মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতি ভুলিয়া যাও। বর্ত্তমানের ছায়া যেন আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনে পতিত না হয়। তুমি মনে করিও, আমার আজিকার কথা একটা দুঃস্বপ্নমাত্র। অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে এই বর্ত্তমানের ব্যবধানে রেখাটুকু কি কিছুতেই মুছিবার নহে ?"

"সে বিচার পরে করিও। তুমি শুনিতে না চাহিলেও আমি তোমাকে আমার সব কথা বলিতে চাহি। আমি আর তোমারও নিকট রহস্যকুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিতে পারি না। আমি যে তোমাকেও আমার প্রকৃত পরিচয় দিই নাই, এ কথা গুরুভারের মত আমার মনে চাপিয়া আছে। আমি বহুবার তোমাকে সে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, বলিতে পারি নাই। আজ সে কথা বলিবার সময় আসিয়াছে। এতদিন যে সময়ের কথা মনে করিয়া আমি শঙ্কিতা হইয়াছি, আজ সেই সময় আসিয়াছে। আজ আমি সে কথা বলিব, আমি সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।"

অশোকের আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝি বাস্তবের আলোকে তাহার কল্পিত—মানস-প্রতিমার সৌন্দর্য্যশ্রী ক্ষুন্ন হইয়া যাইবে—বুঝি তাহার কল্পিত আদর্শে কোথাও কোন দৈন্য দেখা দিবে। সে বলিল, "সে কথায় কায নাই। তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও মনে করিও না যে, সে কথায় তোমার সম্বন্ধে আমার ধারণায় বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবে। তুমি আমার হৃদয়ে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত করিয়াছ—জীবনে যে নূতন আনন্দ দিয়াছ,তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আর সেই সব স্মরণ

করিয়াই আজ আমি আমার ব্যবহারে—আমার আত্মবিস্মৃতিতে—আমার অপরাধে লজ্জিত হইতেছি, আর আপনাকে ধিক্কার দিতেছি।"

অশ্রু বলিল, "তোমার লজ্জার কোন কারণ নাই। আমি জানি, অপরাধ আমার। কিন্তু আমার অনুরোধ—আমার অনুনয়, তুমি আমার কথা শুন। আমার স্বরূপ জানিয়া—আমার অপরাধ বুঝিয়া আমাকে ক্ষমা কর।"

অশ্রুর অনুরোধ—অনুনয় অশোক অলঙ্ঘনীয় আদেশের মতই মনে করিল। সে আর কোন আপত্তি করিতে পারিল না; কোন কথা কহিল না। সে অশ্রুর কথার প্রতীক্ষায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

অশ্রু অশোককে বসিতে বলিল। অশোক উপবেশন করিল।

তখন অশ্রু আপনি আর একখানি কেদারা টানিয়া লইয়া বসিল।

অশোক বুঝিল, আজ জয় অশ্রুর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জীবন-কথা।

অশ্রু বলিতে লাগিল—

"আমার পিতার কথা তোমাকে বলিয়াছি। তিনি যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, সেই সময় দেশে হিন্দুর বিলাতযাত্রাসম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেটা বোধ হয়, বিলাতযাত্রার আন্দোলনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় পর্ব্ব। কিন্তু তখনও কলিকাতার হিন্দুসমাজে এক দল বিলাতযাত্রার বিরোধী ছিলেন। তখন বিলাত ফেরতদিগের সংখ্যাও অল্প নহে—প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। বিশেষ, তাঁহারা তখন আর তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে থাকিতে চাহেন না, সমাজেও যে তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন নাই এমন, নহে—তবে সেটা ঠিক প্রকাশ্যে নহে। যাঁহারা বিলাতযাত্রার বিরোধীদলের নেতা, আমার মাতামহ তাঁহাদিগের অন্যতম।

"তখন দুই দলের সভা-সমিতি হইতেছে, তর্ক শাস্ত্র লইয়া—ব্যাখ্যা লইয়া। আমার পিতা কয়টি সভায় বিলাতযাত্রার সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন—বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধবাদিগণের একটি সভার সংবাদ প্রচারিত হইলে প্রতিপক্ষদল স্থির করিলেন, আমার পিতা সেই সভায় বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তি

খণ্ডিত করিয়া বক্তৃতা করিবেন। দুই পক্ষই প্রস্তুত হইয়া সভাস্থলে দেখা দিলেন।

"সে সভায় যাহার সভাপতি হইবার কথা ছিল, তিনি বিশেষ কার্য্যের জন্য সভায় আসিতে পারিলেন না। আমার মাতামহ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধবাদীপক্ষে কয়টি বক্তৃতা হইল, তাহার পর তাঁহাদের মতসমর্থক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে প্রতিপক্ষের একজন সে প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে উঠিল। দুই পক্ষে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। বাবা স্থির করিয়াছিলেন, এ সভায় তিনি কোন কথা বলিবেন না। কিন্তু সভাস্থলে বিশৃঙ্খল অবস্থায় তাঁহার পক্ষ পরাজিত হয় দেখিয়া তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতের সমর্থন করিতে উঠিলেন। তরুণবয়স্কদিগের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। কোলাহল থামিয়া গেল। তরুণ বক্তার উৎসাহদীপ্ত বক্তৃতায় শ্রোতৃগণ মুগ্ধ হইলেন। সভায় বিরুদ্ধবাদিগণের পরাজয় হইল।

"আমার মাতামহ পিতার এই ব্যবহারকে ব্যক্তিগত অপমান মনে করিলেন। তখন আমার বয়স দুই মাস মাত্র। মা তখন তাঁহার পিত্রালয়ে। মাতামহ পিতার ব্যবহারের নিন্দা করিয়া মা'র নিকট তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। মা সে কথা জানাইয়া বাবাকে পত্র লিখিলেন।

"ইহার পরদিন বাবা নিয়মিত সময়ে কলেজ হইতে বাড়ী ফিরিলেন না। পিতামহ পুত্রের এক পত্র পাইলেন, তিনি বিশেষ কার্যে স্থানান্তরে যাইতেছেন। পাঁচ দিন পরে তাঁহার পত্র আসিল। তিনি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য বোম্বাই হইতে বিলাতযাত্রা করিলেন। আমার মাতামহ বোধ হয় আর তাঁহার জামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন না; তাহা হইলে মা'কে যেন শ্বশুরালয়ে আনা হয়।

"একমাত্র পুত্রের ব্যবহারে বিপত্নীক পিতামহ তুষ্ট বই রুষ্ট হইলেন না। আমার মাতামহ বনিয়াদী ধনিবংশজ। তিনি কোন দিন মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন এটর্ণী বৈবাহিককে আপনার সমান ভাবিতেন না। ছেলের বাপ পিতামহও সে অপমানটুকু মন হইতে মুছেন নাই। পুত্রের পত্র পাইয়া তিনি বৈবাহিককে পত্র লিখিলেন—'বামনদাস বিদ্যাশিক্ষার্থ বিলাতে গিয়াছেন। আপনি বোধ হয় আর জামাতার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিবেন না। বামনদাসের অভিপ্রায়মত লিখিতেছি, যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে কল্যাণী বধূমাতাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব। পিতার অভিমান ও মাতার অশ্রুসিক্ত মুখের স্মৃতি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা শ্বশুরালয়ে আসিলেন।

"মা'র শরীর কোন দিনই বিশেষ সবল—স্বাস্থ্য কখনই খুব ভাল ছিল না।

পিতার সহিত স্বামীর মনোমালিন্যে—বিবাদে তিনি মনে বড় বেদনা পাইলেন, ফলে, তাঁহার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় এক বৎসর কাটিল। মা সংবাদ পাইলেন, দিদিমা পীড়িতা। তিনি সংবাদ পাইতে লাগিলেন, দিদিমা'র পীড়া দিন দিন বাড়িতেছে, আর তিনি কন্যাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছেন; কিন্তু মাতামহের সঙ্কল্প অটল—কন্যার সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কন্যাকে গৃহে আনিবেন না। শেষে এক দিন সংবাদ আসিল—মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও কন্যার নাম মুখে লইয়া মাতামহী লোকান্তরিতা হইয়াছেন। এই সংবাদের বিষম আঘাতে মা'র স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গেল। সেই দিন হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মা'র নয়নে জল শুকায় নাই। এই সময় আমার নামকরণ হয়। মা-ই আমার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু।

"আরও এক বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া—সরকারী চাকরী লইয়া বাবা দেশে ফিরিলেন। মা'কে দেখিয়া তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, মা'র শরীরে জীবনীশক্তির অভাব, চিকিৎসায় আর সে অভাব পূর্ণ হইবার সময় নাই। তাঁহার মনে হইল, তাঁহার সাফল্যগৌরব বেদনার বজ্ররূপে তাঁহারই হৃদয়ে পতিত হইয়াছে, সে হৃদয়ে সুখের আশা নিমেষে ভস্মীভূত হইয়াছে। পিতামহ পিতাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে আসিতে বলিলেন। পিতা উত্তর দিলেন, 'যে সমাজে নিরপরাধ কন্যার মৃত্যুশয্যাশায়ী মাতার সহিত সাক্ষাতের অধিকারও নাই, সে সমাজে আমার কায নাই।' বাবা মা'কে লইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। চিকিৎসা, শুশ্রূষা, যত্ন—কিছুরই অভাব হইল না। কিন্তু মানুষ সব দিতে পারে, প্রাণ দিতে পারে না। মা কি জানিবার পূর্ব্বেই আমি মাতৃহীন হইলাম।

"মৃত্যুর পূর্ব্বেই মা বাবাকে বলিয়াছিলেন, 'আমার অশ্রুর যেন অযত্ন না হয়।' বোধ হয় মা'র মনে হইয়াছিল, অতঃপর পিতা আবার বিবাহ করিবেন। কিন্তু মা পত্নী হইয়াও পতির স্বভাবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। পত্নীর স্মৃতি বক্ষে বহিয়া পিতা কাল কাটাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল কর্ত্তব্যবোধে কায করিতেন, আর আমাকে লইয়া থাকিতেন। তিনি আমাকে যেরূপ যত্নে লালিত-পালিত করিয়াছিলেন, বুঝি মা-ও আমাকে সেরূপ যত্নে লালিত করিতে পারিতেন না।"

অশ্রু বুঝিতে পারিল, পিতার কথায় তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, তাহার রমণীহৃদয়ের কোমলতা তাহাকে অভিভূত করিতেছে। সে প্রবল চেষ্টায় ভাবাবেগ সংযত করিয়া বলিতে লাগিল,—

"কিন্তু বাবার কেমন বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, মা'র অকাল-মৃত্যুর জন্য তিনিই

দায়ী। এই বিশ্বাসের জন্য তাঁহার মনে সুখ ছিল না, তিনি কেবলই ভাবিতেন। কত দিন রাত্রিতে জাগিয়া আমি দেখিয়াছি, তিনি আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মা'র প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন—আর, তাঁহার দুই নেত্র ভরিয়া দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে!

"এমন দুর্ভাবনায় শরীর কত দিন থাকে? ধীরে ধীরে পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। হৃদয়ে যন্ত্রণা ও শিরঃ-পীড়া দেখা দিল। তিনি আরও দুই বৎসর চাকরী করিলেন; তাহার পর চাকরী ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তখন সংসারে তিনি আর আমি। পিতামহ তখন পরলোকে—মাতুল-পরিবারের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শৈশব হইতে আমার আর কোন সঙ্গী ছিল না—আমি বাবার সঙ্গে খেলা করিতাম—বাবার সঙ্গে খাইতাম—বাবার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম। বাবারও জীবনের অন্য কোন অবলম্বন ছিল না।

"অসুস্থ হইয়া বাবা স্বাস্থ্যলাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। সে আমার জন্য। আমার যে আর কেহ নাই! কিন্তু তাঁহার ব্যগ্রতা যত বাড়িতে লাগিল, তাঁহার স্বাস্থ্যও ততই নষ্ট হইতে লাগিল। চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। আমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতাম। কিন্তু সে শুশ্রূষায় কোন ফল ফলিল না। স্বাস্থ্যের সন্ধানে তিনি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে লাগিলেন। সবই বৃথা। কেবল একবার—সিংহলে যাইবার সময় সমুদ্র-ভ্রমণে তিনি যেন কিছু উপকার পাইলেন। তিনি বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আমাকে লইয়া আবার বিলাতে যাইবেন। কিন্তু সেই কথা বলিয়াই তিনি কেমন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন; বোধ হয়, তাঁহার মনে হইল—তিনি বিলাতে যাইয়াই মা'কে হারাইয়াছিলেন। সেই দিন হইতে তিনি আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষে যখন তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিলাম, তখন আর বিলাত-যাত্রার কথা কহিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না।

"কিন্তু বাবার শরীর দিন দিন অধিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণাও বাড়িতে লাগিল। বাবা কলিকাতায় আসিলেন; চিকিৎসকদিগের সহিত পরামর্শ করিলেন, পিতামহের বাড়ী বিক্রয় করিলেন; সব টাকায় আমার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিলেন। তাহার পর আমাকে লইয়া শিমলায় স্বাস্থ্যনিবাসে গমন করিলেন।

"তাঁহার নষ্টস্বাস্থ্য আর ফিরিয়া আসিল না। ক্রমে শারীরিক যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল। মৃত্যুই তখন তাঁহার পক্ষে মুক্তি। তবুও তিনি মরিতে চাহিলেন না—

মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তিনি মরিলে আমার কি হইবে! যন্ত্রণার আতিশয্যে তিনি ক্ষণিক যন্ত্রণানিবৃত্তির জন্য যে ঔষধ ব্যবহার করিতেন, সে ঔষধ অধিকমাত্রায় সেবনের ফল—যন্ত্রণার চিরনির্ব্বাণ। কতদিন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া তিনি আমাকে বলিয়াছেন, 'অশ্রু ঐ ঔষধের শিশিগুলা সরাইয়া রাখ। কি জানি, যদি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া মুহূর্ত্তের অসহিষ্ণুতায় এ জ্বালা জুড়াইয়া ফেলি! তোর যে আর কেহ নাই!' তাঁহার কথা শুনিয়া আমি কাঁদিতেও পারিতাম না। আমার নয়নে জল দেখিলে তিনি অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিতেন, তিনিও কাঁদিতেন। এমনই ভাবে কয় মাস গেল। বাবা আমাকে নিকটে রাখিবার জন্য সমীপাগত মৃত্যুকে দূরে রাখিতে দুর্ব্বল দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু ব্যয়িত করিতে লাগিলেন।

"কিন্তু যন্ত্রণারও শেষ আছে। বাবা বুঝিলেন, তাঁহার মুক্তির সময় আসিতেছে। তখনও তিনি মুক্তি চাহেন নাই, কিন্তু বন্ধন-বিচ্ছেদের আর ত বিলম্ব নাই। এক দিন ঔষধ পান করিয়া যন্ত্রণার ক্ষণিক অবসানের অবসরে তিনি আমার ললাটচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'মা, আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমি চলিলাম। তোমাকে আর কি বলিব! মা, তোমাকে তোমারই হাতে দিয়া চলিলাম। তোমার ভার তোমার। তোমার মা তোমার নাম রাখিয়াছিলেন—অশ্রু। অশ্রুর মত পবিত্র থাকিও।

"ক্রমে সে মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গেল—তখনও সেই অশ্রুপূর্ণ নয়নের দৃষ্টি আমার মুখে বদ্ধ।"

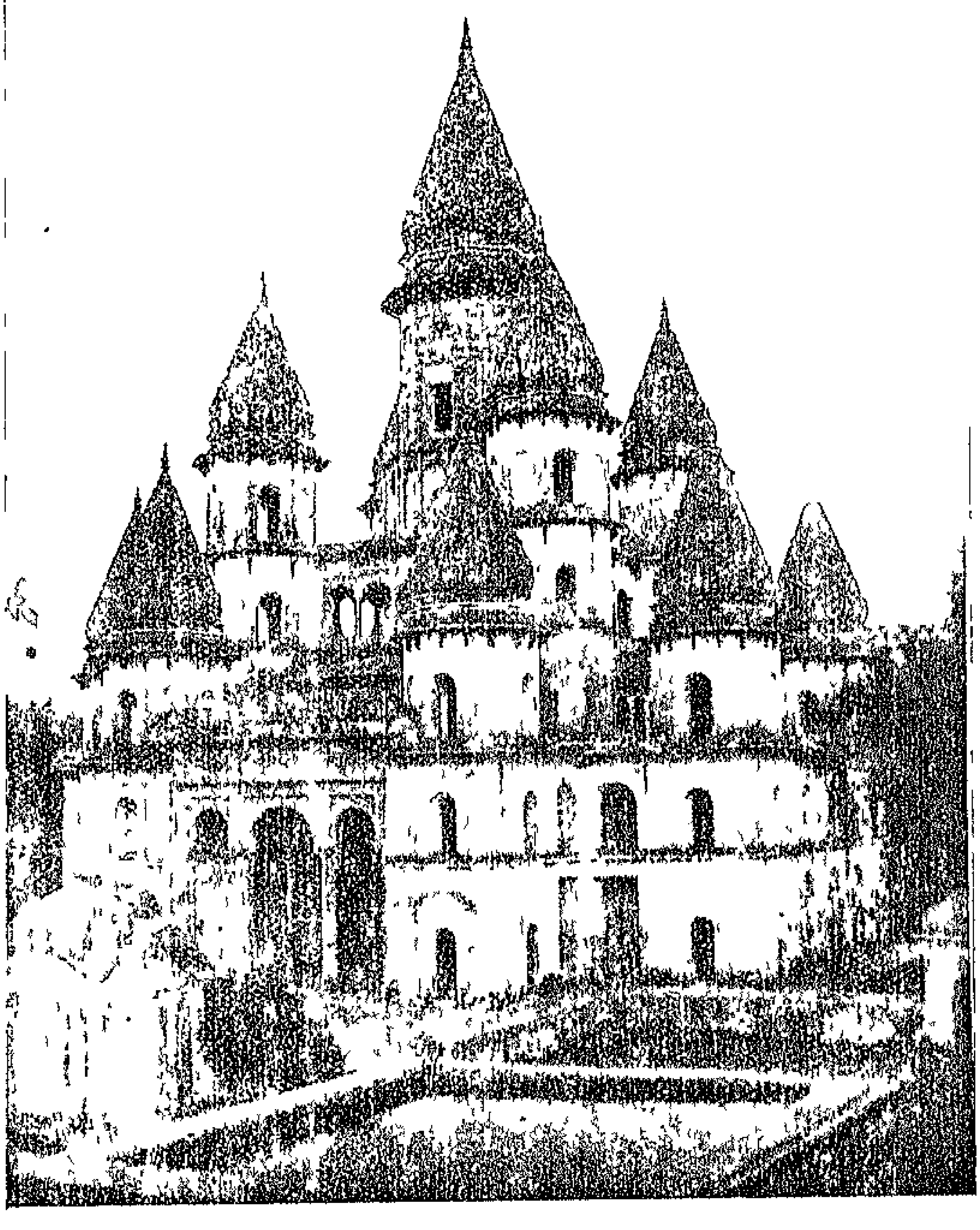
অশ্রুর দুই চক্ষু হইতে বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অশোকের চক্ষুও জলে ভরিয়া উঠিল।

হংসেশ্বরীর মন্দির ও বাঁশবাড়ীয়া রাজবংশ।

হুগলীর উপকণ্ঠে বাঁশবাড়ীয়ায় হংসেশ্বরীর মন্দির সে অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সমগ্র বঙ্গে এই প্রণালীতে নির্ম্মিত মন্দির আর আছে কি না, সন্দেহ। প্রবাদ এই যে, বাঁশবেড়ীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেবাদিত্য দত্ত কান্যকুব্জ হইতে সপরিবারে আসিয়া প্রথমে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জিলার মায়াপুরে বসতি করেন। অল্পদিন পরে তিনি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপের নিকটে বাস করিয়া বাসগ্রামকে 'দত্তবাটী' নামে অভিহিত করেন। তিনি রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া, নামে না হইলেও কার্য্যতঃ, তাঁহার অমাত্য হইয়া উঠেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কয় পুরুষের মধ্যে কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। তাহার পর, বল্লালসেনের রাজত্বকালে যাদব দত্ত বল্লালের কৌলীন্যপ্রথার বিরুদ্ধবাদী হইয়া ও অন্যান্য কারণে রাজার বিরাগভাজন হইয়া রাজাদেশে সবংশে নিহত হয়েন। কিন্তু তদীয় পুত্র মহেশ্বরের পত্নী তৎকালে গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে উবরুর জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র কবি দত্ত রাজা লক্ষণ সেনের প্রিয়পাত্র হইয়া দত্তবাটীতে আসিয়া বাস করেন। * কবির দুই পৌত্র—কিশু (কেশব) বিশু (বিষ্ণু)। কেশবই বাঁশবাড়ীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তদীয় কনিষ্ঠ মুসলমান-রাজসরকারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিনাজপুর অঞ্চলে বহু সম্পত্তি অর্জ্জন করেন ও "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার ন্যায় মুসলমান রাজসরকারে উচ্চপদ লাভ করেন। রাজমহল তখন বাঙ্গালার রাজধানী। শ্রীমন্ত

*বাঁশবেড়ীয়ার রাজবংশের ইতিহাস-লেখক শম্ভুচন্দ্র দেব লেখেন, এই সময় তিনি খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু খাঁ উপাধি হিন্দুরাজদত্ত বলিয়া মনে হয় না। আমাদের বিশ্বাস, তিনি বংশের সর্ব্বনাশকারীর নির্য্যাতনের জন্য প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া সেনবংশের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং মুসলমান বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক খাঁ উপাধিতে ভূষিত হয়েন। Bengal—Past and Present পত্রে বাঁশবাড়ীয়া-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে খাঁ উপাধিপ্রাপ্তির কোন উল্লেখ নাই।



হংসেশ্বরীর মন্দির।

অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে তাঁহার জামাতা হরিরাম ঘোষ তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েন। দিনাজপুরের রাজবংশের তিনিই আদিপুরুষ।

ক্রমে বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্ব সংস্থাপিত হইলে কেশবের পুত্র দ্বারকানাথ অত্যাচারভয়ে মুর্শিদাবাদ হইতে যথাসম্ভব দূরে বাসমানসে দত্তবাড়ী ত্যাগ করিয়া কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী পাটুলীতে বাস সংস্থাপিত করেন। শ্রীরামপুরের গোস্বামিবংশও এই পাটুলী হইতে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিলেন। পাটুলীতে দত্তদিগের গৃহ কিছুকাল পরে ভাগীরথীর গর্ভগত হয়। ঐ স্থান এখনও "পাটুলীর দহ" নামে পরিচিত।

দ্বারকানাথের পৌত্র সহস্রাক্ষ মোগল-সম্রাট আকবরের অনুগ্রহে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে জমীদার বলিয়া গণ্য হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার পুত্র উদয়ও আক্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়া "রায়" উপাধি ও নদীয়ার অন্তর্গত ফয়জুল্লাপুর পরগণা জমীদারী প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি তাঁহার বংশধরগণ "রায়" উপাধিই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উদয়ের সম্পূর্ণ উপাধি ছিল—"সভাপতি রায়।" ঘটকের কারিকাতেও দেখা যায়—"পাটুলীতে দত্ত উদয় সভা শোভা করে।" এই সময় মানসিংহ আকবর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রতাপ আদিত্যের শাসনজন্য বাঙ্গালায় আগমন করেন। উদয় নানা প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করায় মানসিংহের অনুগ্রহে তাঁহার উপাধি ও জমীদারীলাভ ঘটে।

উদয়ের পুত্র জয়ানন্দ বাদশাহ শাহজাহানের নিকট হইতে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। তিনি নদীয়া-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের সমসাময়িক। উভয়ের পরিবারে বহু দিন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সম্প্রীতি ছিল. উভয়েই খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে তনুত্যাগ করেন। জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবও শাহজাহানের অনুগ্রহে "চৌধুরী" ও "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তিনি বহু লাখেরাজ সম্পত্তি ও হলদহ, হাবেলীসহর প্রভৃতি ২১খানি পরগণা জমীদারী লাভ করেন। এই সকল সম্পত্তির অধিকাংশই সরকার সাঁতগাঁর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া রাঘব স্বীয় সম্পত্তির শাসনসৌকর্য্যার্থে নিম্ন বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী হুগলীর নিকটে বাস করাই শ্রেয়ঃ মনে করেন এবং হুগলী হইতে ক্রোশমাত্র দূরবর্ত্তীস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার "বংশবাটী" নামকরণ করেন। বংশবাটীই এক্ষণে বাঁশবেড়ীয়া বলিয়া পরিচিত। রাঘব বৎসরের অধিকাংশ কাল এই স্থানেই যাপন করিতেন, কেবল দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজাদির সময় পাটুলীতে যাইতেন। তাঁহার সময়েই দেবাদিত্যের বংশের চরম উন্নতি হয়।

রাঘবের দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেব পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া জ্যেষ্ঠ

দুই-তৃতীয়াংশ ও কনিষ্ঠ এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করেন। রামেশ্বর প্রধানতঃ বাঁশ-বাড়ীয়াতেই বাস করিতেন। এই সময় হইতে পাটুলীর অবনতি আরম্ভ হয়। বাসুদেবের দুই পুত্র মনোহর ও গদাধর আবার পৈতৃক সম্পত্তি দুই-তৃতীয়াংশে ও এক-তৃতীয়াংশে বিভক্ত করিয়া লয়েন। মনোহর শেওড়া-ফুলীতে বাস করেন। তিনি শেওড়াফুলীবংশের বংশপতি। গদাধর অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগত হইলে মনোহরের পুত্র রাজচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র দুর্গাপ্রসাদ তাঁহার সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বালীতে বাস করিতে থাকেন। তদ-বধি এই দুই বংশ "দশআনীর" ও "ছয় আনীর" জমীদার বলিয়া পরিচিত। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহাদের সম্পত্তি বাঁশবাড়ীয়ার সম্পূর্ণ সম্পত্তির ছয় আনীর দশ আনা ও ছয় আনা। রামেশ্বর ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের নিকট জ্যেষ্ঠাধিকারসূত্রে বংশানুক্রমে "রাজামহাশয়" উপাধি ও পাঁচ খণ্ড খেলাৎ লাভ করেন। ঐ বৎসর সনন্দবলে তিনি বাসজন্য ৪০১ বিঘা জমী নিষ্করে ভোগাধিকার ও দ্বাদশটি পর-গণার জমীদারী স্বত্ব লাভ করেন। *

রামেশ্বর ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঁশবাড়ীয়ার বাসুদেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দি-রের প্রত্যেক ইষ্টকে কোন না কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত ; মন্দিরের স্থাপত্যও বিশেষ প্রসংশার্হ। মন্দিরগাত্রে শিলাখণ্ডে নিম্নলিখিত চরণদ্বয় উৎকীর্ণ আছে—

"মহীব্যোমাঙ্গ শীতাংশু গণিতে শকবৎসরে।
শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নির্ম্মমে বিষ্ণুমন্দিরম্ ॥"

এই লিপিতে রামেশ্বর পৈত্রিক দত্ত উপাধিই ব্যবহৃত করিয়াছেন। এই সময় বর্গীর হাঙ্গামাহেতু রামেশ্বর গৃহবেষ্টিত করিয়া প্রায় এক মাইল পরিধিবিশিষ্ট গড় খনন করান।

রামেশ্বরের পুত্রগণও পৈতৃক সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া লয়েন। Select Committeeর পঞ্চম রিপোর্টে এই বিভাগের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুদেব কোন ব্রাহ্মণ জমীদার বাকি খাজনার জন্য মুর্শিদ কুলী খাঁ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইলে তাঁহার সমস্ত দেয় পরিশোধ করিয়া "শূদ্রমণি" উপাধি লাভ করেন। এই সময় বর্গীর উপদ্রব আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় রঘুদেব পিতার খনিত গড়ের বাহিরে আর একটি গড় খনিত করেন। তৎপুত্র গোবিন্দদেবের আমলে অগ্রদ্বীপ পাটুলীর জমীদারীচ্যুত হয়। অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ মেলায় বিপুল

* এই সনন্দ অনুসারে ইংরাজ সরকার ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর হইতে বাঁশ-বাড়ীয়ার ঐ পরিমাণ বাস্তু নিষ্কর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

জনতা হেতু কয়েকজন লোক নিস্পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া জমীদারদিগের "উকীলদিগকে" ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে বাঁশবাড়ীয়ার ও অন্যান্য স্থানের জমীদারদিগের উকীলরা উহা আপনাদের প্রভুদিগের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন না। কিন্তু নদীয়ার রাজার উকীল প্রত্যুৎপন্নমতিত্বসহকারে উহা স্বীয় প্রভুর অধিকারভুক্ত স্বীকার করিয়া বলেন, মেলায় সুব্যবস্থার ত্রুটি হয় না—তবুও লোকাধিক্যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও সুব্যবস্থা করা হইবে। এইরূপে অগ্রদ্বীপ নদীয়ার রাজার অধিকারভুক্ত হয়। *

গোবিন্দদেবের মৃত্যুকালে তদীয় পুত্র নৃসিংহদেব মাতৃগর্ভে। অপুত্রক অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, নবাব আলীবর্দ্দীকে এইরূপ বুঝাইয়া বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদ প্রভুর পক্ষ হইতে বাঁশবাড়ীয়ার দত্তদিগের গঙ্গার দক্ষিণ কূলস্থ জমীদারীর অধিকাংশ ও আরও কোন কোন সম্পত্তি অধিকৃত করিলেন। এই সুযোগে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বামকূলস্থিত হলদহ পরগণা দখল করিয়া লইলেন।

নৃসিংহ দেবের রোজনামচায় এই সকল অধিকার-চ্যুতির বিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণে সে সময়ের পার্শী-বহুল বাঙ্গালার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় "সন ১১৪৭ সালের মাহ আশ্বিনে আমার পিতা গোবিন্দদেব রায়ের কাল হয় সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম—বর্দ্ধমানের জমীদার পেস্কার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে, খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্তপুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমীদারি আপন মালিকের জমীদারি সামিল করিয়া সন ১১৪৮ সালে মাহ বৈশাখে খামাখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিকমতের মালগুজারি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সামিল ছিল তিনিও ঐ সন কাস্যত মজকুর আপন পুত্র শ্রীশম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন। মৌজে কুলিহাণ্ডা মজকুরি তালুক হুগলী চাকলার সামিল ছিল—পীর খাঁ ফৌজদার বর্দ্ধমানের জমীদারকে দখল দিলেন না অতএব তালুক মজকুর আমার দখল আছে। সুবে বাঙ্গালার কোন জমিদার ও তালুকদারের পর এমত বেইনসাপী ও বেদায়ত কখন হয় নাই।"

কোম্পানীর রাজত্ব সংস্থাপিত হইলে নৃসিংহদেব ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এই সকল কথা জানাইয়া বিচারপ্রার্থী হইলে তদন্তে তাঁহার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়। হেষ্টিংসও তাঁহাকে তাঁহার সম্পত্তি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু কোম্পানী তখন

* ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত।

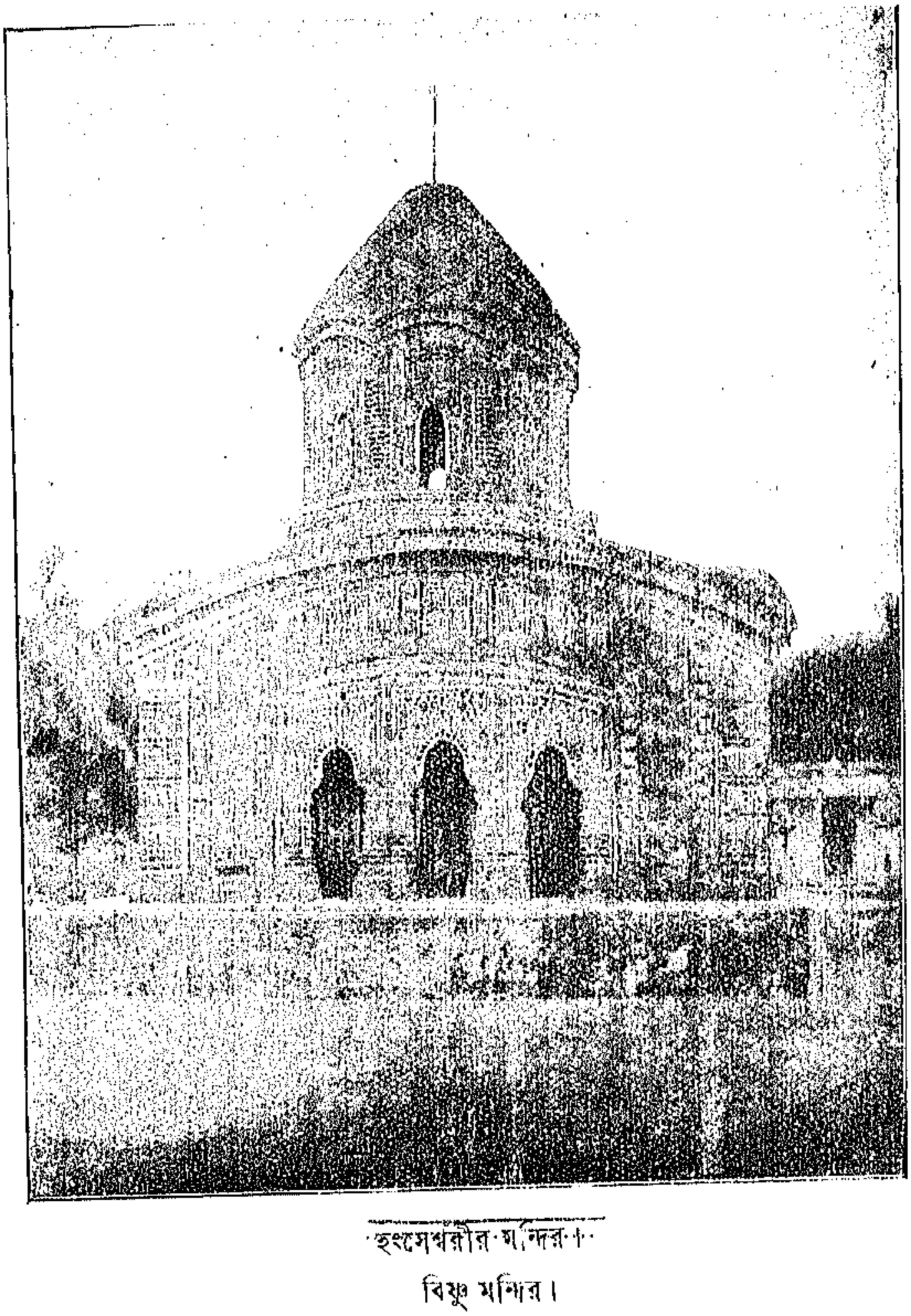
কেবল সুবে বাঙ্গালার দেওয়ান ও ২৪পরগণার জমীদার। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতাবহির্ভূত বলিয়া হেষ্টিংস তাঁহাকে তাঁহার সকল হৃত সম্পত্তি দিতে পারিলেন না, কেবল ২৪পরগণার অন্তর্গত সম্পত্তিগুলি বৰ্দ্ধমানের রাজার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিলেন। তাহাতেই তখন নৃসিংহদেবের অত্যন্ত উপকার হয়। নৃসিংহদেব স্বীয় রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন—"সন ১১৮৫ সালে গবর্ণর-জেনরল শ্রীযুক্ত মেস্তর হিষ্টীন সাহেব ও সাহেবান কৌষল হক ইনসাপ মতে তজবীজ তহকীক করিয়া আমার মিরাষ জানিয়া আমার পৈত্রিক জমীদারির মধ্যে যে সকল মহাল বৰ্দ্ধমান জমীদারের দখল হইতে চব্বিশ পরগণার সামিল হইয়াছিল সেই মহলাতের জমীদারিতে ইস্তক সন ১১৮৬ সাল আমাকে সরফরাজ করিয়াছেন ও কৌসল ও কমিটি হইতে সনন্দ দিয়াছেন।"

এই সময় হেষ্টিংস বাঙ্গালার একখানি যথাযথ মানচিত্র প্রস্তুত করাইতে অভিলাষী হইয়া নৃসিংহদেবকে আদেশ করিলে, তিনি সেই কাৰ্য্য সুসম্পন্ন করিয়া হেষ্টিংসকে সন্তুষ্ট করেন। হেষ্টিংস তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে আদেশ করিলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সেই অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে ধানঘাটা পরগণা প্রদান করেন।

নৃসিংহদেব পার্শী, আরবী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চিত্রবিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার ছিল। তিনি হংসেশ্বরীর মন্দির সুসজ্জিত করিবার জন্য স্বহস্তে যে সকল আদর্শচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, সে সকল ১৯০২ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

লর্ড কর্ণওয়ালিস এ দেশের গভর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইলে নৃসিংহদেব তাঁহার নিকট অভিযোগ করিয়া সকল কথা জানাইলেন। বড় লাট এ বিষয়ের প্রতীকার তাঁহার সাধ্যাতীত বলিয়া রাজাকে বিলাতে বোর্ড-অব-ডিরেক্টারসে নালিস করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পক্ষে তৎকালে সে নালিশের ব্যয় নির্ব্বাহ করা অসাধ্য বলিয়া তিনি ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া কিছু অর্থ-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে কিছু কাল কাশীবাসে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়কে সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে দিয়া কাশীযাত্রা করেন। তৎপূর্ব্বে দেবপ্রসাদলাভাশায় তিনি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাঁশবাড়ীয়ায় স্বয়ম্ভবা দেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার ব্যবস্থা করেন। এই মন্দিরের লিপি এইরূপ

আশাচলেন্দুসম্পূর্ণে শাকে শ্রীমৎ স্বয়ম্ভবা।
রেজে তৎ শ্রীগৃহঞ্চ শ্রীনৃসিংহদেবদত্ততঃ॥



হংসেশ্বরীর মন্দির।

বিষ্ণু মন্দির।

হিন্দু পেট্রিয়ট হইতে]

কাশীতে তিনি তান্ত্রিকমতে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে বৈষয়িক ব্যাপারে বীতস্পৃহ হইয়া সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা ত্যাগ করিলেন ও তদুদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থ বাঁশবাড়ীয়ায় দেবমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করিবেন, স্থির করিলেন। ইতিমধ্যে তিনি ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে কাশীখণ্ড প্রণয়নে সাহায্য করেন। গ্রন্থে সে সাহায্যের উল্লেখ দেখা যায়—

"মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি।
ইহার সহায় হয় কাহাকে না দেখি॥
মিত্রশত চৌদ্দশকে পৌষমাস যবে।
আমার মানসমত যোগ হইল তবে॥
শূদ্রমণিকূলে জন্ম পাটুলি-নিবাসী।
শ্রীযুতনৃসিংহদেব রায়াগত কাশী॥
তাঁর সহ জগন্নাথ মুখুয্যা আইলা॥
প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা॥
*   *   *   *
তাহাব করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া।
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া।
লিখেন পুস্তকে তাহা সমস্ত শুধিয়া॥
*   *   *   *
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার।
রায় করিলেন সর্ব্বগ্রন্থের প্রচার॥"

কাশীতে মন্দিরের অভাব নাই, কিন্তু সে সব মন্দিরে নৃসিংহদেবের তৃপ্তি হইল না। তিনি ষট্‌চক্রভেদের রূপকরূপে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করিলেন—মন্দিরের পঞ্চ সোপানশ্রেণীতে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাখ্যা ও চিত্রিণী পঞ্চ নাড়ীর রূপক ব্যক্ত হইবে। মন্দিরমধ্যে পরা শক্তি বা কুণ্ডলিনী শক্তির রূপক হংসেশ্বরীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে অর্থ আনাইয়া নৌকাযোগে মন্দির-নির্ম্মাণার্থ প্রস্তর ও শিল্পী পাঠাইয়া স্বয়ং প্রায় অষ্টবর্ষব্যাপী প্রবাসের পর গৃহে ফিরিয়া মন্দির নির্ম্মাণ আরব্ধ করিলেন।

কিন্তু মন্দিরের দ্বিতলগঠন শেষ হইলেই ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেবের মৃত্যু ঘটিল। তাঁহার দুই পত্নীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা অনুমৃতা হইলেন। কনিষ্ঠাকে তিনি তাঁহার আবদ্ধ কার্য্য শেষ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে রাণী শঙ্করী দ্বাদশ

বর্ষব্যাপী চেষ্টায় ও প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ করেন ও মন্দিরে দেবমূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের লিপি এইরূপ—

"শাকাব্দে রসবহ্নিমৈত্রগণিতে শ্রীমন্দিরং মন্দিরং।
মোক্ষদ্বারচতুর্দ্দশেশ্বরসমং হংসেশ্বরী-রাজিতম্॥
ভূপালেন নৃসিংহদেবকৃতিনারব্ধং তদাজ্ঞানুগা।
তৎপত্নী গুরুপাদপদ্মনিরতা শ্রীশঙ্করী নির্ম্মমে॥

শকাব্দা ১৭৩৬।

হংসেশ্বরীর মন্দির ছয়তল ও ত্রয়োদশটি গম্বুজে সুশোভিত। মধ্যস্থ গম্বুজটি সর্ব্বোচ্চ আর চারিটি উচ্চতায় তদপেক্ষা হীন ও অবশিষ্ট আটটি আরও নিম্নে অবস্থিত। মন্দিরমধ্য বৃত্তাকার। বেদীর উপর ত্রিকোণযন্ত্রোপরি শয়ান শিবের নাভিপদ্মে দেবী হংসেশ্বরী উপবিষ্টা। গম্বুজগুলি পল্লবসজ্জায় অলঙ্কৃত ও সুদর্শন। মন্দিরটি শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক ও সর্ব্বতোভাবে দর্শনযোগ্য।

শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

স্মৃতি।

বিগত যে দিন!
হৃদয়ে জাগিছে তার স্মৃতিটুকু ক্ষীণ,
কত সুখ, কত আশা, কত না হরষ,
দুটি সুকোমল করে স্নেহের পরশ,
সৌম্য শান্ত সে মুরতি, দীপ্তমহিমায়,
স্নেহ-ভরা হাতখানি রাখিয়া মাথায়
মাগিছেন শুভাশীষ। স্নিগ্ধ আঁখি ভরি'
কি করুণা, কি মমতা, পড়িতেছে ঝরি'!
দূরে আজ যা'বে বলি' স্নেহের আধার
তাই হৃদি উচ্ছ্বসিয়া উঠে বার বার।
শান্ত হও, ওরে মন, ভুলে যাও সব;
আজিকার তরে শুধু কর অনুভব,
সে শুভ মুহূর্ত্তটুকু, সে শুভ লগন,
চির-জনমের সেই সোণার স্বপন।

শ্রীলাবণ্যময়ী বসু।

সংস্কার ও কুসংস্কার।

(১)

বিদ্রোহ—বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা—বর্ত্তমান ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিবার প্রয়াস। তাই তাহার পথ বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া বিস্তৃত। তাহাকে সংযম-সীমার মধ্যে রাখিয়া তাহার বেগ ও গতি নিয়ন্ত্রিত করা প্রায়ই দুঃসাধ্য। তাই বিদ্রোহকারীরা অনেক সময় যে ভাঙ্গে,সে শুধু ভাঙ্গিবারই জন্য গড়িবার উদ্দেশ্যে নহে। ক্রমে ভাঙ্গাতেই তাহারা আনন্দের উত্তেজনা পায় ও ভাঙ্গা লইয়াই গড়িবার কথা ভুলিয়া থাকে। শচীশের জীবনে ইহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

কিন্তু সে যে সর্ব্ববিধ সংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া—“সমাজের সব ব্যবস্থাকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিত, তাহার কারণ—তাহার জ্যেঠা মহাশয়ের প্রদত্ত শিক্ষা। তাহার জ্যেঠামহাশয় জগমোহনের মত ও কায সবই প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইত—সমাজকে উপহাস করিয়াই তিনি অসীম আনন্দ লাভ করিতেন। সব সংস্কারের সেরা যে সংস্কার সেইটাকেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সযত্নে পরিহার করিয়া তিনি আস্তিক্য-ধর্ম্মকে ডুবাইয়া দিতেই আপনার সমস্ত শক্তি প্রযুক্ত করিতেন। তিনি সমাজের শৃঙ্খলার উপর আপনার মতের হাতুড়ীর আঘাত করিতেন এবং তাহারই সঙ্গে প্রতিবাদের শব্দটুকু কর্ণে প্রবেশ করিতে দিতেন না। গ্রামের মধ্যে এক একটা বিকল বিকৃতাঙ্গ ছেলে যেমন মানুষের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে, সমাজের মধ্যে তিনি তেমনই বিভীষিকার সঞ্চার করিতেন।

এই জ্যেঠামহাশয়ই শচীশের শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। সংযম যৌবনের ধর্ম্ম নহে—তাই শচীশ রক্ষণশীল পিতার আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী জ্যেঠামহাশয়ের অনুকরণে সচেষ্ট হইয়াছিল। পিতা হরিমোহন অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি তিনি কখনও এক সঙ্গে সাত দিন স্বাস্থ্য-সুখ-সম্ভোগের অবকাশ পায়েন নাই—সুতরাং জীবনটা তিনি যেন নিতান্তই ওটবন্দী হিসাবে ভোগ করিতেন। যে কোন দিন তাঁহাকে সংসারের দোকান গুটাইতে হইতে পারে বলিয়া তিনি কোন দিন সে দোকানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই। বরং পরকালের বন্দোবস্তটা পাকা করিবার জন্যই তাঁহার আগ্রহ ছিল। তাই তিনি ছেলেদের শাসন বা পালন কোন দিকেই তেমন দৃষ্টি

দিতেন না, পূজা অর্চ্চনা—তীর্থদর্শন এই সব লইয়াই থাকিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহার এইরূপ ভাবেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র পুরন্দর অল্পবয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করে এবং অল্পদিনেই গৃহ অপেক্ষা গৃহের বাহিরেই অধিক সময় কাটাইতে আরম্ভ করে। এ অবস্থায় নিঃসন্তান—বিপত্নীক—বিদ্বান্ জগমোহনকে শচীশের শিক্ষার ভার লইতে দেখিয়া হরিমোহন প্রথমে অনেকটা নিশ্চিন্তই হইয়াছিলেন। শচীশের শিক্ষা কিরূপ হইতেছে, তিনি তাহার সন্ধান লইতেন না—লওয়া প্রয়োজন মনে করিতেন না। বিশেষ, শচীশ ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বেড়াগুলা যখন অনায়াসেই ডিঙ্গাইয়া যাইতে লাগিল; তখন হরিমোহন একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে বড় বেশী দিন নিশ্চিন্ত থাকা চলিল না। কারণ, জ্যেঠামহাশয় তাঁহার মিল-ম্যাল্থাস্ কোৎ পর্য্যালোচনাপুষ্ট মতগুলি শচীশের মনের কোমল মাটীতে পুঁতিয়া দিয়া সেগুলির পরিবর্দ্ধনের সব উদ্যোগই করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে সেগুলি বাড়িয়া শচীশের মন একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছিল। যে সব মতের আলোচনা বন্ধু-সমাজেও সংযমের সহিত করিতে হয়—যে সব ব্যাপার সর্ব্বজনবিদিত হইলেও কত্রাপি আলোচনার উপযুক্ত নহে, জ্যেঠামহাশয় সমাজের কুসংস্কার নষ্ট করিবার জন্য অনায়াসে শচীশের সঙ্গে সে সব মতের আলোচনা করিতেন—সে সব ব্যাপারের বিচার করিতেন। ভাল মন্দ সব পুস্তকই তিনি শচীশকে পড়িতে দিতেন এবং দুনিয়ায় অন্ততঃ একজনের চিত্তকে সর্ব্ববিধ কুসংস্কারশূন্য করিয়া গড়িতেছেন, মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, ইহা তিনি শচীশকে বুঝাইতেন; সকলেই মানুষ, সুতরাং ব্রাহ্মণ-শূদ্রে প্রভেদ নাই, শচীশকে তিনি এই মতই অভ্রান্ত বলিতেন; যৌবনে পত্নীবিয়োগের পর তিনি আর বিবাহ করেন নাই, কারণ—ধর্ম্মবিবাহ দুইবার হইতে পারে না, এই মতের সমর্থনে তিনি কোঁতের নজির শচীশকে দেখাইতেন। এ অবস্থায় যাহা হইবার, তাহাই হইল। শচীশ সোৎসাহে সমাজকে অবহেলা করিতে কোমর বান্ধিয়া লাগিয়া গেল; এবং সেই কাযই তাহার জীবনের "মিশন" মনে করিতে লাগিল। কুক্কুটের মাংস যখন আস্তাবলে পাকের পর ঠাকুরদালানের পার্শ্বের কক্ষে ভুক্ত হইতে লাগিল, তখন হরিমোহন চিন্তিত হইলেন। কিন্তু যে পুত্রকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার কাযের প্রতিবাদ করিলে পাছে জ্যেষ্ঠের অপমান করা হয়, এইরূপ ভাবিয়া শচীশকে কিছু বলিলেন না। খাঁচার পাখী যখন প্রথম খাঁচার বাহির হয়, তখন সে সহসা অধিক দূর উড়িতে ভরসা পায় না, কিন্তু সে যখন কিছু দূর উঠিয়া দেখে, পিঞ্জরপ্রাচীরে আর তাহার গতি প্রহত হয় না, তখন সে

ক্রমেই অধিক দূর উড়িয়া যায়, শচীশও তেমনই কোনরূপ বাধা না পাইয়া ক্রমেই 'সংস্কারের' পথে দ্রুত চলিতে লাগিল। তখনও হরিমোহন তাহাকে কিছু বলিবেন, কি না—ভাবিতে লাগিলেন, কিছু বলিলেন না। কিন্তু পাড়ার লোক নানা কথা বলিতে লাগিল। পুরন্দর সে সকল কথা পুনঃ পুনঃ পিতার কর্ণ-গোচর করিয়াও যখন পিতার মুখে কথা ফুটাইতে পারিল না, তখন আপনিই শচীশের কাযের প্রতিবাদ করিল। প্রতিবাদের উত্তেজনায় শচীশের উৎসাহ যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। জগমোহন সেই উৎসাহ-বহ্নিতে প্রশংসার ইন্ধন দিলেন। শচীশ প্রকাশ্যভাবে মুসলমান পাচক রাখিয়া আহারের ব্যবস্থা করিল। প্রতিবেশীরা অনাচারীর গৃহে জলস্পর্শ করিবেন না, বলিলেন—গুরু শিষ্যকে ও পুরোহিত যজমানকে ত্যাগ করিলেন। শচীশের মা অবিরল অশ্রুধারায় শচীশের অনাচারসঙ্কল্প ভাসাইতে দিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন হরিমোহনও বিচলিত হইলেন এবং শচীশকে তিরস্কার করিলেন। শচীশ পিতৃভক্তিটা কুসংস্কার বলিয়া মনে করিত পিতার মুখের উপর বলিল-সমাজের অপেক্ষা মতের মূল্য অধিক, তখন হরিমোহন সাশ্রুনয়নে পুত্রকে বলিলেন, সে তাঁহার ত্যজ্য পুত্র।

(২)

পিতা হরিমোহনের ত্যজ্য পুত্র শচীশ জ্যেঠামহাশয়ের আশ্রয় লইল। জগমোহনও সাদরে তাহাকে আশ্রয় দিলেন। ভ্রাতাকে শিক্ষা দিবার জন্য তিনি পৈতৃকসম্পত্তি ভাগ করিবার জন্য আদালতে মোকদ্দমা রুজু করিলে, শচীশ উকীল-বাড়ী যাতায়াত করিতে লাগিল। পাছে অন্যচিন্তায় পিতার প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধির মিলিত স্রোতে শচীশের সঙ্কল্প ভাসিয়া যায়, সেই ভয়ে জগমোহন কৌশলী এঞ্জিনিয়ারের মত সে স্রোতের মুখে বাঁধ দিলেন,—শচীশকে বুঝিতে দিলেন, তাহার পক্ষে তাঁহার আশ্রয়ই ভাল,কারণ, হরিমোহনের অংশে অনেক সরিক আর তাঁহার অংশে সে-ই মালেক হইতে পারে এবং তিনি তাহারই জন্য মোকদ্দমা করিয়াছেন।

মোকদ্দমা জিনিষটার উপর নিরীহ হরিমোহনের একটা ঘৃণা ছিল, বিশেষ দাদার সঙ্গে মোকদ্দমা তিনি অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তাই তিনি প্রস্তাব করিলেন, দাদাই সম্পত্তি ভাগ করিয়া তাঁহাকে এক অংশ দিবার ব্যবস্থা করুন। হরিমোহনকে নাজেহাল করা বোধ হয় জগমোহনের অভিপ্রায় ছিল। নহিলে তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না কেন? শেষে আদালতের নির্দ্দেশে সালিশরা সম্পত্তি ভাগ করিলেন; এবং দুই ভ্রাতার মধ্যে বিচ্ছেদটাকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া বাড়ীখানার দুই অংশের মধ্যে একটা প্রাচীর উঠিল। জগমোহন যে সম্পত্তি—যে টাকা পাই-

লেন, তাহা অল্প নহে। কিন্তু সম্পত্তির যে অংশটুকু দেবোত্তর ছিল, সেটুকু হইতে সালিশরা অনাচারী জগমোহনকে বঞ্চিত করিলেন এবং সে বিষয়ে জগমোহন সালিশদিগের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আদালতে কোনরূপ প্রতীকার পাইলেন না।

শচীশ জ্যেঠামহাশয়ের ভাগেই ছিল। দেবোত্তরের ব্যাপারটা লইয়া জগমোহন যে কষ্ট হইয়াছেন এবং হরিমোহনকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন, তাহা বুদ্ধিমান্ শচীশ বুঝিয়াছিল। তাই সে এক ঢিলে দুই পাখি মারিবার—অর্থাৎ একটা কাযে পিতাকে জব্দ ও জ্যেঠামহাশয়কে তুষ্ট করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। শেষে সে যে কাযটা করিবে স্থির করিল—সে সম্বন্ধে সে জ্যেঠামহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেল।

ননীবালা ব্রাহ্মণের ঘরের বালবিধবা। সে তাহার বিধবা মাতার সঙ্গে মামার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় তাহার মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মামাত ভাইগুলি দুশ্চরিত্র। পুরন্দর তাহাদের বন্ধু—অর্থাৎ ইয়ার। তাহারা বাড়ীতেই একটা কন্সার্টের দল করিয়াছিল এবং প্রত্যহ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ করিত। ননীর সহিত পুরন্দরের অবৈধ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল এবং সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায়, সমাজের ভয়ে মামাত ভাইরা ননীকে গৃহ হইতে কোথাও পাঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্য করিতেছিল। শচীশ এ সব সন্ধান লইয়াছিল। সে জ্যেঠামহাশয়ের কাছে প্রস্তাব করিল, সিভিল বিবাহের আইনমতে ননীকে বিবাহ করিবে। এই প্রস্তাবে জগমোহন শচীশকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি শচীশের প্রস্তাব অতি সাধু বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ধর্ম্মবিবাহ যে দুইবার হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে কোঁতের মত তিনি আর উপস্থিত করিলেন না; কারণ, কোঁৎ ত সিভিল বিবাহের কথাও বলিয়াছেন — সে বিবাহ একটা ঝুকিমাত্র।

হরিমোহন যখন জানিতে পারিলেন, শচীশ ননীকে বিবাহ করিবে, তখন তিনি দাদার কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমার উপর এমন ভয়ানক করিয়া শোধ তুলিও না।" জগমোহনের মুখে আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "এ কাজ করিয়া শচীশ বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে। এত দিনে আমার প্রদত্ত শিক্ষা সার্থক হইল।" তখন হরিমোহন শচীশের হাত ধরিয়া বলিলেন, "এমন করিয়া কুলে কলঙ্ক দিও না।" শচীশ উত্তর করিল, "কুলের কলঙ্ক মুছিবার জন্যই আমার এই চেষ্টা।"

শচীশ যে দিন ননীকে বিবাহ করিবে বলিয়া বাড়ীর জগমোহনের অংশে লইয়া আসিল—সেই দিনই হরিমোহন তাঁহার অংশটা জলের দরে বিক্রয় করিয়া

সপরিবারে কাশীযাত্রা করিলেন। কয়দিনের দুশ্চিন্তায় ও বেদনায় তাঁহার দুর্ব্বল দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বাড়ীর সকলেই শঙ্কিত হইয়াছিলেন—ডাক্তার বলিয়াছিলেন, একটা দুর্ঘটনা যখন তখন ঘটিতে পারে।

(৩)

ননীকে গৃহে আনিয়া তাহার সঙ্কোচ ও শঙ্কা দূর করিতেই কয়দিন কাটিয়া গেল। যখন সে কায শেষ হইল, তখন জ্যেঠামহাশয় তাঁহার মনকে তাঁহার মতের জলে ধৌত করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বপ্রকার "কুসংস্কারের" দাগ তুলিয়া ফেলিতে সচেষ্ট হইলেন। সে কাযটা খুব সহজসাধ্য না হইলেও—নিতান্ত অসাধ্যসাধনও হইল না। ননী শচীশকে বিবাহ করিয়া তার মৃত সাধবা পুনর্জ্জীবিত করিয়া—কলঙ্ক-কল্মষ-কণ্টকিত পথ ত্যাগ করিয়া আবার সংসার-পথে প্রবেশ করিতে স্বীকৃত হইল এবং অনাবিল ভবিষ্যতের আশায় উৎফুল্ল হইল। কিন্তু শচীশ কেন যে গৃহোদ্যানের অনাঘ্রাত ফুল না লইয়া পথের ধূলিমলিন তাহাকেই গৃহিণী করিতে ব্যগ্র হইয়াছে, তাহাই সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

যখন শচীশের সঙ্গে ননীর বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল, সেই সময়—তাহারই জন্য জগমোহন যে বৃদ্ধাদাসীকে কাযে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার কাছে ননী শচীশের পরিচয় ও তাহার বিবাহ-প্রস্তাবের কারণ জানিতে পারিল। শচীশ যে পুরন্দরের কনিষ্ঠ, তাহা জানিয়া ননীর আশৈশব সঞ্চিত সংস্কার একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সে শচীশকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

শুনিয়া জগমোহন ও শচীশ যুক্তির ছুরী দিয়া তাহার সংস্কারের প্রলেপ চাঁচিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যুক্তি ননীর কাছে অকাট্য মনে হইল; কিন্তু সে কিছুতেই সংস্কারের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিল না। শেষে যখন দেখিল, তাঁহাদের যুক্তি ও তাহার সংস্কার উভয়ের সামঞ্জস্য কিছুতেই সে করিতে পারিল না, তখন সে মরিয়া—আত্মহত্যা করিয়া সন্দেহ ও প্রলোভন "দোটানার" বিপদের হাত এড়াইল। জ্যেঠামহাশয় শচীশকে বলিলেন—"দেখিলে কুসংস্কারের কাণ্ড! কুসংস্কার মানুষকে দাসত্বে অবনীত করে।" ননী যে তাঁহাদেরই সংস্কারচেষ্টার ভয়ে মরিয়া বাঁচিল, সে জন্য জ্যেঠা-মহাশয় বা ভ্রাতুষ্পুত্র কেহই, আপনাদের যে কোনরূপ দোষ বা দায়িত্ব থাকিতে পারে, এ কথা মনে আমল দিলেন না। ননী স্রোতের ফুল—এক জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাদের সংসারের কূলে উঠিয়াছিল—আর এক জোয়ারে সে কূল হইতে ভাসিয়া গেল।

(৪)

জগমোহনের সংসারে জগমোহন আর শচীশ আর দাসদাসী। সুতরাং সংসারে শ্রী ও শৃঙ্খলা কিছুই ছিল না। যাহারা এইরূপ সংসারেই বাস করিয়া তাহাতেই অভ্যস্ত, তাহারা শ্রীর ও শৃঙ্খলার অভাব তেমন অনুভব করিতে পারে না। জগমোহন বা শচীশ কেহই এরূপ সংসারে বাস করেন নাই; উভয়েই বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে প্রতিপালিত, সে সংসারের সব কাযই গৃহিণীদিগের হস্তে, সব কাযই সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হইত। তাই অন্নে কঙ্করের মত নূতন সংসারের অসুবিধাগুলি উভয়েরই অসহ্য বোধ হইত। ননী আসিয়া আর কিছু করুক আর নাই করুক, সংসারের শ্রী আনিয়াছিল। দরিদ্রের কন্যা ও মাতুলগৃহে পালিতা ননী গৃহকার্য্যে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল। তাই তাহার হাতে সংসারের ভার দিয়া জগমোহন কয় দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ননীর মৃত্যুতে সংসারে আবার সব অসুবিধা — বৃষ্টিপাতে কন্টকগুল্ম আগাছার মত বাড়িয়া উঠিল। চক্ষুতে বালু লইয়া যেমন অবিরাম অস্বস্তি, সংসারে বিশৃঙ্খলা লইয়া তেমনই দিবারাত্রি অশান্তি। এই অশান্তির আত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জগমোহন প্রস্তাব করিলেন—শচীশ বিবাহ করুক। কতকটা আপনার ইচ্ছায় আর অনেকটা জ্যেঠামহাশয়কে সন্তুষ্ট করিবার আগ্রহে শচীশ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল।

মানুষ সকলেই সমান, সুতরাং কুলশীল পরিচয় লওয়া নিষ্প্রয়োজন—বরং তাহাতে কুসংস্কারেরই প্রশ্রয় লওয়া হয়—এই মত অনুসারে অতীতটাকে একেবারেই আলোচনার ও অনুসন্ধানের অযোগ্য বিবেচনা করিয়া জগমোহন শচীশের বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। পাত্রী পাইতে বিলম্ব হইল না। ননীর মৃত্যুর পর এক মাসের মধ্যেই শচীশ সিভিল বিবাহে বদ্ধ হইল।

শচীশের বিবাহের দিনই সে পুরন্দরের পত্র পাইল। পুরন্দর লিখিয়াছিল——"তুমি কিছুই না মানিতে পার। কিন্তু তোমাকে সংবাদ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য যে, গত কল্য পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বেও—তাঁহাকে তীরস্থ করিবার পর—তোমার কথা বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন।"

(৫)

শচীশের মত বিমলবুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। সে যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া কায করিত এবং ভাবের আবেগকে কোনরূপে যুক্তির উপর প্রাধান্য সংস্থাপিত করিতে দিত না। এই জন্য এত হুজুগের মধ্যেও সে তাহার পাঠে অবহেলা করে নাই। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অনায়াসেই পার হইয়া গেল। বিবাহের পর সে যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীলের দলে নাম লিখা-

ইল, তখন তাহার স্ত্রী তাহাকে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উপহার দিয়াছে। পত্নীর প্রতি প্রেম বা সন্তানের প্রতি স্নেহ কিছুই কিন্তু শচীশের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। মরুভূমির নীরস বালুবিস্তারে রবিকর যেমন জ্বলিতে থাকে, নীরস হৃদয়ে যুক্তি তেমনই কেবল ভাবে বিরাজ করিত। যে হিসাব না করিয়া, লাভ লোকসান না খতাইয়া কায করা নির্ব্বোধের লক্ষণ মনে করিত।

উকীলের দলে নাম লিখাইবার পর সে এক দিন জগমোহনকে জানাইল, সে বিলাতে যাইবে—উদ্দেশ্য ব্যারিষ্টার হওয়া। সে জগমোহনকে বুঝাইয়া দিল, সে এই উদ্দেশ্যেই উকীল হইয়াছে—এখন ব্যারিষ্টার হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় লাগিবে—অর্থাৎ অল্পকাল বিদেশে থাকিতে হইবে—খরচও কম পড়িবে। আর, ব্যারিষ্টার হইলে যে অর্থলাভের অনেক অধিক সুযোগ পাওয়া যায়, তাহাও সে জ্যেঠামহাশয়কে বুঝাইয়া দিল।

জগমোহন এক কথায় শচীশকে বিলাতে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। বরং ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি যেন শচীশের এই প্রস্তাবে দুশ্চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। সে দুশ্চিন্তার মূল কোথায়, শচীশ তাহা জানিত না। কিন্তু কিছু দিন হইতে তাহার কেমন মনে হইতেছিল, জ্যেঠামহাশয় তাহার কাছে এমন একটা কিছু গোপন করিতেছেন, যাহার প্রকাশের আশঙ্কা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছে। সে যাহা হউক, জ্যেঠামহাশয়ের সম্মতি পাইয়া শচীশ বিলাতে চলিয়া গেল।

(৬)

স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই শচীশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। স্বদেশে যেমন, বিদেশেও তেমনই সে মনের মত সঙ্গীর সন্ধান করিয়া লইল। সে তথায় যে দলে মিশিতে লাগিল, সে দলকে বিলাতী কথায় "বোহিমিয়ান" বলে—সে দলের লোক জীবনটাকে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন বিবেচনা করে, তাহাদের মূল কথা—"হেসে নাও, দু'দিন বৈ ত নয়।" সব কাযে সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলার অভাবই তাহাদের বিশেষত্ব। এই দলে মিশিয়া তাহাদের মতে শচীশের পিতৃব্য-প্রদত্ত শিক্ষায় জলুষ আরও বাড়িয়া গেল। জগমোহন তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন, বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র। শচীশ সেই মতটাকে একটু পরিবর্তন করিল—বিবাহ আইনের অনুমোদিত যৌনসম্মিলনের ব্যবস্থা। জগমোহন তাহাকে শিখাইয়াছিলেন, যাহা যুক্তির অনুমোদিত, তাহাতে পাপ নাই। শচীশ সেই মতটাকে একটু পরিবর্তিত করিল—দণ্ডবিধিই ধর্ম্মগ্রন্থ—যাহা দণ্ডবিধির ধারায় পড়ে না, তাহা পাপ নহে।

এইরূপ মত লইয়া দিন কাটাইবার সুযোগ স্বদেশ অপেক্ষা বিদেশে অধিক; তাই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরও শচীশ বিলাতে রহিয়া গেল। জগমোহন তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না—শচীশের মাসহারা নিয়মমত আসিতে লাগিল। পত্নী সুনীতির প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ রক্ষা করা দূরে থাকুক, শচীশ ক্রমে তাহাকে পত্র লিখিতেও অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিল।

এমন সময় শচীশ সুনীতির পত্র পাইল—জগমোহনের মৃত্যু হইয়াছে; সুনীতি তাহার পুত্র-কন্যা লইয়া কোথায় যাইবে?

মাসহারা আর আসিবে না—জগমোহন সম্পত্তির কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন—সুনীতির ও পুত্র-কন্যার একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে—এই সব চিন্তায় শচীশের যেন নেশা ছুটিয়া গেল। সে নিতান্ত অনিচ্ছায় বিলাত হইতে স্বদেশে রওনা হইল।

(৭)

দেশে ফিরিয়া শচীশ যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। দুই দিনের জ্বরে জগমোহনের মৃত্যু হইয়াছিল—তিনি ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে কোন আইন-সঙ্গত নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে—পৈতৃক গৃহের অর্দ্ধাংশ, তাহাও আবার বন্ধক! দুই ভ্রাতার সম্পত্তি-বিভাগের সময় জগমোহন যাহা পাইয়াছিলেন, শচীশ তাহা জানিত। সে টাকা গেল কোথায়? শচীশ সে রহস্য ভেদ করিতে পারিল না—ভেদ করিয়া কোন লাভ নাই বলিয়া সে চেষ্টাও করিল না। সে আপনি উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিমলবুদ্ধিতাহেতু ব্যবসায়ে সে প্রথম হইতেই সাফল্য লাভ করিতে পারিল—আইনের কূটতর্কে তাহার সহিত অনেককেই পরাজিত হইতে হইত। সে আইনের দৃঢ় প্রাচীরের কোন্ ছিদ্রপথে যে আসামীকে বাহির করিয়া লইত, তাহা অনেক সময় বিচারকও বুঝিতে পারিতেন না। এরূপ ব্যবহারাজীবের পসার জমিতে বিলম্ব হয় না। শচীশের আয় তাহার সমব্যবসায়ীদিগের অনেকেরই ঈর্ষ্যার কারণ হইয়া উঠিল।

জগমোহনের মৃত্যুর পর অবস্থাপরিবর্ত্তনে শচীশ দিন কতক শান্ত হইয়াছিল। এখন দুর্ভাবনার কারণ তিরোহিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে গ্রীষ্মের পর বর্ষার বর্ষণের মত তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা বাড়িয়া উঠিল। তাহার প্রকৃতি জানিয়াও যাহারা তাহার অর্থের আধিক্যহেতু তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতারক্ষায় কুণ্ঠিত হইত না—

যাহাদের পরিবারে সে সাদরে অভ্যর্থিত হইত, সুবিধা পাইলে সেও তাহাদের গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

তাহার এইরূপ ব্যবহার যে সুনীতির বক্ষে বেদনার সঞ্চার করিত, শচীশ তাহা বুঝিতে চাহিত না। সে সমাজের সঙ্গে যেমন—মানবস্বভাবের সঙ্গেও তেমনই সংগ্রাম করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছিল; স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা কাহাকেও সে আমল দিবে না—আপনার তৃপ্তিই তাহার বাঞ্ছিত। বিবাহের পর হইতেই সুনীতি অনুভব করিয়াছিল, সে স্বামীর কাছে যাহা পাইবার আশা করিয়াছিল—যাহা প্রাপ্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, তাহা পায় নাই। ফুটিবার পূর্ব্বেই যে ফুল কীটদষ্ট হয়, সে যে অবস্থাগ্রস্ত হয়, সুনীতিও সেই অবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল। এখন শচীশের ব্যবহার তাহার কাছে একেবারেই অসহনীয় হইয়া উঠিল। সিভিল বিবাহের বন্ধন যে সব কারণে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, শচীশের জীবনে সে সব কারণ প্রচুরই ছিল। সুতরাং সুনীতি ইচ্ছা করিলে শচীশের সঙ্গে বিবাহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত। কিন্তু শচীশ তাহার স্বামী—তাহার পুত্র-কন্যার পিতা—সে আদালতে যাইয়া স্বামীকে ত্যাগ করিবে এ কথা সুনীতি মনেও করিতে পারিল না।

ভাবিয়া ভাবিয়া—কাঁদিয়া কাঁদিয়া সুনীতির উন্মাদরোগ জন্মিল। তখন তাহার সমগ্র প্রকৃতি যেন অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যখন তখন সে জিনিষ পত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া—আপনাকে ও পরকে হত্যা করিতে যাইয়া—গৃহে ভীতির সঞ্চার করিত। শচীশ তাহাকে বাতুলাশ্রমে পাঠাইয়া দিল। তথায় কয়মাসের মধ্যেই সুনীতির জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কে মৃত্যুর যবনিকা পড়িয়া গেল।

মাতৃহীন দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া শচীশ বিপন্ন হইল। তাহার মত লোক ভার সহিতে পারে না—দায়িত্ব লইতে পারে না। প্রজাপতির পাখায় কি ভার সহে? শচীশ পুত্রদ্বয়কে বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসে ও কন্যা সুরমাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার সঙ্কল্প করিল। পুত্রদ্বয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কিন্তু সুরমাকে আশ্রমে পাঠান হইল না। যে বৃদ্ধ ভৃত্য শচীশকে কোলে করিয়া “মানুষ” করিয়াছিল এবং জগমোহন তাহার সহিত পৃথক্ হইলে শচীশের মায়ায় জগমোহনের ভাগেই গিয়াছিল, সে শচীশের কাছে ছিল। সে কিছুতেই সুরমাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাইতে দিল না। সে জিদ করিয়া সুরমাকে পালন করিবার ভার লইল। ঝি চাকরের কাছে সুরমা পালিতা হইতে লাগিল।

উচ্ছৃঙ্খল পিতার সর্ব্ববিধ অনাচারের আদর্শ যে গৃহে প্রকটিত, সেই গৃহে

সুরমা পালিত হইতে লাগিল। শচীশ মনে করিল না যে, মানুষ তাহার জীবনের প্রথম আট দশ বৎসরে যে পরিমাণ শিক্ষা করে, অবশিষ্ট সমস্ত জীবনে আর সেই পরিমাণ শিক্ষা করে; আর, তরুণবয়স্কের কোমল হৃদয়ে যে শিক্ষা অঙ্কিত হইয়া যায়, তাহা পরে আর মুছিয়া ফেলা যায় না।

পুত্রদ্বয় কিছু বড় হইলে শচীশ তাহাদিগকে বিলাতে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু তথায় তাহাদিগকে কোন অভিভাবকের কর্ত্তৃত্বাধীন করিল না। তাহারা যে অধ্যয়ন অপেক্ষা অন্য দিকে অধিক মন দিতে পারে, এ সম্ভাবনা শচীশকে বিচলিত করিতে পারিল না।

(৮)

বিশ বৎসর শচীশ আপনার ও সমাজের উপর অত্যাচার করিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল।

এই সময়ের মধ্যে তাহার অর্থের লোভে, এক জন বিলাত-প্রত্যাগত পসারহীন যুবক ডাক্তার সুরমাকে বিবাহ করিয়া তাহার গৃহেই বাস করিতে আরম্ভ করে।

দীর্ঘকাল বিদেশে কলুষপ্রবাহে ভাসিয়া তাহার পুত্রদ্বয়ও দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল। একজন ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিল—একজন তাহাও হইতে পারে নাই। তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া শচীশ তাহাদিগকে গৃহে স্থান দেয় নাই। ব্যারিষ্টার-পুত্র, দিনকতক কলিকাতায় কাটাইয়া মফস্বল আদালতে অর্থোপার্জ্জনের আশায় এ জিলা সে জিলায় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। অপর পুত্রটি বেকার অবস্থায় পথের কুক্কুরের মত ঘুরিতেছিল—তাহার জীবনের কোন লক্ষ্য ছিল না—দাঁড়াইবার কোন আশ্রয় ছিল না।

কন্যা সুরমা বিলাসে অভ্যস্ত হইয়াছিল—সে যে আদর্শ দেখিয়াছিল, সে আদর্শের শিক্ষা মানুষকে তাহার দেবভাব ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করে না—সংযমবন্ধনে বদ্ধ করিয়া সংসারে কায করিতে শিখায় না। তাই সুরমা তাহার সংসারের মধ্যেই থাকিত না।

(৯)

শচীশ সাধারণতঃ কিছু বেলা হইলে শয্যা ত্যাগ করিত—উঠিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিতে বসিত। সে তাহাই করিতেছিল। ভৃত্য একখানি কার্ড আনিয়া দিল। শচীশ মুখ তুলিল—তাহার চক্ষুতে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পরিচয় পরিস্ফুট—আননে অকাল বার্দ্ধক্যের চিহ্ন সপ্রকাশ। সে বিরক্তভাবে ভৃত্যের দিকে চাহিল; সে দৃষ্টিতে ভৃত্যের মুখে ভীতভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার

পর শচীশ বলিল, "ডাকিয়া আন।" ভৃত্য চলিয়া গেল ও অল্পক্ষণ পরে একজন পুলিস-কর্ম্মচারীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

শচীশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কি প্রয়োজন?"

আগন্তুক একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "গত রাত্রিতে ইডেন গার্ডেনের এক অংশে গোলমাল শুনা গিয়াছিল। মালীরা দেখিয়াছিল, সন্ধ্যার সময় কয় জন য়ুরোপীয় বেশধারী সেই দিকে গিয়াছিল। তাহারা রাত্রিতে সে দিকে যাইতে সাহস করে নাই। আজ সকালে সন্ধান করিয়া তাহারা একটা ঝোপের মধ্যে ভগ্ন মদ্যের বোতল প্রভৃতি ও একটি মৃতদেহ পাইয়াছে। শবের বক্ষে ছুরিকাঘাতের চিহ্ন। বোধ হয় মাতাল অবস্থায় লোকগুলি কলহ করে, ফলে কেহ ইহাকে খুন করে ও পলাইয়া যায়।"

শচীশ বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "সে জন্য আমার কাছে আসিয়াছেন কেন?"

এ প্রশ্নের পর পুলিস-কর্ম্মচারী আর আসল কথা বলিতে ইতস্ততঃ করিলেন না, বলিলেন, "মৃত ব্যক্তির পকেটে যে কার্ড ছিল, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, আপনি তাহাকে সনাক্ত করিতে পারিবেন। তাই আমরা শব আনিয়াছি।"

শচীশ বলিল, "আমার তাহাকে সনাক্ত করিবার কারণ নাই। সে জন্য আমাকে বিরক্ত করা নিষ্প্রয়োজন।"

কর্ম্মচারী বিদায় লইলেন।

এই সময় কৌতূহলবশে শচীশ মতপরিবর্ত্তন করিল; বলিল, "চলুন, দেখিয়াই আসি।"

কর্ম্মচারীর সঙ্গে শচীশ নামিয়া গেল। গাড়ীবারান্দায় একখানি গাড়ী ঘিরিয়া ভৃত্যগণ দাঁড়াইয়া ছিল, শচীশকে দেখিয়া সরিয়া গেল। শচীশ অগ্রসর হইয়া দেখিল—গাড়ীর মধ্যে তাহারই পুত্রের মৃতদেহ—পরিচ্ছদ রক্তে রঞ্জিত রক্তের বর্ণ আর লোহিত নাই কৃষ্ণ হইয়া আসিয়াছে। মৃতের মুখে দেখিয়া শচীশ চমকাইয়া উঠিল — পুত্রের মুখের সহিত পত্নীর মুখের এত সাদৃশ্য সে ত কখন লক্ষ্য করে নাই!

সে কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিল—মৃত ব্যক্তি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র—তাহার ব্যবহার-দোষে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়াছিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

শচীশ উপরে উঠিয়া আবার মোকর্দ্দমার কাগজে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার নয়নের সমক্ষে কেবলই যেন মৃত পুত্রের—তাহার

মৃত পত্নীর প্রতিকৃতির মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। শচীশ আপনার দৌর্ব্বল্যে আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হইল।

যথাকালে শচীশ আদালতে গেল ও মোকদ্দমা করিল। কিন্তু সে কিছুতেই সেই মৃতমুখখানি নয়নের সম্মুখ হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিল না।

রাত্রিতে সেই মুখের স্মৃতি হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য সে অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিল। মত্ত অবস্থায়—নিদ্রায় সে সেই মুখ স্বপ্নে দেখিল।

প্রভাতে সে জাগিল। তখন তাহার মস্তকে যন্ত্রণা। সে দিন সে আর আদালতে যাইতে পারিল না। গৃহে সে কেবল ভাবিতে লাগিল। সেই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে সে তাহার হৃদয়ে বিরাট শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল। এ কি? শচীশ ভাবিল, যে সব সংস্কার পুরুষানুক্রমে আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করে, সে সব সংস্কার আমাদের চিত্তকে এমন ভাবে গঠিত করে—আমাদের স্নায়ুসমূহকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে তাহাদের কৃত পরিবর্ত্তন পিতা হইতে পুত্রে সংক্রমিত হয়। সংস্কার জয় করিবার জন্য শচীশ কয় দিনের জন্য স্থানপরিবর্ত্তন করিল—পাহাড়ে বেড়াইতে গেল।

পূর্ব্বে বহুবার সে এই পাহাড়ে গিয়াছে—তাহার জীবনের—যৌবনের আনন্দ মদিরা পূর্ণপাত্রে নিঃশেষ করিয়া পান করিয়াছে। কিন্তু এবার সে আর পূর্ব্বের মত সে মদিরায় মত্ততা অনুভব করিল না—সবই বিস্বাদ—সবই বিকৃত।

পারিবারিক জীবনের সুখের দিকে এত দিন শচীশের দৃষ্টি পড়ে নাই—পরিবারিক জীবনের সুখের কথা শুনিলে সে উপহাস করিয়া হাসিত। এবার পথে, গৃহে পত্নীপুত্রপুত্রী লইয়া লোককে যাইতে দেখিয়া—তাহাদের মুখে সুখের দীপ্তি দেখিয়া শচীশ বিস্মিত হইল। সে কি ইচ্ছা করিয়া এই সুখ ত্যাগ করিয়াছে—সুনীতি কি তাহাকে এমনই অনাবিল সুখ দিতে আসিয়াছিল?

ভাবনার হাত এড়াইবার আশায় শচীশ কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল। ভাবনা লইয়া সে কলিকাতায় ফিরিল।

(১০)

শচীশের ভাবনা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহারা হৃদয়ের শূন্যতা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আর জীবন-প্রবাহকে নূতন পথে প্রবাহিত করিয়া আবার পারিবারিক সুখের স্নিগ্ধ শান্তিলাভের বাসনা তাহার হৃদয়ে বলবতী হইতে লাগিল।

কিছু দিন পূর্ব্বে তাহার সহিত একটি মহিলার পরিচয় হইয়াছিল। মিস্ দাসের পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ডাক্তার ছিলেন; তাঁহার পুত্র বিলাত হইতে

ডাক্তার হইয়া আসিয়াছে। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পরে---প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে মিস্ দাস বিদুষী বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। তিনি ২০ বৎসর পূর্ব্বে সহসা কলিকাতা ত্যাগ করেন ও নাগপুরে একটি অনাথবিদ্যালয়ে অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রীর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ভ্রাতার বিবাহের উপলক্ষে তিনি আবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। এখন তিনি প্রৌঢ়া। তাঁহার ব্যবহারের গাম্ভীর্য্য লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। তাঁহার মুখের বিষণ্ণভাব তাঁহার অন্তর্নিহিত কোন বেদনার আভাস প্রকাশ করে। শচীশের সুদীর্ঘকালব্যাপী বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতায় সে কখনও তাঁহার মত রমণীর সহিত পরিচিতা হয় নাই। তাই তাঁহার প্রতি শচীশের একটা সম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। এখন সেই আকর্ষণ প্রবল হইতে লাগিল। সে চেষ্টা করিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইল এবং ক্রমেই তাঁহার দিকে সমধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

এইরূপে মাসাধিক কাল কাটিয়া গেল। আর অপেক্ষা করা শচীশের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শেষে শচীশ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া মিস্ দাসকে পত্র লিখিল।

পত্র লিখিয়া সে উত্তরের জন্য অধীর হইল। কিন্তু সাত দিন কাটিয়া গেল — উত্তর আসিল না। অষ্টম দিন কাছারী হইতে ফিরিয়া শচীশ পত্রের উত্তর পাইল——

"কল্যাণীয়বরেষু—

শচীশ, তোমার পত্র পাইয়া আমি লজ্জায় মৃতবৎ হইয়াছিলাম। এ কয় দিন চেষ্টা করিয়াও উত্তর দিতে পারি নাই। আমি জীবনে যে বিষম ভ্রম করিয়াছি, তাহার গুরুত্ব তোমার পত্র পাইয়া যেমন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তেমন পূর্ব্বে কখনও পারি নাই। আমার অনুতাপ-বহ্নি-দাহযন্ত্রণা আরও বাড়িয়াছে।

তোমার পরিচয় পাইয়া আমি তোমার প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হইয়াছি— কিন্তু সে স্নেহ ব্যক্ত করিতেও পারি নাই — আত্মপরিচয় দিতে পারি নাই।

তোমার জ্যেঠামহাশয়ের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহার মত বুদ্ধিমান ও বিদ্বান্ লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য ও বিদ্যার বিস্তার আমার শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। যুবতীর হৃদয়ের সেই অনাবিল শ্রদ্ধা তাঁহারই চেষ্টায় প্রেমে পরিণতি লাভ করে। তাঁহার যুক্তি খণ্ডিত করিবার ক্ষমতা আমার ছিল না—তাঁহার মতের অভ্রান্ততায় সন্দেহ করিবার

শক্তি আমার ছিল না। চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

তাঁহার মনের জন্য তিনি কিন্তু আমাকে বিবাহ করেন নাই। তিনি আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, বিবাহ-সংস্কার কুসংস্কার। তখন আমার সে মতে সন্দেহ করিবার ক্ষমতা ছিল না—সে মতের প্রতিবাদ করা ত পরের কথা। কুম্ভকার যেমন মৃৎপিণ্ডকে যেমন ইচ্ছা গড়িতে পারে, তিনি আমার মতকে তেমনই তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গঠন দিয়াছিলেন। তিনি যাহা বুঝাইয়াছিলেন, আমি তাহাই বুঝিয়াছিলাম। আমি তাঁহার পত্নী—আমার আবার মতের স্বাতন্ত্র্য কি? কিন্তু আমি কেন—কোন রমণী কি তাঁহার মতে মত না দিয়া থাকিতে পারিত? সে ক্ষমতা কাহারও ছিল?

তাঁহার মতের আবর্ত্তে পড়িয়া চিরাচরিত প্রথার পুণ্য পথ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। সেই মতের জন্য আমি জীবনে কেবল গোপন মর্ম্মব্যথা বহিয়া বেড়াইতেছি। সেই মতের জন্য আমি মাতৃবক্ষে শিশুর স্পর্শসুখের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। সেই মতের বহ্নিদাহে আমার সামাজিক জীবন পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়াছে—তাই আমি সমাজ ত্যাগ করিয়াছি—স্বেচ্ছায় আপনাকে নির্ব্বাপিত করিয়া জীবনে কর্ম্মের ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহারই অনুষ্ঠানে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছি।

আমি ভুল করিয়াছিলাম—তাঁহার কথায় ভুল বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আমার প্রেম শ্রদ্ধার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ভ্রান্তির দৃঢ় উপলব্ধিতেও বিচলিত হয় নাই। কিন্তু হায়, আমি যে তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলাম—তাঁহাকে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিয়াছিলাম—সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকারও তিনি আমাকে দেন নাই—সে-ও কেবল ভ্রান্ত মতের জন্য। সে অধিকারের অভাব যে কত বড় অভাব, তাহা তোমার পত্র পাইয়া আমি যেমন বুঝিয়াছি, পূর্ব্বে কখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই।

তিনিও আপনার ভুল বুঝিয়াছিলেন আমার কাছে সে কথা স্বীকার করিয়াও লোকসমাজে তাহা স্বীকার করিবার সাহসসঞ্চয়ের অবসর পায়েন নাই—তাহার পূর্ব্বেই তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন, আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তাঁহার স্মৃতি লইয়াই থাকিব—আমার তিনি পতি—তিনি দেবতা।

সমাজে আমার স্থান নাই। আমি আবার নাগপুরে যাইতেছি; তথায় তাঁহার ধ্যানে ও আরব্ধ কার্য্যে জীবনের শেষ কয় দিন কাটাইয়া দিব।

তুমি যে ভাবে জীবন যাপন করিয়াছ, তাহাতে তোমার পক্ষে বিবাহ করা সঙ্গত নহে। তবে আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পরিবর্ত্তন হউক—তুমি সুখী হও। আর যদি কখন সত্য সত্যই মনে করিতে পার যে, প্রেমে পত্নীকে সুখী করিতে পারিবে, তবে তখন তোমার বিবাহের বিষয় বিবেচনা করিবার সময় হইবে, তৎপূর্ব্বে নহে। ইতি।"

স্বাক্ষরের স্থলে তিনি আপনাকে—"তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী" বলিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জ্যেঠা মহাশয়ের টাকা কি হইয়াছে—তিনি কেন তাহাকে বিলাত পাঠাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন—সবই সহসা পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিন্তু শচীশ সে সব কথা ভাবিল না। তাহার আদর্শ আজ সহসা ধূলিসাৎ হইয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ অবলম্বনের অভাবে তাহার মতও ধূলায় লুটাইয়াছে। মত! এই কি তাহার স্বরূপ? সেও কি এতই অসার? সেও তবে সংসার-মরুতে মৃগতৃষ্ণিকার অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে?

শচীশের যেন শ্বাসরোধ হইতেছিল। তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে সব যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছিল। সব যেন ধূমাচ্ছন্ন—অস্পষ্ট।

গৃহদ্বারে গোলমাল শুনিয়া সে আসন ত্যাগ করিল। নামিয়া যাইয়া দেখিল, তাহার ব্যারিষ্টার পুত্র মত্ত হইয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রভুর ভয়ে তাহার ভৃত্যগণ প্রভুপুত্রকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। পুত্র ভৃত্যদিগকে গালি দিতেছে।

শচীশ পত্র পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল, প্রমত্ত পুত্রকে দেখিয়া একেবারে গুলিয়া গেল। সে উচ্চকণ্ঠে ভৃত্যদিগকে আদেশ দিল—'বাহির করিয়া দাও।'

পিতার দোষে কুশিক্ষায় কলুষিতচরিত্র পুত্র পিতৃগৃহদ্বার হইতে বিতাড়িত হইল।

শচীশের বৃদ্ধ ভৃত্য নীরবে অশ্রুমোচন করিল।

ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে শচীশ ঘরের দিকে ফিরিল। সোপান অতিক্রম করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

ভৃত্যগণ শব্দ শুনিয়া আসিয়া যখন তাহাকে তুলিল, তখনও সে সংজ্ঞাশূন্য। তাহারা ডাক্তার ডাকিতে ছুটিল। ডাক্তার আসিলেন—চিকিৎসা হইল। দারুণ পক্ষাঘাত তাহার অত্যাচারদুর্ব্বল দেহকে পাতিত করিয়াছে। তাহার সংজ্ঞা

ফিরিল—কিন্তু দেহের শক্তি আর ফিরিল না। অপরের সাহায্য ব্যতীত উঠিবার ক্ষমতা নাই। গৃহ যাহাকে আপনার সীমামধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারিত না—এখন তাহার পক্ষে কক্ষই জগৎ! অথচ তাহার কল্পনা বাতাসের মতই মুক্ত—বাতাসের মতই আশুগতি—বাতাসের মতই সর্ব্বত্র বিচরণশীল! সংজ্ঞাই এখন তাহার যন্ত্রণার কারণ। এই অবস্থায়—জীবিত, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থায় শচীশ যন্ত্রণার কণ্টক-শয়নে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

(১১)

সর্ব্ববিষয়ে অপরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া শচীশ কেবল ভাবিত। আর ত কোন কায নাই। সঙ্গীও নাই। চিকিৎসকের চিকিৎসাগুণে শচীশ জীবিত রহিল; কিন্তু জীবন যায় না কেন? এই অবস্থায়—যখন সে কন্যার নিকট প্রত্যাশিত সেবা-শুশ্রূষা পাইত না—যখন বেতনভুক্ ভৃত্যের অর্থবিনিময়দত্ত সেবা আর তাহাকে শান্তি দিতে পারিত না—তখন কেবল তাহার মাতার, পিসীমার ও ভগিনীদিগের কথা শচীশের মনে পড়িত। তাহাদের সেই সরল সলজ্জভাব, সেই সেবাতৎপরতা, সেই পরার্থে স্বার্থবিসর্জ্জন, সেই ধর্ম্মানুরক্তি—সেই সব শচীশের মনে পড়িত। সুরমা বিলাসের- ব্যসনের—অবসাদের অবসরে এক একবার আসিয়া তাহার সংবাদ লইয়া যায়। সে ইচ্ছামত বাহিরে যায়—কখন্ আসে, তাহা কেহ নিশ্চয় বলিতে পারে না—বন্ধুদিগের সঙ্গে গল্প করে; পীড়িত পিতার কক্ষের সম্মুখে বসিয়াই উচ্চ হাস্য করে—সে হাসি শচীশের কর্ণে তপ্ত তৈলের মত প্রবেশ করে; পীড়িত পিতার চক্ষুর সম্মুখেই বন্ধুদিগের সহিত লজ্জাবর্জ্জিত ব্যবহার করে—সে ব্যবহার শচীশের বক্ষে যেন তীরবৎ বিদ্ধ হয়। তখন তাহার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠে।

সুরমার একমাত্র পুত্র জননীর স্নেহ অপেক্ষা তাড়নাই অধিক পাইত। সুরমা যেরূপ "মুক্ত" জীবনযাপন করিত, সেরূপ জীবনে সন্তান সুখের ও সান্ত্বনার নহে, পরন্তু ভারমাত্র;—সেরূপ জীবনে মাতৃস্নেহের মত পবিত্র জিনিষ থাকিতে পারে না। সেই শিশুর বেদনা শচীশের বক্ষে বাজিত। তাহার ম্লান মুখে হাসি দেখিবার জন্য শচীশের বুক ফাটিয়া যাইত। সে তাহাকে কাছে লইয়া—তাহাকে নাড়িয়া—তাহাকে খেলা দিয়া যেন অনেকটা শান্তি লাভ করিত। ক্রমে শচীশের দুর্দ্দশাপীড়িত কোমল হৃদয় হইতে স্নেহধারা বাহির হইয়া সেই শিশুকেই বেষ্টিত করিয়া ফিরিতে লাগিল। সেই শিশুই তাহার জীবনের সুখে পরিণত হইল।

এই অবস্থায়—রুগ্নদেহ ও ভগ্নহৃদয় শচীশ আর আপনার প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিতে পারিত না—তাই যে সব সংস্কার সে কুসংস্কার বলিয়া হৃদয়

হইতে বিদূরিত করিয়া চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, সেই সব সংস্কারই তাহার হৃদয়ে আপনাদিগের অস্তিত্ব অনুভূত করাইতে লাগিল—এখন সে অনুভূতির সঙ্গে কেবল অনুতাপের দাবদাহ।

এইরূপ যন্ত্রণায় বার বৎসর কাটিয়া গেল।

প্রথম বৎসর একদিন ভৃত্যদিগের দৃষ্টিতে ও ব্যবহারে শচীশের মনে হইল, তাহারা তাহার কাছে কিছু গোপন করিতেছে। সে কি? জানিবার জন্য তাহার কৌতূহল বাড়িতে লাগিল। যখন শারীরিক দৌর্ব্বল্য প্রবল হইয়া মানসিক শক্তি পর্য্যন্ত ক্ষুণ্ণ করে, তখন মানুষের সংযমও কমিয়া যায়। শচীশ আর কিছুতেই কৌতূহল সংযত রাখিতে পারিল না। সে সেই অজ্ঞাত সংবাদ জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ভৃত্যদিগকে প্রশ্ন করিতে লাগিল—কখন সে কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কখন ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল।

শেষে একজন ভৃত্য সংবাদ দিল—সুরমা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যায় একজন মাদ্রাজী বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিল—আর ফিরে নাই।

সংবাদ শুনিয়া শচীশের চক্ষুর সম্মুখে যেন আলোক নিবিয়া গেল। তাহার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ভৃত্য ব্যস্ত হইয়া ডাক্তারকে সংবাদ দিল। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া ভয় পাইলেন—পক্ষাঘাতের আক্রমণ হইলে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব হইবে কি না সন্দেহ। তিনি ব্যস্ত হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। শচীশ সামলাইয়া উঠিল, চিকিৎসকের ব্যস্তভাব দেখিয়া ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"আপনি ভয় পাইবেন না। আমার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। এত অল্পে আমার জীবনের অবসান হইবে না।" বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বেদনার অসহনীয় অবস্থা কাটিয়া গেল।

তখন সে দৌহিত্রকে আনাইল, তাহাকে বক্ষে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে শিশু পিতামাতার—বিশেষ মাতার নিকট কখন যে স্নেহ পায় নাই, "দাদার" কাছে সেই স্নেহ পাইয়াছে। সে "দাদাকে" কাঁদিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আঘাতের পর আঘাতে শচীশের হৃদয়ের সব অবলম্বন চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—ছিল কেবল এই স্নেহের অবলম্বন। দুর্ব্বল সে কিছুতেই সে অবলম্বন ত্যাগ করিতে পারিবে না। সে অবলম্বন হারাইলে তাহার কি হইবে, ভাবিলে যেন তাহার শ্বাসরোধ হইত। সে জামাতাকে ডাকিয়া বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে। তুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইও না—"দাদাকে" লইয়া যাইও না। আমি আমার সর্ব্বস্ব তাহাকে দিব।"

শচীশের জামাতা ভাবিতে লাগিল—এক দিকে অর্থ আর এক দিকে লোকের বিদ্রূপ, সে কি করিবে? বাস্তবিক তাহার পক্ষে গৃহের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইত, সকলেই যেন তাহাকে দেখিয়া হাসিতেছে! এ অবস্থা দিন দিন তাহার পক্ষে দুঃসহ হইতে লাগিল। শেষে এক দিন একটা সম্মিলনে সে যখন শুনিতে পাইল, কয়জন পুরুষ ও মহিলা তাহারই কথার আলোচনা করিয়া তাহাকে উদ্দেশে উপহাস করিতেছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। কর্ত্তব্য নির্ণীত করিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে দৌহিত্র অন্যদিনের মত তাহার কাছে আসিল না। শচীশ ভৃত্যকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—তাহার পিতা তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

শচীশের পক্ষে সংসার শূন্য মরুভূমি হইয়া গেল। আজ আর তাহার কোন অবলম্বন নাই। সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, সমাজ তাহাকে শাস্তি দিয়াছে—চরণচাপে তাহার হৃদয় চুর্ণ করিয়া দিয়াছে। সে সংস্কারকে উপহাস করিয়াছিল, আজ সংস্কার তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, তাহার অভাবে জীবনে শ্রী থাকে না—সংসারে শৃঙ্খলা থাকে না।

শচীশ বুঝিল, জামাতা সর্ব্বাগ্রে সিভিল বিবাহের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিবে। সে আপনার উকীলকে ডাকাইয়া সংবাদ লইতে বলিল। উকীল পরদিনই সংবাদ দিয়া গেল, জামাতা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত দায়ের করিয়াছে। শচীশ এই মোকদ্দমার সংবাদ তাহাকে দিবার জন্য উকীলকে বলিয়া দিল।

শচীশ প্রায় প্রত্যহ সংবাদের জন্য উকীলের কাছে লোক পাঠাইত। উকীল লিখিতেন—কোন নূতন সংবাদ নাই।

একমাস কাটিয়া গেল। শচীশের সঙ্গী কেবল ভাবনার যাতনা—কেবল অনুতাপের বেদনা।

একমাস পরে উকীল বাবু এক দিন আসিয়া শচীশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, বলিলেন, "সুরমা মোকদ্দমায় জবাব দাখিল করিয়াছে।"

শচীশ বিস্মিতভাবে বলিল, "জবাব!"

"হাঁ। আমি তাহার নকল আনিয়াছি।" তিনি শচীশের হস্তে নথী দিলেন।

শচীশ পড়িতে লাগিল—সুরমা বলিয়াছে, তাহার পিতৃগৃহে যেরূপে জীবন যাপিত হয়, তাহা তাহার স্বামীর অজ্ঞাত ছিল না। সে সেই জীবনেই অভ্যস্ত ও শিক্ষিতা। সেও সেইরূপ জীবন যাপন করিয়াছে। এ সব জানিয়াও তাহার

স্বামী কেবল অর্থলোভে তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন—তাহার ব্যবহারে কোন দিন কোনরূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। আজ সে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া তিনি মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কোনরূপ ক্ষতিপূরণ পাইতে পারেন না—

শচীশের হস্ত হইতে নথী পড়িয়া গেল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া কাঁপিয়া নিষ্কম্প হইল। ডাক্তার যে দ্বিতীয় আক্রমণের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই দ্বিতীয় আক্রমণ শচীশকে আহত করিল।

এক ঘণ্টার অধিক সময়ের চেষ্টায় শচীশের চৈতন্যোদয় হইল। চৈতন্যলাভ করিয়াই সে ব্যস্তভাবে জড়িতকণ্ঠে উকীলকে বলিল, "আমার উইল—লিখুন—শীঘ্র—শীঘ্র।

উকীল বাবু তাহাকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিলে, সে আরও ব্যস্ত ও উত্তেজিত হইয়া বলিল, "আমি জানি—আমার যাইবার সময় হইয়াছে; আর বিলম্ব করিবেন না।" তাহার মুখভাব উত্তেজনাসূচক।

উকীল বাবু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—কিন্তু মরণাহত শচীশের নয়নের অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখিয়া আর বিলম্ব করিলেন না—পার্শ্বস্থ টেবল হইতে কাগজ ও কলম লইলেন। শচীশ বলিল—

"যে শিক্ষা বাঙ্গালীকে উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজদ্রোহী না করিয়া সংযত ও সমাজের উপযোগী করে, সেই শিক্ষাদানের সুব্যবস্থার জন্য আমি আমার স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি সরকারের হস্তে প্রদান করিলাম।"

উকীল বাবু লিখিলে শচীশ কম্পিত হস্তে কলম লইয়া নাম-সহি করিল ও উকীল ও ডাক্তার—দুই জনকে সাক্ষী হইয়া স্বাক্ষর করিতে বলিল। তাঁহাদের স্বাক্ষর হইয়া গেলে সে কাগজখানি লইয়া আপনার বক্ষে স্থাপিত করিল; তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ইহার কিছুকাল পরেই তাহার সংজ্ঞালোপ হইল। ডাক্তার বলিলেন, "আর আশা নাই।"

পর দিন শেষ রাত্রিতে যে ভৃত্য প্রভুর শুশ্রূষার জন্য শচীশের নিকটে ছিল, সে ঢুলিয়া ঢুলিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতে যখন তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাহার মনে হইল—শচীশ ঘুমাইতেছে, সে নিঃশব্দপদসঞ্চারে কক্ষ ত্যাগ করিল।

তাহার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শচীশের দেহ স্থির—নয়ন মুদ্রিত। সে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণম্‌।

ক-কারের অহঙ্কার।

(বক্তা খোদ কর্ত্তা)

বকলমে স্বাক্ষরকারী শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ কৃষ্ণ কেশব কংসারি মুকুন্দ মধুকৈটভারি কেশিমথন কালীয়-দমন কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহল-কুতূহলী কানাইলাল পাঠক-পাঠিকার কল্যাণ করুন। দেবকী যাঁহার জননী, রুক্মিণী যাঁহার রমণী, রাধিকা যাঁহার প্রণয়িনী, কুব্জা যাঁহার অঙ্কশায়িনী, কংস যাঁহার মাতুল, সঙ্কর্ষণ যাঁহার অগ্রজ, আর কেন্দুবিল্বের বিলাসকলাকুতূহলী কবি যাঁহার সাধক, সেই কৃষ্ণচন্দ্রের আমাকে নহিলে এক-পলকও চলে না, তাই তিনি আমাকে অসঙ্কোচে মাথায় রাখিয়াছেন। আর মান-ময়ী রাধিকাও আমাকে পদান্তে স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণ-রাধিকার কোকিলকূজিত-কুঞ্জকুটীরে, কেলিকদম্বমূলে, কালিন্দীকূলে, বঙ্কিমঠামে, আমাকেই দেখিতে পাওয়া যায়। কালাচাঁদের কোলে রাইকিশোরী আমারই যোটকতায় ঘটিয়াছে। কলঙ্কভঞ্জন আমারই কীর্ত্তিপতাকা, নবনারীকুঞ্জরও আমার বিনা মঞ্জুর হয় নাই। গোকুলে আমি, দ্বারকায় আমি, আবার গোলোকে বৈকুণ্ঠে আমি, ক্ষীরোদ-শয়নে লক্ষ্মীর অঙ্কেও আমি। সাধে কি 'ক'অক্ষর দেখিয়া কান্দয়ে প্রহ্লাদ'?

ভক্ত শাক্ত কালী করালী মুক্তকেশী করালিনী কাত্যায়নী কৈবল্যদায়িনী কলিকলুষনাশিনী কুলকুণ্ডলিনীর ককারাদিস্তবে আমারই কীর্ত্তিকথা কীর্ত্তন করেন। 'কালীকল্পতরু' ও 'কালী কুলাও' বুলি আমারই ঝুলিঝাড়া। পরন্তু কৃষ্ণকালীর অভেদকরণে আমার কৃতিত্ব কম নহে।

শৈব শঙ্কর কামারি কৃত্তিবাসাঃ কাশীশ্বর তারকেশ্বর নকুলেশ্বর প্রভৃতি নাম-কীর্ত্তনে আমারই পবিত্র প্রভাব অনুভব করেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠে আমি, ব্যোম-কেশের কেশে আমি, বিরূপাক্ষের অক্ষিতে আমি, মহাকালের মধ্যে আমি, ত্র্যম্বক-ত্রিপুরান্তকের অন্তে আমি। আবার কপর্দ্দে আমি, পিনাকে আমি, ত্রিপুণ্ড্রকে আমি, রুদ্রাক্ষে আমি। কৈলাসবাসী নন্দিকেশ্বর হইতে কাশী কোতোয়াল কালভৈরব পর্য্যন্ত আমার করায়ত্ত।

অলকাপতি কুবের, কুমার কার্ত্তিকেয়, কন্দর্প বা কামদেব, কৃতান্ত বা কাল, সনৎকুমার, অশ্বিনীকুমার, কেহই আমাকে ছাঁটিয়া ফেলেন নাই। আমার মান রাখিবার জন্য ব্রহ্মা কমলযোনি, বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী বা ক্ষীরোদশায়ী, মহাদেব কৈলাসবাসী বা কাশীবাসী, অগ্নি পাবক, ইন্দ্র শক্র ও শতক্রতু, গণপতি বিনায়ক ও একদন্ত, সূর্য্য অর্ক ও ভাস্কর, চন্দ্র সুধাকর ও কুমুদবান্ধব। শুক্র আমার বশ, কেতু আমার বিজয়কেতু, অন্যান্য গ্রহগণকেও কুজ, সৈংহিকেয় প্রভৃতি বিকট আখ্যায় আমার অধিকারভুক্ত করিতে পারি। দেবীগণের মধ্যে ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী বা কমলালয়া কমলা আমার প্রতি সুপ্রসন্না, আমার সন্তোষের জন্য শীতলা কলসধারিণী, গঙ্গা মকরবাহিনী। আমার করুণা আকর্ণকল্পে ঘেঁটু ঘণ্টাকর্ণ সাজিয়াছেন। মনসাদেবী নিজনামে আমার অধিকারে আসেন নাই বটে, কিন্তু 'আস্তীকস্য মুনের্ম্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা, জরৎকারুমুনেঃ পত্নী' ইতি পরিচয়ত্রিতয়ে চরণে চরণে আমার চরণে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। মা সরস্বতীর নাম ক-অক্ষর-বর্জ্জিত বলিয়া 'ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ' ইতি মন্ত্রে তাঁহার পূজাবিধি কল্পিত হইয়াছে, আর, কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস 'কজ্জলপূরিতলোচনভারে' বলিয়া দেবীর বন্দনা করিয়া আদ্যক্ষরেই আমার কাছে মাথা নোয়াইয়াছেন।

আমি রামনামে নাই, তাই 'কাকুৎস্থং করুণাময়ং' বলিয়া স্তবপাঠে আমার অধীনতা অঙ্গীকার করিতে হয়—নতুবা কৌশল্যাকুমার জানকীকান্ত কুশীলবজনকের রক্ষা আছে কি? নারায়ণ আমার প্রভাব অতিক্রম করিতে অশক্ত হইয়া, কৃতযুগে কূর্ম্ম ও শূকর-রূপ ধারণ করেন ও নরকেশরিবেশে হিরণ্যকশিপু বধ করেন, তাহার পর ত্রেতায় তিনি কশ্যপপুত্র ত্রিবিক্রম হয়েন, এবং ক্ষত্রিয়ান্তক অবতারে নিজ জননী রেণুকার লাঞ্ছনা করিয়া ক্ষত্রিয়বীর অবতারে বিমাতা কেকয়ীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেই কলঙ্কক্ষালন করেন। দ্বাপরের কৃষ্ণকথা ভূমিকায়ই কহিয়াছি। কলিতে কল্কী অবতারে আমি বিশেষ করিয়া প্রকট।

ব্যঞ্জনবর্ণের আদ্যক্ষর বলিয়াই যে আমার অহঙ্কার, তাহা নহে। একাক্ষরকোষে আমার মহিমা বিস্তারিত করিয়া বিবৃত। ফল কথা, সংস্কৃতভাষায় আমি বহুদেবতার নামের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। পক্ষান্তরে 'ক' জলেরই নামান্তর—আর সৃষ্টিপ্রক্রিয়ায় 'অপ এব সসর্জ্জাদৌ।' অতএব এককালে আমিই সর্ব্বব্যাপী ছিলাম, এ হিসাবে দেখিলেও আমি বড় কেউকেটা নহি।

এখনও আমি শুধু ত্রৈলোক্যে কেন, ভূলোক দ্যুলোক প্রভৃতি সপ্তলোকে লক্ষিত হই। স্বর্গে মন্দাকিনী আমারই কথা কলকলরবে গাহিতেছেন, মর্ত্ত্যে

অলকনন্দা সেই ধারাই বজায় রাখিয়াছেন, পাতালে বাসুকি আমাকেই লেজে খেলাইতেছেন। অলকায় আমি, কল্পবৃক্ষে আমি, কপিলা বা কামধেনুতে আমি, সুদর্শনচক্রে আমি, কৌমোদকী গদায় আমি, কৌস্তভ-স্যমন্তকে আমি। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশে আমি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মে আমি, খেটকখর্পরে আমি। বৈষ্ণবের কুঞ্জেও আমি, শাক্তশৈবের কুণ্ডকুণ্ডেও আমি। কালীঘাট কামাখ্যায় আমি, কুলিয়া কেন্দুলীতে আমি। ক্ষীরোদসাগরে আমি, কৈলাসভূধরে আমি, বৈকুণ্ঠগোলোকে আমি, কোণার্ক বা কণারকে আমি, আবার কেশবচন্দ্র সেনের কমলকুটীরেও আমি। কুম্ভীপাক-নরকে আমিই কিল কিল করিতেছি।

কনখল, কামরূপ, কালীঘাট, কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা, দ্বারকা নাসিক, তারকেশ্বর, পুষ্কর, ব্রহ্মকুণ্ড, কুশাবর্ত্তঘাট, বিল্বকেশ্বর, নীলকেশ্বর, কুরুক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র সবই আমার স্পর্শে ধর্ম্মক্ষেত্র। কমায়ুনে বদরিকাশ্রমে আমি, কালী কমলীওয়ালীর ধর্ম্মশালায়ও আমি।

আনন্দকানন অবিমুক্তবারাণসী কাশীতে আমি সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত। চক্রতীর্থে মণিকর্ণিকায়, বিশালাক্ষী আশাকালীতে, সঙ্কটায় সঙ্কটমোচনে, কেদারনাথ-বটুকনাথে, বটুকভৈরবে আদিকেশবে, কামাখ্যায়, মেনকায়, মুক্তি-মণ্ডপে, শিবের কাছারীতে, সাক্ষিবিনায়ক খঞ্জবিনায়কে, অক্ষয়বটে অন্নকূটে, দুর্গাকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড সূর্য্যকুণ্ড অগস্ত্যকুণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি কুণ্ডে, ভাস্করানন্দ স্বামীর মূর্ত্তিতে, শঙ্করাচার্য্যের মঠে, রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে, কুচবিহারের কালীবাড়ীতে, (কালিয়া গলি, কচুরিগলি, কারমাইকেল লাইব্রেরীই বা বাকী থাকে কেন?) সর্ব্বত্র আমাকে লক্ষ্য করিবে। তাই শঙ্করবাক্য—'কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা। সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা।' সুতরাং 'যেষাং ক্কাপি গতির্নাস্তি তেষাং বারাণসী গতিঃ।' যথাকালে কাশী প্রাপ্তিতে আমার কর্ত্তব্যের সমাপ্তি।

সাকারে আমি, নিরাকারেও আমি। "একমেবাদ্বিতীয়ং" "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" ইত্যাদি বেদবাক্য আপ্তবাক্যে আমি, আবার প্রতীকোপাসনায়, "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"য়ও আমি, নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে আমি, আবার তারকব্রহ্মনামেও আমি, ইহলোক ইহকালে আমি, পরলোক পরকালেও আমি, কর্ম্মমার্গেও আমি, ভক্তিমার্গেও আমি, বিবেক-বিরক্তি-অনুরক্তিতে আমি, আবার কৈবল্য সালোক্য-মোক্ষেও আমি, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, নমস্তৎ কর্ম্মভ্যঃ, অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে, কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ" ইত্যাদি জ্ঞানাত্মক আপ্তবাক্যে আমি।

আবার সৎসঙ্গে কাশীবাস, কায় কি আমার কাশী, মন চাঙ্গা ত কাটুয়া গঙ্গা, ডাক ডুব মুটো আর সব ঝুটো, ইত্যাদি চলিত কথায়ও আমি। যুগে যুগে সাধক ভক্ত উপদেশ দিতেছেন,—কামিনীকাঞ্চন বর্জ্জন কর, কর্ম্ম ত্যাগ কর, নিষ্কাম ধর্ম্ম আচর, কিন্তু ইহাতে প্রাকৃতলোকে অক্ষম, সে ও আমার কারসাজি, কেন না, যড়্‌রিপুর মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ স্থানে আর চতুর্ব্বর্গফলের সঙ্গে আমার আধাআধি বখরা।

বৈদিক ঋকে আমি, আরণ্যকে আমি, কেনকঠমুণ্ডকমাণ্ডুক্যে আমি, কৌথুমী শাখায় আমি, শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে যজুর্ব্বেদে আমি, পুরুষসূক্তে আমি, যাস্কের নিরুক্তে আমি, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় আমি, মার্কণ্ডেয়চণ্ডীতে আমি, কূর্ম্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ কালিকাপুরাণ কল্কিপুরাণে আমি, মিতাক্ষরায় আমি, কুল্লুককৃতটীকায় আমি। দক্ষক্রতুকর্দ্দম-ঋচীককৌশিক-শুকসনকশতানীক প্রভৃত রাজর্ষিব্রহ্মর্ষিতে আমি, শঙ্কর-কুমারিল-নীলকণ্ঠে আমি, আমারই কর্ত্তৃত্বে হৃষীকেশ ও গুড়াকেশ নরনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম, শুক্রাচার্য্য আদর্শগুরু, উতঙ্ক আদর্শশিষ্য।

কর্ম্মকাণ্ডে, ক্রিয়াকাণ্ডে, ক্রিয়াকর্ম্মে, কাম্যকর্ম্মে, নিত্যকর্ম্মে, দশকর্ম্মে, আমি। পঞ্চকন্যায়, ষোড়শমাতৃকায়, নবপত্রিকায় আমি। সাধকে, উপাসকে, পূজকে, তন্ত্রধারকে, ঋত্বিকে, আহ্নিকে, অভিষেকে, আরাত্রিকে, কায়মনোবাক্যে, কৃচ্ছ সাধনে, সঙ্কল্পে, করন্যাসে, কীলক-কবচে, কোশাকুশীতে, কুশাসনে, কমণ্ডলুতে, তাম্রকণ্ডে, মধুপর্কে, পাদোদকে, কুমারীপূজায়, কূপ-পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায়, প্রদক্ষিণে, যৎকিঞ্চিৎ-কাঞ্চনমূল্য দক্ষিণায় আমি। অক্ষয়তৃতীয়ায়, অশোকষষ্ঠীতে, স্কন্দষষ্ঠীতে, মাকরী সপ্তমীতে, কুক্কুটী সপ্তমীতে, পিপীতকী দ্বাদশীতে, চম্পকচতুর্দ্দশীতে, বৈকুণ্ঠ-চতুর্দ্দশীতে, আলোক অমাবস্যায় আমিই লোকের চোখে পড়ি। কুলকুমারীব্রত, গোকর্ণব্রত, কার্ত্তিকে কাত্যায়নী ব্রত আমারই প্রসাদাৎ। কালীপূজা, কার্ত্তিক-পূজা, ক্ষেত্রপাল ও ঘণ্টাকর্ণপূজা ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় আমি জাগ্রৎ। আমিই রাজার কপালে রাজটীকা দিই, আমিই স্বপাকে বা একপাকে ভক্ষণ করাই, আমিই আরত্রিককালে কাঁসর বাজাই, আমিই ঠাকুরের বৈকালী সাজাই, আমিই ঠাকরুণের কাঠাম বাঁধাইয়া একমেটে করাই ও কালক্রমে ডাকের সাজ চড়াই, আমিই চড়কে কাঠফাটা রৌদ্রে পাক ঘুরাই, আমিই কলা বৌএর কৃশকলেবরে কস্তাপেড়ে কোরাশাড়ী জড়াই। একাদশী আমার একার প্রভাবে পুণ্যতিথি (আমি যে একাই এক-শ), করতোয়া আমার স্পর্শে পুণ্যতোয়া, কুম্ভমেলা আমার গুণে পুণ্যমেলা, 'মধুপর্কে পশোর্বধঃ' আমারই প্রসাদে প্রশস্ত, 'দশমে কন্যকা প্রোক্তা' আমারই বিধিতে যুক্তিযুক্ত, লোকাচার আমারই বিধানে,

শাস্ত্রশ্লোক অপেক্ষা অধিক বলবান্,সংক্রান্তিতে আমারই কল্যাণে অশুভের শান্তি। আমারই কৌশলে প্রণবের নাম ওঙ্কার, অনূঢ়ার নাম কন্যা ও কুমারী, আতপ-তণ্ডুলের নাম অক্ষত, শ্যামাঠাকুরুণের চুলের নাম কেশ। কৌল-কাপালিক আমারই দোহাই দিয়া 'অদেয় অপেয় অগ্রাহ্য' মদ্যকে 'কারণ' বলিয়া শোধন করিয়া লয়েন।

জাতকের সূতিকাষষ্ঠী ও নিষ্ক্রমণে আমি, বটুক বা মানবকের দীক্ষাচূড়া-করণ-কর্ণবেধ সংস্কারে আমি, কুশণ্ডিকায় কনকাঞ্জলিতে, সাতপাকে, পাকস্পর্শে, কাচাসাধে, আটকলাইয়েতে আমি, 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' এই তুক্‌তাকে আমি, 'উড়কী ধানের মুড়কী দিব শাশুড়ী ভুলাতে' এই শ্লোকবাক্যে আমি, 'কল গাড়ীতে চেপে যাব, 'মিছে কেঁদে মর,' 'কার ঘর কর' ইত্যাদি কন্যার কান্নায়ও আমি। রক্ষাকালীর কাছে হাড়িকাঠে কাল পাঁঠাকাটায় বা আক কুমড়া কাঁচকলা বলিদানে আমি, কসাইকালীর কাছে লুকাইয়া বকরীকাটায়ও আমি। বৈষ্ণব বাবাজীর বাকল-কৌপীন-কম্বলে আমি, 'টিকি, চৈতনচুটকি' তিলক 'কণ্ঠীমালি' রসকলিতেও আমি। আমারই চক্রান্তে কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না, আর ভেক না নিলে ভিক মেলে না।

আমি সকল ধর্ম্মেই নির্ব্বিকার। দেখ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে আমি (কাঁকুড়-গাছি-দক্ষিণেশ্বর উভয়ত্র), বিজয়কৃষ্ণ কেশবচন্দ্রে আমি, কাঙ্গাল ফিকীরচাঁদে আমি, গোরক্ষনাথে আমি, আবার নানক-কবীর-তুকারাম-কাঠিয়া বাবায় আমি। জৈনের তীর্থঙ্করে, বৌদ্ধের শাক্যসিংহে, কপিলবাস্তুতে, কুরুকল্লায়,মহাভিনিষ্ক্রমণে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে, জাতকত্রিপিটকে, ভিক্ষুপরিব্রাজকে আমি, আবার কথমীন্যান অলকট ব্ল্যাভাট্‌স্কীতেও আমি। ক্রেস্তানের ক্রুশকাঠে আমি, কোমতের প্রত্যক্ষবাদেও আমি। কোরাণে আমি, মক্কায় আমি, আল্লা হো আকবরে আমি, কারবালা কোরবানী বকরীদে আমি, ফকীর কাজী-কলমায় আমি। নিকা-তালাক-ওয়াকুফ্-কবরে আমি, আবার কাফেরেও আমি। নাস্তিক-চার্ব্বাকে আমি, বকুল-ব্র্যাডলাতেও আমি। অধিক কথায় কাব কি, কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজাও আমাকে না ভজিয়া পরিত্রাণ পান না। বকধার্ম্মিকের দুইটি পদেই আমি ভর করিয়া আছি। অতএব আমি বিকথনা করিতে পারি কি না—*

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ভজ।

* শুধু ধর্ম্মের কাহিনীতে কেন, সকল ক্ষেত্রেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। সে কল কথা ক্রমে কহিব।

সমালোচনা।

যশোহর খুলনার ইতিহাস। *

যশোহর অতি প্রাচীন রাজ্য। মুসলমান শাসনের বহু পূর্ব্বে যশোহরের উল্লেখ দেখা যায়। ইহা একটি পীঠস্থান। ভারতচন্দ্রের রচনা ইহার নাম বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত করিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তন্ত্রচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। প্রতাপাদিত্যের শাসনসময়ে ইহার গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তখন ইহা গৌড়ের যশ হরণ করিয়া আপনার কীর্ত্তিমুকুটমণুখ সমুজ্জ্বলতর করিয়াছিল। তখন বর্ত্তমান যশোহর ও খুলনা দুই জেলা যশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যশোহর ও খুলনা পৃথক্ করা যায় না। আজ ত্রিশ বৎসর কাল ইংরেজ গবর্মেণ্ট খুলনাকে নূতন জেলা করিলেও খুলনা রীতিনীতি, সমাজবন্ধন ও প্রত্নতত্ত্বে যশোহরই আছে, যশোহর বাদ দিলে খুলনা ভিত্তিশূন্য হয়, খুলনা বাদ দিলে যশোহর প্রাচীন গৌরবশূন্য হয়। ভৈরব-কপোতাক্ষ, যমুনা ইচ্ছামতী, ধূমতী বলেশ্বর প্রভৃতি নদনদীর যেমন প্রথমাংশ যশোহরে প্রবাহিত হইয়া তাহাদের শেষাংশ খুলনার মধ্যে আসিয়া প্রকাণ্ড ও বলবান্ হইয়াছে, ঐতিহাসিক ঘটনার স্রোতও তেমনি যশোহর হইতে খুলনার মধ্যে আসিয়া কায় পরিগ্রহ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছে। খাঁজাহান যশোহর হইতে আসিয়া খুলনায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,যশোহরাধিপতি প্রতাপের রাজধানী খুলনার সম্পত্তি হইয়াছে। * * উভয় জিলা পৃথক্ করিলে ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়।" সেই জন্য গ্রন্থকার দুই জিলার ইতিহাস এক করিয়া লিখিয়াছেন—দুই জিলার ইতিহাস ভিন্ন নহে—একই।

যখন ওয়েষ্টল্যাণ্ড যশোহরের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন, তখনও খুলনা যশোহরের অন্তর্ভুক্ত। ওয়েষ্টল্যাণ্ডের এই পুস্তকই এত দিন যশোহর খুলনার ইতিহাস সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল। সংপ্রতি দুই জিলার যে দুইখানি সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে—সে দুইখানিকে কোনরূপে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের গ্রন্-

* যশোহর খুলনার ইতিহাস-শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার—চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড মূল্য ৩৲ টাকা।

অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যায় না। যশোহরের প্রথম অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক বলিয়া ওয়েষ্টল্যাণ্ডের নাম ভবিষ্যতে সুধিসমাজে সম্মানিত হইবে। তাঁহার পরবর্ত্তী সরকারী বিবরণে তাঁহার পুস্তকের ভুলগুলিও অবিকৃত রহিয়া গিয়াছে! তিনি ইতিহাস না লিখিলে এত দিনে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা—অনেক ঐতিহাসিক চিহ্ন বিস্মৃতির বিবরে বিলয় প্রাপ্ত হইত—তাহাদের মৌন সাক্ষ্যের অভাবে ঐতিহাসিকের পক্ষে অনেক স্থানে ঘটনার ছিন্নসূত্র যুক্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত।

পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা আমাদের দেশে যত অধিক, আর কুত্রাপি তত অধিক বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গালা দেশে এক ধর্ম্মের পলি অন্য ধর্ম্মের স্তর ও এক রাজনীতিক প্রবাহের পলি অন্য রাজনীতিক অবস্থার অবশেষ আবৃত করিয়াছে। আবার, চর্চ্চার অভাবে ও শিক্ষার দোষে ধর্ম্মপরিবর্ত্তনে পীড়িত ও রাজনীতিক-বিপ্লবে বিপন্ন বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি নিষ্প্রভ হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "স্থানীয় লোকের নিকট কার্য্যের সাহায্য অতি কমই পাওয়া যায়। কারণ, গ্রামবাসীরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে এতই অনভ্যস্ত, স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বে এতই অনভিজ্ঞ যে, অনেক সময়ে দূর হইতে গিয়া তাহাদের গ্রামের কথা নূতন করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতে বা দেখাইতে হইয়াছে। অনেক স্থলে তাহাদের অনভিজ্ঞতার ফলে প্রতিবন্ধক যে উপস্থিত না হইয়াছে, তাহা নহে।" কিন্তু "চাক্ষুষ প্রমাণের মত প্রমাণ নাই।" যখন আমরা এই সকল কথা মনে করি, তখন বর্ত্তমান সময়ের কিছু কাল পূর্ব্বে যখন দেশ আরও দুর্গম ছিল, তখন যশোহরের ইতিহাস রচনাবিষয়ে ওয়েষ্টল্যাণ্ডের উৎসাহ দেখিয়া বাঙ্গালীকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরদাস বসাক মহাশয় রাজকার্য্যে বাগেরহাটে অবস্থানকালে স্থানীয় স্থাপত্যকীর্ত্তিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন, রামশঙ্কর সেন মহাশয়ও সরকারী বিবরণে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছিলেন; আর, যশোহরের রাসবিহারী বসু মহাশয় যশোহর সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই ঘটনাগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া যশোহরের ইতিহাস রচিত করেন নাই। সে কায করিয়াছিলেন— ওয়েষ্টল্যাণ্ড।

কিন্তু ওয়েষ্টল্যাণ্ড বিদেশীয় লোক। তিনি যখন ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার ইতিহাসরচনা স্বপ্নমাত্র ছিল—তখনও বাঙ্গালার অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপাদান অনাবিষ্কৃত বা অবজ্ঞাত, বাঙ্গলার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সন্দেহ ঘুচে নাই। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে স্থানে স্থানে ভ্রান্তমত পোষণ করা ও ব্যক্ত করা অবশ্যম্ভাবী। পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে তাঁহার প্রকা-

শিত মত পরিবর্ত্তিত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু সে কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এতদিন পরে যিনি সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি এই কার্য্যে একাগ্রসাধনায় আমাদের কলঙ্কমোচন করিয়াছেন। বেভারিজ বলিয়াছেন, যিনি জিলাবাসী, জিলার এলাকায় বাস করিয়াছেন এবং অবসরপ্রাচুর্য্য হেতু উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন, তিনি জিলার ইতিহাস রচনা করিবার উপযুক্ত অধিকারী, বাঙ্গালী ব্যতীত বাঙ্গালার প্রকৃতিগত, জাতিগত, ভাষাগত বিশেষত্ব কে বুঝিয়া বুঝাইতে পারে? সতীশ বাবু খুলনার অধিবাসী—জীবনের অধিকাংশকাল খুলনাতেই কাটাইয়াছেন—শিক্ষাবিস্তারব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া জন্মভূমি খুলনাকেই কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছেন—দীর্ঘকাল ধরিয়া যশোহর খুলনার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসার ও শ্রমশীলতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি, তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য স্বয়ং কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন এবং যশোহরবাসী সাহিত্যব্যবসায়ীকে কিরূপ 'উদ্বাস্ত' করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি। তাঁহার এই আলোচ্য পুস্তকে তাঁহার সে সকল গুণের পরিচয়ই আছে। সেই সকল গুণেই পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "আমি অনেক জিনিস যশোহর খুলনায় টানিয়া লইয়াছি। টানিয়া লইবার কি কারণ বা অধিকার আছে, আমার অনুমানের কি ভিত্তি আছে, তাহা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সংযোজিত করিয়াছি। কোন কোন স্থানে একটা লোভনীয় প্রত্নকীর্ত্তি দ্বারা যশোহরকে যশোভূষিত করিবার জন্য হয় ত সাধারণ দৃষ্টিতে যশোহরের সীমা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছি। কিন্তু বর্ত্তমান যশোহর জিলা ও প্রাচীন যশোর রাজ্য উভয়ের সীমার একটা আভাস দিয়া থাকিলে আমি হয় ত ক্ষমার্হ হইব। সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে কিছু টানিয়া লওয়ার একটা রীতি আছে; আমি হয় ত সেই ভাবে টানিয়া লইয়াছি। বিভিন্ন জিলার ঐতিহাসিকগণ এই ভাবে টানিয়া লইবার জন্য জাল পাতিলে মোটের উপর যে নূতন তথ্য উঠিবে, উহা বাঙ্গালার ইতিহাসলেখক বিনা গণ্ডগোলে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবেন। আমি যাহা টানিয়া লইয়াছি, সঙ্গত আপত্তি উত্থাপন করিয়া অন্য কেহ তাহা স্বচ্ছন্দে নিজের করিয়া লইতে পারেন। আমি তজ্জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইব না। যদি কোন সম্পত্তিকে লাভের সম্পত্তি বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিয়া থাকি, তবে তাহা যে-কেহ ভোগ করেন, তাহাতেই বাঙ্গালার লাভ।" তাঁহার এই বিনয়োক্তির কোন প্রয়োজন নাই। "বঙ্গের অঙ্গ হইতে ছিন্ন করিলে যশোহর খুলনার মত স্থানের বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মূল্য অতি কম, আর ঐতিহাসিকতা

দুর্ব্বোধ্য হইলে, প্রবাদকাহিনী বৃদ্ধ সৈনিকের গল্পকথায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা জিলার ইতিহাস লিখিতেছেন, বাঙ্গালার ইতিহাসই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। * * বাঙ্গালাকে বাদ দিয়া কোন জিলারই অধিবাসী-বাঙ্গালীর ইতিহাস লেখা যায় না, জিলার ইতিহাস বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণমাত্র। সে সব ইতিহাস-রচনার উদ্দেশ্য—বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনার সাহায্য করা। বাঙ্গালার সব জিলার ইতিহাস পরস্পর এমতভাবে সংবদ্ধ যে, কাহাকেও পরিত্যাগ করা যায় না—পরিত্যাগ করিলে শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

জিলাগুলির ইতিহাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার ও প্রবাদাদির অনুসন্ধানের যত সুবিধা হয়, সমগ্র প্রদেশের ইতিহাসে তাহা হইতে পারে না। অথচ, এই সকল ঘটনা ও প্রবাদাদি হইতে অনেক সময় জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। যে সকল প্রতীচ্য শিল্পসমালোচক কান্ত নগরের বিখ্যাত মন্দির-কেই বাঙ্গালার একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্থপতিকীর্ত্তি বলিয়াছেন, তাঁহারা খলি-ফাতাবাদে (বর্ত্তমান বাগেরহাট) সাতগম্বুজ দেখিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এই জলজঙ্গলাকীর্ণ স্থানে এরূপ গৃহ কেন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা বিচারযোগ্য। খাঁ জাহান কোন্ সময়ে কেন এ দেশে আগমন করেন, তাহাও নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু এই প্রদেশে যে তখন মুসলমানদিগের সেনাদলের গতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। বাগেরহাট হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী একখানি গ্রামে এখনও এক দরিদ্র মুসলমানপরিবার "তালুকদার" বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত। তালপুকুরের তালগাছের মত তাহাদের এই উপাধিমাত্র অবশিষ্ট আছে—তালু-কের কোন চিহ্নই নাই। কিংবদন্তী—যখন জাহাঙ্গীর নগরে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, তখন এই পথে মুসলমানবাহিনী গতায়াত করিত এবং তালুকদারগণ এই স্থানে তাহাদের রসদ যোগাইবার জন্য তালুক পাইয়াছিল। তালুকদারদিগের গৃহে কোন দলিল নাই। কিন্তু এই কিংবদন্তীর সূত্র ধরিয়া জিলার ঐতিহাসিক বাদশাহী-বাহিনীর গমন-পথ নির্ণয় করিতে পারেন। তাহা হইলে, হয় ত খলিফা-তাবাদে খাঁ জাহানের অবস্থানের কারণ নির্ণীত হইতে পারে। এরূপ অনুসন্ধান স্থানীয় লোকের দ্বারাই হইতে পারে।

বাস্তবিকই "চাক্ষুষ প্রমাণের মত প্রমাণ নাই।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে অদ্যাপি ইতিহাসচর্চ্চা সর্ব্বত্র লোককে স্বয়ং স্থানাদি দেখিবার কষ্টস্বীকারে উৎসাহিত করে না। সিরাজদ্দৌলার চরিতকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কিরূপে সোমদহে ও সবদহে গোল করিয়া পরের প্রমাণে নির্ভর করিয়া পরের ভুল গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা "নবাবী আমলের বাঙ্গালা"র ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন। ষ্টুয়ার্ট ভ্রমক্রমে সোমদহের স্থানে শব দহ পাঠ করেন। অক্ষয় বাবু তাহাতে "রাণী ভবানীর জমীদারী" যোগ করিয়া আরও বিষম ভ্রম করেন। 'ঐতিহাসিক চিত্রে' (পৌষ, ১৩১৭) যে লেখক খাঁ জাহানের সৌধের কথায় বলিয়াছেন, মসজেদের ৬০টি দ্বার থাকায় ইহাকে ষাট্‌গোমট বলা হয়। বাস্তবিক ইহার দ্বার ৬০ নহে। আমাদের বিশ্বাস, ইহা সাত গম্বুজ বলিয়াই পরিচিত। এ দেশের সাধারণ লোক যে ভাবে "সাত গম্বুজ" উচ্চারিত করে, তাহাতে "সাত" কি "ষাট" স্থির বুঝা কষ্টকর। সেই উচ্চারণ-ফলে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাট বা ষাট লিখিয়াছিলেন। এমন কি সতীশ বাবুও পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত তাঁড়াকে তাণ্ডা বলিয়াছেন। বোধ হয়, উভয়েই ইংরাজী Tanda দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। স্বয়ং অনুসন্ধান ব্যতীত ভ্রান্তি অনিবার্য্য। সেই জন্যই বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে হইলে প্রথমে জিলাগুলির ইতিহাস রচনা করিতে হইবে।

যশোহরে ঐতিহাসিককে প্রলুব্ধ করিবার অনেক উপাদান আছে। এই জিলার বীরগণ আবির্ভূত হইয়া স্বতন্ত্র খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছিলেন এবং বাহুবলে বহুবলশালী ছিলেন। ইতিহাসের আলোচনা বাঙ্গালীকে সে সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। যশোহরে বৌদ্ধপ্রভাবের চিহ্নও সপ্রকাশ। যশোহরের নানা স্থানে স্তূপাদি বর্ত্তমান, এবং খুলনায় যে বুদ্ধমূর্ত্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহার মত বুদ্ধমূর্ত্তি সমগ্র ভারতে আর একটি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। যশোহরে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যপরিচয়ও অনেক আছে। চাঁচড়ার মন্দিরগুলি ও বাগেরহাটের সাত-গম্বুজ প্রভৃতি গৃহ বাঙ্গালার স্থাপত্যের ইতিহাসে সাদরে উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত। যশোহরে বহু হিন্দু জমীদারও রাজার প্রাসাদাবশেষ ও পরিখাদির চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। আবার, যশোহর বৈষ্ণব-দিগের তীর্থক্ষেত্র। যে রূপ ও সনাতন বৈষ্ণবগণের পূজ্য, তাঁহারা যশোহর বাসী। যে হরিদাস ২২ বাজারে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অত্যাচারী নির্য্যাতকদিগের জন্য তাঁহার আরাধ্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এ সব জীবের প্রভু করহ প্রসাদ,
মোর দ্রোহে নহে এ সবার অপরাধ—"

খুলনায় তাঁহার জন্মভূমি ও যশোহরে তাঁহার সাধনাক্ষেত্র। এই যশোহরের ইতিহাস যে বাঙ্গালার ইতিহাসের অতি আবশ্যক অংশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সতীশ বাবু সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পুস্তক কেবল যশো-হর-খুলনাবাসীর নহে, বঙ্গবাসীমাত্রেরই নিকট সমাদৃত হইবে।

সতীশ বাবু এই ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন—(১) প্রাকৃতিক—ভৌগলিক বিবরণী (২) ঐতিহাসিক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত (৩) বৈষয়িক—যাবতীয় বিবরণী ও হিসাব statistics এবং (৪) আভিধানিক—অর্থাৎ (ক) প্রধান প্রধান স্থানের ইতিহাস (খ) প্রধান প্রধান বংশের বিবরণ (গ) প্রধান প্রধান কৃতী পুরুষের জীবন-বৃত্ত। বলা বাহুল্য ঐতিহাসিক অংশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ভাগ। সতীশবাবু এই অংশকেও চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) হিন্দুবৌদ্ধযুগ, (২) পাঠান শাসন (৩) মোগল আমল (৪) ইংরাজ শাসন। আলোচ্য প্রথম ভাগ গ্রন্থে প্রথমও দ্বিতীয় অংশের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সতীশবাবুর সকল মত যে অভ্রান্ত, এমন কথা কেহই বলেন না। কিন্তু তিনি যে, অসাধারণ শ্রম সহকারে ঐতিহাসিক ঘটনার সম্মিলনে যশোহরের ইতিহাস রচিত করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার কৃতিত্ব। আলোচনায় তাঁহার মতের বিচারসহতা পরীক্ষিত হইলে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ যে পরিষ্কৃত ও সুগম হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আমরা বাঙ্গালার ইতিহাসপ্রিয় পাঠকদিগকে এই পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি। আমরাও এই পুস্তক অবলম্বন করিয়া যশোহরের বিষয় আলোচিত করিব। একটিমাত্র প্রবন্ধে এরূপ পুস্তকে বর্ণিত বিষয়ের বিশদ আলোচনা অসম্ভব।

গ্রন্থকারের নিকট আমাদের নিবেদন, তিনি যে এই পুস্তকে কৃতী পুরুষদিগের জীবনকথার আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন, পুস্তকের ২৪৪ পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, তন্মধ্যে জীবিত ব্যক্তিদিগের নামও থাকিবে। ইহা যে সর্ব্বত্র নিরাপদ্ এমন নহে, তিনি যেন এই বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন।

এই বহুচিত্র সম্বলিত সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশের সমগ্র ব্যয়ভার যিনি বহন করিয়াছেন, বঙ্গদেশের সেই সুসন্তান যশোহর খুলনার গৌরব ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় গ্রন্থকারের মত আমাদেরও কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু সাহিত্যে ব্যক্তিবিশেষের সাহায্য গ্রহণ এখনও অনাবশ্যক হয় নাই, বাঙ্গালী পাঠকের—বাঙ্গালী সমাজের এই কলঙ্ক কবে দূর হইবে?



সতীশচন্দ্র মিত্র।

মণিহার।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

লখীয়ার দেবরের খুব সমারোহ করিয়া বিবাহ হইল। লখীয়া অনেক করিয়া জ্যোৎস্নাকে যাইতে বলিয়াছিল। কিন্তু জ্যোৎস্না কিছুতেই যাইতে স্বীকার হইল না। তাহার গোঁ-ধরা স্বভাব লুসিয়ার বেশ জানা ছিল। সেই জন্ম সে আর বেশী জিদ করিল না, জ্যোৎস্নাকে একা ফেলিয়া নিজেও যাইতে পারিল না। জ্যোৎস্নার জন্ম অত সমারোহের বিবাহ মাসী দেখিতে পাইল না, ইহাতে লখীয়া বিরক্ত হইয়াছিল। সে দ্বারবানের হাতে জ্যোৎস্নাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইয়া দিল।

'প্রিয় জ্যোৎস্নে। তুমি না আসিয়া বড় অন্যায় কায করিয়াছ। কারণ, তোমার জন্ম আমার মাসীমাও আসিতে পারিলেন না। তুমি ত খুব বুদ্ধিমতী—এ বুদ্ধি কি নাই—যে, তোমার আশ্রয়দাত্রীর তোমার জন্ম আমোদ-উৎসবে যোগ দেওয়া হইল না? গহর দাদা কত দিনে আসিবে, কে জানে? তত দিন কি মাসীমাও তোমার সহিত বন্দিনী থাকিবেন? তুমি বড় লোকের কন্যা বলিয়া, কাহারও বাটী যাইতে চাও না—আমার শ্বশুরালয়ে আসিলে বুঝিতে, তাঁহারাও নিঃস্ব নহেন। তাঁহাদের বাড়ীতে আসিলে তোমার মান কমিত না। যাহা হউক, আমার মাসীমাকে, আমার শাশুড়ী প্রীতিভোজন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবেন। উৎসব প্রভৃতি আমাদের আসমান-বাগে হইবে। সে দিন তুমি নিশ্চয়ই আসিও। তথায় আমাদের খুব নিকট আত্মীয় ব্যতীত আর কেহ যাইবেন না। বুঝিও, তুমি না আসিলে মাসীমার আসা হইবে না, তাহাতে আমার শাশুড়ীর অপমান করা হইবে এবং তিনিও রাগ করিবেন। তুমি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী বেশী আর কি লিখিব। তুমি আমার ভালবাসা ও স্নেহাশীষ জানিবে। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষিণী লখীয়া।

পত্র পড়িয়া জ্যোৎস্নার চক্ষু হইতে মুক্তার ন্যায় অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। সেই দিন সে স্থির করিল, 'রাজকন্যার মান সে ত্যাগ করিবে। নিরাশ্রয়ার আবার মান কি?'

যথাসময়ে লখীয়ার শাশুড়ী লুসিয়াকে ও জ্যোৎস্নাকে নিমন্ত্রণ করিতে

আসিলেন, দু'জনকেই যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন ও বিবাহে অনুপস্থিতির জন্য অনেক অনুযোগ করিলেন। লুসিয়া না যাইলে তিনি লখীয়াকে আর কখনও তাঁহার কাছে পাঠাইবেন না, এ কথাও প্রকারান্তরে বলিলেন। তিনি যাইবার পর লুসিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইল। কিন্তু জ্যোৎস্না সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লুসিয়াকে নিজের যাইবার সম্মতি জ্ঞাপন করিল। লুসিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত জ্যোৎস্নার মস্তকে হস্তস্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "মা, ঈশ্বর তোমায় মঙ্গল করুন। তুমি আমাকে কঠিন সমস্যা হইতে উদ্ধার করিলে। এক দিকে তোমাকে একলা রাখিয়াও যাইতে পারি না; আবার, না যাইলে লখীয়ার খাশুড়ীর রাগ হইবে। আর, তোমার পক্ষেও ইহা মঙ্গলজনক হইবে। সারাদিন বন্দিনীর ন্যায় থাক, এক আধ দিন এরূপ উৎসবে যোগদান করিলে তোমার মনও প্রফুল্ল হইবে।" জ্যোৎস্না, উত্তর করিল, "আগে বুঝি নাই, বু'ঝলে বিবাহেও যাইতাম।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লখীয়ার দেবর রূপচাঁদের বিবাহে সমারোহ হইয়াছিল। আর, বাগানের ওই 'প্রীতিভোজন' ব্যাপারের সুখ্যাতি সকলেই একবাক্যে করিয়াছিল। আসমান-বাগ সে রাত্রিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উজ্জ্বল আলোক-মালায় উদ্যানবৃক্ষগুলি স্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতেছিল। পথের পার্শ্বে কোথাও সুপারিবৃক্ষের সারি, কোথাও সুগন্ধি পুষ্পসমূহের কুঞ্জ। মধ্যে মধ্যে শ্বেত মর্ম্মর-নির্ম্মিত বিচিত্র নরনারীর মূর্ত্তি আলোকমালায় ভূষিত হইয়া অপ্সরা ও অপ্সরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। উদ্যানের মধ্যে একটি বৃহৎ জলাশয়। তাহার মধ্যে বিচিত্র বর্ণের আলোকে উদ্ভাসিত অপূর্ব্ব বিলাসভবন। যেন একটি সুসজ্জিত বজরা। জলাশয়ের উপর একটি কাষ্ঠের সেতু বিলাস-ভবন হইতে ঘাটের উপর আসিয়াছিল। বিলাসভবনের প্রত্যেক কক্ষ বহুমূল্য কারুকার্য্যখচিত বিবিধ বর্ণের বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। বৃহৎ বৃহৎ আয়না চতুর্দ্দিকের উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত করিতেছিল। বিবিধ পুষ্পের সৌরভ প্রত্যেক কক্ষে যেন নন্দন-কাননের ন্যায় সুবাসিত করিতেছিল। বাতাস পুষ্প সৌরভ বহন করিয়া দিক্‌ আমোদিত করিতেছিল।

যখন লুসিয়ার সহিত জ্যোৎস্না আসমান বাগে প্রবেশ করিল, তখন সে সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। আবার যখন লখীয়ার খাশুড়ী তাহা-

দের অভ্যর্থনা করিয়া সমাদরে বিলাস-ভবনে লইয়া গেলেন, তখন জ্যোৎস্নার মনে হইল যেন, সে অমরাবতীতে আসিয়াছে। বহুমূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ও বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া সুন্দরীরা সেই সুন্দর বিলাস-ভবনের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত করিতেছিল। জ্যোৎস্না একটি নীলবর্ণের সাটী পরিধান করিয়াছিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত; সেই জন্য সে কক্ষের এক নিভৃত কোণে উপবেশন করিল। অপরাপর নারীরা কলহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া কক্ষের চতুর্দ্দিকে সানন্দে ভ্রমণ ও পরস্পর রহস্যালাপ করিতেছিল। কিন্তু জ্যোৎস্নার রত্নালঙ্কার-বিহীন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। যেন সেই নীল জলাশয় হইতে সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত শ্বেত অরবিন্দ কেহ আনয়ন করিয়া কক্ষের শোভাবর্দ্ধনের ও অন্যান্য রমণীদের আত্ম-সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে স্থাপিত করিয়াছিল। সকলেরই তাহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু প্রথীয়া তাহাদিগকে বারণ করিল। সে বলিল, "ঐ যা রূপই আছে। ঐটুকু মেয়ে ভারী অহঙ্কারী।"

বর রূপচাঁদ ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই গৃহে আসিতেছিল। সকলে তাহাতে আপত্তি না করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। সকলেই অনুমান করিতেছিল, নব-পরিণীতা কনে'টির আকর্ষণে সে নানা ছুতায় আসিতেছে। কিন্তু কেহ যদি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিত, তবে বুঝিতে পারিত, কোণের পদ্মফুলটির দিকেই তাহার লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইতেছিল। বার বার তাহাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে ও তাহার দিকে কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না বিরক্ত হইতেছিল; সেই জন্য সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অলিন্দের নির্জ্জন ভাগে চলিয়া গেল। নিম্নে জলাশয়ের জল ঘোর নীলবর্ণ দেখাইতেছিল। দূরে বৃক্ষগুলি আলোকে আঁধারে কালো কালো দৈত্যের মত দেখাইতেছিল। লোকসমাগম জ্যোৎস্নার ভাল লাগিতেছিল না। সেই জন্য সে এই নির্জ্জনতায় একটু শান্তি পাইল; আনমনে জলের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে কে মিষ্টস্বরে বলিল, "কি, এখানে একলা যে?"

চমকিতা হইয়া জ্যোৎস্না মুখ ফিরাইয়া দেখিল, পশ্চাতে বর রূপচাঁদ। তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জ্যোৎস্না কক্ষে প্রবেশ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। রূপচাঁদ প্রবেশপথের কাছে সরিয়া আসিয়া হাসিয়া বলিল, "পালাইতেছ কেন? আমি বাঘ না ভাল্লুক। তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। সেই জন্য আলাপ করিতে আসিলাম। এখানে কেহ নাই। দুটা কথা বল না, দোষ কি?"

ক্রোধকম্পিতস্বরে বালিকা বলিল, "পথ পথ ছাড়িয়া দিন। নতুবা, জলে'

লাফাইয়া পড়িব। কি অসভ্যতা। অপরিচিতার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন! ধিক্ আপনাকে।"

রূপচাঁদ ব্যঙ্গস্বরে বলিল, 'বাবা! এ যে গোক্ষুরা সাপ। ঐটুকু দেহে, এত বড় চক্কর! এমন সুন্দর দেহে কাল বিষ।"

সে মনে মনে বলিল, "আচ্ছা দেখা যাবে, এ পদ্ম ফুলটি আমি লইবই। সোজা পথে আসিলে না, বাঁকা পথ ধরিব।"

রূপচাঁদ অন্যদিকে গমন করিল। ক্রোধে দুঃখে জ্যোৎস্না লুসিয়ার নিকট গমন করিয়া বলিল, "কখন ফিরিবেন?"

লখীয়া বিরক্তি-পূর্ণ-স্বরে বলিল, "খাওয়া হউক, তবে তো যাইবে।"

লুসিয়া লখীয়াকে বলিল, "তা বাছা, আমাদের খাওয়ার উদ্যোগ শীঘ্র করিয়া দাও। নূতন জায়গা উহার হয় তো ভাল লাগিতেছে না। উটি আমার বনফুল। গোলমাল ভালবাসে না।"

লুসিয়া জ্যোৎস্নাকে ভালবাসিত। জ্যোৎস্নার ব্যথিত-স্বরে সে ব্যথা পাইয়াছিল। সে ভাবিল, অনেকক্ষণ আসিয়াছে, আর এই সমারোহ ব্যাপার জ্যোৎস্নার ভাল লাগিতেছে না, সেই কারণে সে দুঃখিত হইয়াছে। তাহার কথায় লখীয়া সত্বর আহারের আয়োজন করিল। লুসিয়া আহার করিল, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে কোন মতে আহার করাইতে পারিল না। এই পাপিষ্ঠের আলয়ে জ্যোৎস্না কি জলস্পর্শ করিতে পারে? জ্যোৎস্নার এই অভদ্রতার জন্য সকলে তাহার নিন্দা করিল। লুসিয়া ক্ষুণ্ণমনে তাহাকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি কড়্কড় নাদে কর্ণ বধির হইতেছিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎস্ফুরণে চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছিল, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর হইবে। লুসিয়ার দরজার কড়া ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। এই বৃষ্টিতে এত রাত্রিতে কে আসিল? বিরক্ত হইয়া লুসিয়া গবাক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে তুমি?" উত্তর পাইল, "আমি রূপচাঁদ।"

লুসিয়া নিদ্রাতুরা জ্যোৎস্নাকে ডাকিয়া বলিল, "একটা আলো জ্বালিয়া রাখ। আমি দরজা খুলিতে যাইতেছি।

এই দুর্যোগে ও গভীর রাত্রিতে লুসিয়ার সহিত রূপচাঁদকে দেখিয়া জ্যোৎস্না ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় ত্রস্তভাবে গাত্রবসন সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। লুসিয়া রূপচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত্রিতে তোমায় দেখিয়া বড় ভয় পাইয়াছি। লখীয়া ভাল আছে ত?

হাঁ, আমি এদিকে একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। বৃষ্টি দেখিয়াও বাহির হইয়াছিলাম। বন্ধুর নিষেধ শুনি নাই। ভাবিয়াছিলাম, ত্বরিত-পদে বাটীতে পৌছিব। কতক্ষণ বৃষ্টি হইবে, কতক্ষণ তাহার বাড়ী অপেক্ষা করিব। পথে বাহির হইয়া বুঝিলাম, অন্যায় করিয়াছি, কাছাকাছি আপনার বাড়ী, সেই জন্য আসিলাম।"

লুসিয়া বলিল, "তা ভালই করিয়াছ, তুমি এই কক্ষে থাক। আমরা পার্শ্বের কক্ষে যাই।"

রূপচাঁদ বলিল, "আপনারা কেন পার্শ্বের কক্ষে যাইবেন? বৃষ্টির বেগ কমিলেই আমি চলিয়া যাইব। আপনারা শয়ন করুন, আমি ততক্ষণ পার্শ্বের কক্ষে বিশ্রাম করি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সে পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। লুসিয়া একটি আলো লইয়া তাহার অনুসরণ করিল। এইবার জ্যোৎস্না হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। যতক্ষণ রূপচাঁদ গৃহ-মধ্যে ছিল, জ্যোৎস্নার মনে হইতেছিল, সে ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া তাহার স্কন্ধে পড়িবে বা ক্রূর সর্পের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত করিয়া ধরিবে। বাগানের ব্যবহারের কথা সে লুসিয়াকে বলে নাই বলিয়া, অনুতাপে তাহার হৃদয় পুড়িতেছিল। সে লজ্জার কথা সে কিছুতে প্রকাশ করিতে পারে নাই। মনে হইলেই অপমানে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিত। কি করিয়া সে মুখে সে কথা আনিবে? আজ রূপচাঁদকে দেখিয়া সে বুঝিল, সে কথা প্রকাশ না করিয়া, সে ভাল করে নাই। জানিতে পারিলে লুসিয়া কখনই এ রাত্রিতে রূপচাঁদকে বাটীতে স্থান দিত না। লুসিয়া উদার-হৃদয়া স্ত্রীলোক। ন্যায়ের জন্য সে লখীয়াকেও অপমানিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না, রূপচাঁদ তাহার দেবর।

কক্ষে প্রদীপ রাখিয়া লুসিয়া যেমন দালানে পদার্পণ করিয়াছে, তখন কয়েক-জন লোক পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখে কাপড় চাপিয়া ধরিয়া তাহার হস্তপদ বাঁধিতে লাগিল। তাহার অস্ফুট স্বর শুনিয়া দীপ লইয়া রূপচাঁদ ও জ্যোৎস্না দালানে আসিল। সভয়ে জ্যোৎস্না দেখিল, যমদূতের মত সাত আট জন লোক লাঠি লইয়া রূপচাদকে আক্রমণ করিল ও নিমেষের মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। জ্যোৎস্না দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে ছুটিয়া গেল, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সে দরজায় অর্গল দিবার পূর্ব্বে তাহারা কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। আলোক-হস্তে জ্যোৎস্না শয্যায় উঠিল। একটা লোক কর্কশ স্বরে বলিল, "আলোটা রাখিয়া আমাদের সহিত চলিয়া আইস। একটি কথা কহিও না। যে দুর্য্যোগ চীৎকার

করিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না। আর, নহিলে উঁহাদের সহিত তোমার মুখ হাত পা বাঁধিয়া লইয়া যাইব।" নিরুপায়া জ্যোৎস্না তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমায় কোথায় লইয়া যাইবে? কেন লইয়া যাইবে?"

"কর্ত্তার হুকুম। কর্ত্তা বলিয়াছেন, ভাল কথায় আসে, উৎপাত করিও না। নহে ত জোর করিয়া বাঁধিয়া লইয়া আসিবে।"

"তোমরা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির মুখ খুলিয়া দাও। এতক্ষণ বাঁধা থাকিলে মারা যাইবে। আমি যাইতেছি চল। তাঁহার মুখ খুলিয়া আমায় লইয়া চল।"

প্রথম বক্তা বলিল, "ঠিক ত রে। মারা যাইলে যে আমাদের ঘাড়ে মস্ত জুলুম পড়িবে। কর্ত্তা হয় ত তখন সরিয়া দাঁড়াইবেন। একশত টাকার লোভে কি প্রাণ দিব না কি? শীঘ্র চল।"

খুনের ভয়ে আট জনই দালানের দিকে ছুটিল। জ্যোৎস্না দরজায় খিল দিয়া শয্যায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। রূপচাঁদের বন্ধন শিথিল ছিল। লুসিয়ার বন্ধন কঠিন ছিল ও সে মূর্চ্ছিতাবস্থায় ছিল। তাহার মুখের বন্ধন খুলিয়া তাহারা দেখিল, চক্ষু উর্দ্ধতার। সভয়ে তাহারা রূপচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল, "মারা গেল নাকি?"

রূপচাঁদ উঠিয়া বসিল, বলিল, "সে কি?" দলের মধ্যে একজন তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। তাহার পর সে লুসিয়ার মুখের নিকট ঝুঁকিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "মূর্চ্ছা, মরে নাই। তোমরা মেয়েটিকে লইয়া শীঘ্র পলাও। আমায় তেমনই করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাও। গাড়ী খুব দ্রুত চালাইতে বলিও। বৃষ্টির বেগ কমিয়া গিয়াছে। রাত্রিও অধিক নাই। যেইখানে রাখিতে বলিয়াছি, সেই স্থানেই রাখিও। আমি কল্য তথায় গিয়া তোমাদের টাকা দিব।"

"কর্ত্তা, অনেক পরিশ্রম হইয়াছে। বৃষ্টির জন্যও বড় কষ্ট পাইয়াছি। আর কিছু বেশী দিবেন।"

"এখন যাও—সময় নাই। বুড়ীর জ্ঞান হইলে গোল বাধিবে। পরে ও কথা হইবে।"

কক্ষের ভিতর হইতে জ্যোৎস্না এই কথোপকথনের কতক কতক শুনিতে পাইতেছিল। বৃষ্টির জন্য সে সব কথা বুঝিতে পারে নাই। যদি তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে, কি হইবে? তবে, বর্ত্তিকা কাপড়ে ধরাইয়া দিয়া পুড়িয়া মরিবে, আর কোন উপায় নাই।

বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিয়াছিল। ঝড়ও থামিয়া গিয়াছিল। পিশাচেরা দরজায় দুই একবার ধাক্কা দিয়াছিল। প্রতিবাসীর ভয়ে জোরে ধাক্কা দিতে

পারে নাই। সেই সামান্য ধাক্কাতে ভয় পাইয়া জ্যোৎস্না নিজের বসনে বর্ত্তিকা-প্রয়োগের উদ্যোগ করিয়া গবাক্ষ-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোদের পিশাচ দলপতিকে বলিস্, আমি প্রস্তুত আছি। সে যেন নিজে আসিয়া আমায় লইয়া যায়।" সে শান্তমনে হাসিমুখে বদ্ধ-করে দাঁড়াইয়া বসনে অগ্নিসংযোগ করিল; এই ব্যাপার দেখিয়া পিশাচদিগের হৃদয়-প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তাহারা দ্রুত রূপচাঁদের কাছে গিয়া সব বলিয়া প্রস্থান করিল। আপনার শিথিল বন্ধন তখনই মুক্ত করিয়া রূপচাঁদ ছুটিয়া গবাক্ষ-সন্নিধানে আসিল। মিনতি করিয়া জ্যোৎস্নাকে সেই প্রজ্বলিত বস্ত্র ত্যাগ করিতে বলিল, দুর্বৃত্তেরা চলিয়া গিয়াছে, তাহাও বলিল। জ্যোৎস্না ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিল, "তাহারা ত তোমারই অনুচর, তাহাদের সহিত তোমার যে কথা হইয়াছে, শুনিয়াছি। তুমি আমায় নিরাশ্রয়া ভাবিয়া আসিয়াছিলে, জান না, পবিত্র নারী কখন নিরাশ্রয়া থাকে না।"

"তুমি কাপড় এখনই পরিত্যাগ কর, কলসে জল আছে, তাহা বস্ত্রে দিয়া নিবাইয়া দাও। নহিলে ঐ অগ্নি তোমার আশ্রয়দাত্রীর সর্ব্বনাশ করিবে। ধর্ম্ম-সাক্ষী, আমি শপথ করিতেছি, আমা হইতে আর তোমার কোন ভয় নাই। এই মোহের জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমি মামীমার মুখে জল দিয়া জ্ঞান করাইতে যাইতেছি, তুমি আপনার বিপদ ও আশ্রয়দাত্রীর বিপদ দূর কর। আমার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না, এই মিনতি রাখিও। বলিও, আমি তাহাদের তাড়াইয়াছি।" জ্যোৎস্না সব ভাবিয়া কলস তুলিয়া দেহে জল ঢালিতে লাগিল।

রূপচাঁদ দ্রুতপদে লুসিয়ার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহার মুখে জল-সিঞ্চন পূর্ব্বক তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল, এবং জ্যোৎস্নাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিতে বলিয়া প্রস্থান করিল। জ্যোৎস্না লুসিয়াকে রূপ-চাঁদের কথামত একটি কাল্পনিক কথা বিবৃত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন লুসিয়া জ্যোৎস্নার হস্ত দুইখানিতে প্রলেপ দিতে দিতে কথা কহি-তেছিল। এতদিন পরে জ্যোৎস্না লুসিয়ার কাছে একটু সেবা লইল। গত রাত্রির অগ্নিতে জ্যোৎস্নার শরীর স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বক্ষে ও পৃষ্ঠে সামান্য তাপ লাগিয়াছিল, তাহাতে ঔষধ দিবার দরকার হয় নাই। লুসিয়া বলিল, "ভাগ্যে রূপচাঁদ আসিয়াছিল, নহিলে ডাকাইতেরা কি সর্ব্বনাশ করিত, কে জানে? রূপচাঁদের বোকামির জন্যই দুর্য্যোগে চোররা ঘরে প্রবেশ

করিতে পারিয়াছিল। আবার তাহার জন্য রক্ষাও পাইলাম। আমি বুড়া হইলাম—এদিকে কখনও চোর-ডাকাইত দেখি নাই। আমার স্বামী থাকিতে যত চাকর লোকজন ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর অনাবশ্যক ভাবিয়া ও আয় কমিল বলিয়া, ঐ ঠিকা ঝিটি ছাড়া আর কোন লোক রাখি নাই। কত দুর্যোগ গিয়াছে, একলাই ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি। এমন বিপদে কখন পড়ি নাই।"

'রূপচাঁদের বোকামি' কথাটিতে জ্যোৎস্না ভাবিল, "তবে কি উনি কিছু কিছু শুনিয়াছেন ?" নিম্ন দিকে চক্ষু রাখিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "রূপচাঁদের বোকামিতে চোররা প্রবেশ করিয়াছিল, বলিলেন কেন ?"

"জান না—সে যে সদর দ্বার বন্ধ করিয়া আইসে নাই। দরজা বন্ধ থাকিলে ত তাহারা প্রবেশ করিতে পারিত না। দুর্য্যোগ হইলেই চোর ডাকাইত পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, সুবিধা পাইলেই লোকের সর্ব্বনাশ করে। যাহা হউক, বাছা, তোমার জীবন যে রক্ষা পাইয়াছে, এজন্য ভগবানকে শতসহস্র ধন্যবাদ। জহর আসিলে বাঁচি। যদিও তুমি আসিয়া আমার আঁধার গৃহ আলো করিয়া আছ, আমার মনে কত আনন্দ দিতেছ, তবু বাছা, এই ব্যাপারে আমার বড় ভয় হইয়াছে। যাহাদের জিনিষ, তাহাদের কাছে ভগবান নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিউন। যে কয়দিন না ফোস্কাগুলি শুকায়, সে কয়দিন অমন করিয়া গায়ে চাদর জড়াইয়া থাকিও না। তুমি ছোট মেয়ে, আমার বাড়ীতে কোন পুরুষের সমাগম নাই। সর্ব্বদা একখানা বড় চাদর জড়াইয়া থাক কেন, মা ?"

"আমার পিতা অন্তিমকালে আদেশ করিয়াছেন, "যতদিন তুমি স্বদেশে না পৌঁছাইবে ; ততদিন সমস্তক্ষণ চাদরে আবৃত হইয়া থাকিবে। তাঁহার আদেশ আমায় রাখিতেই হইবে।"

"তাহা হইলে ঘা কি শীঘ্র শুখাইবে ?"

"কেন মা, আপনি ত তখন বলিলেন,এই প্রলেপ খুব ভাল। আট দশ দিনে পোড়ার চিহ্ন অবধি লুপ্ত হইবে।"

"সে কথা ঠিক। এ আমার স্বামীর ঔষধ। তিনি একজন অবধূতের কাছে পাইয়াছিলেন।"

"তবে ভয় কি। আপনি কোন আদেশ করিলে, আমার তাহা রাখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু পিতার শেষ আদেশগুলি কিছুতেই ঠেলিতে পারি না—সেই জন্য সময় সময় আপনার অবাধ্য হই।"

লুসিয়া বলিল, "আজ আমার বড় আনন্দ হইল ; আমি ভাবিতাম, তোমার গোঁ-ধরা স্বভাব। সেই জন্য কথা রাখিতে সম্মত হও না। তুমি পিতার

আদেশপালন কর, সে ত খুব ভাল কথা। এত দিন কেন তাহা বল নাই, মা? তাহা হইলে কোন বিষয়ে তোমায় জিদ করিতাম না।"

লুসিয়ার আনন্দ দেখিয়া, জ্যোৎস্নার নয়নে আনন্দাশ্রু ফুটিয়া উঠিল। আশ্রয়-দাত্রীকে সময় সময় কষ্ট দিত বলিয়া তাহার মনে ব্যথা লাগিত। সেই দিন হইতে তাহা দূর হইল। (ক্রমশঃ)

ব্যাপ্ত প্রেম।

হে প্রেম, এসেছ, স্বর্গ তাজিয়া
ধন্য করিতে মর্ত্ত্যভূমি,
রুদ্ধ-হৃদয়নিলয়ে আমার
বন্দী কি হেথা রহিবে তুমি!

শান্ত নিবিড় নবমেঘরূপে
আবরি, দীপ্ত রবির কায়া
বিথারি, দাও গগনে তাহার
তোমার সজল স্নিগ্ধছায়া।

কুসুমের সাথে অতুল শোভায়
নীরবে ফুটিয়া কাননে তা'র
নিঃশেষে তা'য় দাও উপহার
সঞ্চিত তব সুরভি ভার।

শ্যামল কোমল তৃণদলে মিশি'
রাখ পথ তা'র যতনে ঢাকি,
পবনের সাথে বহি' ধীরি ধীরি
বুলাও পরশ অমিয় মাখি'।

জোছনার সনে মিশি লয়ে যাও
ভাসায়ে তাহারে স্বপন-দেশে,
ধ্রুবতার হ'য়ে মুখপানে তা'র
জেগে চেয়ে থাক নিশিশেষে।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ।

পূজ্যপাদ

মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন।

মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই, এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তি-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। তাঁহার বিরহে এ দেশে ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদায় অদ্য ভ্রষ্ট-শ্রী ও বিলুপ্ত-গৌরব। তাঁহার গৌরবময় পবিত্র জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আজ বঙ্গের—শুধু বঙ্গেরই বা কেন—সমগ্র ভারতের ন্যায়দর্শন হীনপ্রভ ও নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে তাঁহার কতদূর প্রাধান্য ছিল, বিদ্বৎসমাজে তাঁহার আসন কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট ছিল, সহৃদয় গোষ্ঠীর মধ্যে তাঁহার অবস্থিতি কিরূপ আদরের ও গৌরবের ছিল, সর্ব্বোপরি তাঁহার ব্রাহ্মণপণ্ডিতোচিত তেজস্বিতা সরলতা ও বাক্‌পটুতা কেমন সম্মানের ও স্বজাতি-গৌরবের মহনীয় কেন্দ্র ছিল, তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহার জীবন ইতিহাসের কয়েক পত্রের একটু বিশদ আলোচনা আবশ্যক। তাহা-রই জন্য আমার অদ্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। তাঁহার জীবনের গৌরবোজ্জ্বলিত ঘটনাবলীর বিশদ বর্ণন করিবার ভার তাঁহার সহিত পারিবারিক ঘনিষ্ঠসূত্রে অসংসৃষ্ট কোন শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলে, ঐ কার্য্য আরও সুন্দরভাবে পরিনিষ্পন্ন হইত, তাহা আমি জানি এবং জানিয়াও যে কেন এ কার্য্যে অসম্পূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইলাম,—সে বিষয়ে আমার এইমাত্র উত্তর যে, আশীর্ব্বাদভাজন আর্য্যাবর্ত্ত-সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধ নানা কারণে উপেক্ষা করিতে না পারিয়াই—আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আশা করি ও প্রার্থনা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া আমার এই চিরপ্রথিত শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন-নিবন্ধন ত্রুটি ক্ষমা করিবেন।

মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ গুরুকুল বশিষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺সীতানাথ বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎকালে একজন সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র। ন্যায়রত্ন মহাশয় বাল্যকাল হইতেই অসামান্য বুদ্ধিমান ও তেজস্বী বলিয়া প্রথিত ছিলেন। ভট্টপল্লীর গুরুবংশ পাণ্ডিত্য ও সদাচার-সমুদ্ভূত বিমল কীর্ত্তিকলাপে চিরমণ্ডিত। এই বংশের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ

বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক পণ্ডিত ৺জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ন্যায়রত্ন মহাশয় ব্যাকরণ সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই ঐ সকল শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া তিনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, তৎকালে বিদ্বৎসমাজে গৌতমাবতার বলিয়া প্রথিত ৺হলধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট ন্যায়রত্ন মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিদেশের নিমন্ত্রণে তাঁহাকে অনেক সময় কাটাইতে হইত, এই কারণে তাঁহারই ইচ্ছানুসারে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র ৺যদুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের উপরই প্রকৃত পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ৺গঙ্গালাভ হওয়ায় ন্যায়রত্ন মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয়েরই ছাত্ররূপে তাঁহারই নিকটে সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের যশ বঙ্গদেশে প্রধান নৈয়ায়িক অধ্যাপকগণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সভাস্থলে তাঁহার বিচারনৈপুণ্য দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিচারক্ষমতা ও সদুত্তর করিবার ক্ষমতা তৎকালে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের নিকট অলৌকিক ও বিস্ময়াবহ বলিয়া প্রথিত হইয়া পড়িল। অল্পবয়স্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িকের বিচারশক্তির অসাধারণ কীর্ত্তিকলাপ বঙ্গের কি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কি শাস্ত্রানুরাগী বিষয়ী ভদ্রলোক সকলেরই মুখে মুখরিত হইতে লাগিল। এই ভাবে অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় যৌবনের প্রারম্ভে বিশেষ অধ্যবসায়সহ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলের প্রতিভাবান ও সুচরিত্র ছাত্রবৃন্দ বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে তাহার নিকট ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষা লাভ করিবার জন্য তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহার সহিত বিচার করিয়া—আত্মপক্ষ স্থাপন বা তদীয় পক্ষ নিরাকরণ করিবার সামর্থ্য তৎকালে এই ন্যায়শাস্ত্র-জন্মভূমি বঙ্গদেশে কাহারও ছিল না এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে নানা কারণে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিতান্ত ক্ষীণভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অধ্যাপনা আরম্ভকালে বঙ্গদেশে ন্যায়শাস্ত্রের প্রাধান্য বিলক্ষণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃহস্পতিকল্প প্রতিভাবান্ নৈয়ায়িক-কুলগৌরব শ্রীরাম শিরোমণি, গোলক ন্যায়রত্ন, হরমোহন তর্কচূড়ামণি ও ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন প্রমুখ বঙ্গের অলঙ্কার ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণ তখন নবদ্বীপসমাজে অগ্রণী ছিলেন। ত্রিবেণীতে রামদাস বাচস্পতি, উত্তরপাড়ায় দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, বাকলাসমাজে কমল ন্যায়রত্ন, কোঁড়কদীতে রামধন তর্কপঞ্চানন, বাঁশবাড়ীয়াতে ব্রজকুমার বিদ্যারত্ন, বিক্রমপুরে সারদাচরণ তর্করত্ন, বেহালায় জানকীনাথ তর্করত্ন প্রমুখ নৈয়ায়িক-কুলধুরন্ধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তখন বঙ্গের অধ্যাপককুলের শীর্ষস্থানীয় রূপে বিরাজমান ছিলেন। এই সকল অসামান্য প্রতিভাশালী দিগন্তবিশ্রুতযশাঃ মহামহোপাধ্যায় তেজস্বী ও আচারবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ একবাক্যে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভার যশোগান করিতে অণুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। এক কথায় বলিতে গেলে, তৎকালে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পাণ্ডিত্য-খ্যাতি বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে এতই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য—তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ করিবার জন্য সেকালের শাস্ত্রব্যবসায়ী সুরসিক পণ্ডিতগণ বহুদূর হইতে ভট্টপল্লীতে আগমন করিতে শ্লাঘা বোধ করিতেন। এইভাবে প্রৌঢ়বয়সে দেশে অদ্বিতীয় মান-সম্ভ্রম লাভ করিয়া, ন্যায়রত্ন মহাশয় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ কাশীতে অবস্থানপূর্ব্বক সাধনামার্গে অতিবাহিত করিবার আশায়, নিজ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। যে সময় তিনি কাশীবাসের জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করেন, তখন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতসমাজে তাঁহার অদ্বিতীয় প্রাধান্য সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বস্বীকৃত হইয়াছিল। ধনে মানে সম্ভ্রমে শিষ্যসম্পদে তখন তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু আচারপূত ব্রাহ্মণাবতার ন্যায়রত্ন মহাশয় এই সকল পার্থিব অভ্যুদয় ও কীর্ত্তির পরাকাষ্ঠা উপেক্ষা করিয়া দেশের মায়ামমতা কাটাইয়া বৈরাগ্যপ্রবণ হৃদয়ে হিন্দুর মহাশ্মশান-ক্ষেত্র বারাণসী আশ্রয় করিতে অণুমাত্রও বিচলিত হন নাই। পার্থিব ভোগ-সম্পদের পরিবর্ত্তে অবিনাশী অমৃতপদপ্রাপ্তির আশায় তিনি অনন্তহৃদয়ে কাশীশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে জয় করিল। বৈরাগ্য ভোগ-বাসনার সহিত সংগ্রামে বিজয়ী হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের জীবনের যাহা অলঙ্কার—সেই ত্যাগ হিন্দুশাস্ত্রসেবনের অবশ্যম্ভাবী ফলের মহিমা আবার জাগাইয়া দিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় কাশীনাথের চরণে আত্মসমর্পণ করিবার উদ্দেশে কাশীবাস আরম্ভ করিলেন। ইহাই হইল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অলৌকিক চরিত্রের বিশেষত্ব ও মহনীয়ত্ব।

কাশীবাসকালে ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত স্নান সন্ধ্যা ও ভগবৎপূজায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি মিতাহারী ও

মিতাচারী ছিলেন। কাশীতে যাইয়া তিনি ঐ সকল বিষয়ে সংযম আরও বাড়াইয়া দিলেন। আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি তদীয় এই দীর্ঘকালব্যাপী জীবনের মধ্যে এক দিনের জন্য মিতভোজনের মাত্রা অতিক্রম করেন নাই, কখনও কোন ব্যক্তির অনুরোধে বা উপাদেয় আহার্য্যের লোভে একগ্রাসও অধিক ভোজন করেন নাই। উপবাস করিতে তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। মধ্যে কাশীবাসকালে তাঁহার দুইবার দীর্ঘকালস্থায়ী জ্বর রোগ হয়। একবার জ্বর প্রায় এক মাসকাল তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছিল, অন্যবার প্রায় দুই মাস তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। এই দুই বারেই তিনি কেবল মাত্র একটু দুগ্ধ বা আধখানি বেদানা খাইয়া একাদিক্রমে ২৮ দিন এবং ৪৫ দিন যথাক্রমে উপবাস করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘকালের উপবাসে তাঁহার জপ, তপস্যা, সন্ধ্যা ও নিত্য পূজাদির কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সেই প্রভাত হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঠাকুরঘরে বসিয়া উক্ত প্রাত্যহিক ধর্ম্মকার্য্যগুলি তিনি রোগের অবস্থাতে যথাবিধি সম্পাদন করিতেন। তাহার পর বৈকালে প্রত্যহ ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা ও চিন্তন তাঁহার আজীবন ব্রত ছিল। কাশীতেও তিনি এই ব্রত প্রতিপালনে এক দিনের জন্যও পরাঙ্মুখ হন নাই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কিরূপ সদাচারী হওয়া উচিত, তিনি তাঁহার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। জীবনে কখনও তিনি মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করেন নাই, আতপ তণ্ডুল ঘৃত ও দুগ্ধই তাঁহার প্রধান আহার্য্য ছিল। কাশীবাসকালে তিনি প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর পিতার ও মাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিনে তিনি কাশীর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিতেন এবং এই কার্য্যে প্রতি বৎসর অন্যূন চারি শত টাকা ব্যয় করিতেন। মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্বেও প্রত্যহ বিদ্যার্থীদিগের লইয়া ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা ও উপদেশ তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। শাস্ত্রীয় বিষয়ের আলোচনার জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন এবং অবসর উপস্থিত হইলে অন্যান্য সকল কার্য্য অপেক্ষা ইহাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইত। অনেক কাশীবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি মাসিক বৃত্তিদ্বারা সাহায্য করিতেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি ব্রাহ্মণপণ্ডিতকুলের মধ্যে সর্ব্বদা সুবিদিত ছিল। তিনি কাশীবাসের জন্য যখন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রাণাপেক্ষাপ্রিয় স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমিকে সম্বোধন করিয়া যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে-

আবাল্যং জননীব জীবয়সি মাতর্মারোপ্য হৃৎপিঞ্জরং
স্বচ্ছন্দং বশবর্ত্তিনী চ মধুরৈর্মূলৈঃ পয়োভিঃ ফলৈঃ।
বিণ্মূত্রাদিপবিগ্রহেণ চ কদা বাধাপি জাতা ন তে
ক্রোড়ে ক্রীড়নমস্তু বঙ্গবসুধে মুঞ্চাম্যহং জায়তাম্॥ ১।
বঙ্গাবাসমসাস্তু বাসকৃতয়ে যাস্যামি কাশ্যামহং
মদ্দোষাদিহ কেঽপি সন্তি বিবুধা মধ্যে চ মদ্দ্বেষিণঃ।
অদ্বেষেণ ভজন্তু তোষমধুনা সাধুদিমাং প্রার্থনাং
কুর্ব্বেঽহং বিহিতাঞ্জলিঃ সবিনয়ং রাখালদাসঃ স্বয়ম্॥ ২।

এই দুইটি শ্লোকের অনুবাদ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রতিভাবান্ পুত্র ৺হরকুমার শাস্ত্রী এইরূপ করিয়াছিলেন—

বাল্য হতে দাসে তুমি পালিতেছ, বঙ্গভূমি
স্নেহময়ী জননীর প্রায়।
হৃদয়-পিঞ্জরে রাথ সদা যেন বশে থাক
তব ঋণ শোধা কি, মা, যায়।
দিয়াছ মা অনিবার ফলমূলপয়োধার
হ'লে আমি ক্ষুধায় কাতর।
মাগো ওই কোলে কত মল মূত্র অবিরত
ঢালিয়াছি বাধা নাই তোর।
আজি হ'তে তোর ছেলে স্নেহমযি তোর কোলে
ধূলাখেলা করি সমাপন,
সন্তানে রে ও মা তুমি আজ্ঞা দাও, বঙ্গভূমি
কাশী বাসে চলেছি এখন। ১।
কাশীবাস করিবারে দীনহীন যাত্রা করে
উঠিবে গো বঙ্গের বসতি।
যদি এই বঙ্গস্থলে থাকেন পণ্ডিতকুলে
মোর দোষে কেহ কষ্ট মতি।
আজি সব সাধুকুলে সমুদায় দ্বেষ ভুলে
তুষ্ট হৌন অধীনের প্রতি।
গললগ্নী কৃতবাস করিছে রাখাল দাস
করযোড়ে সবারে মিনতি। ২।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা মাত্র করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। ন্যায় দর্শনের সিদ্ধান্তগুলির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল। তিনি বিবেচনা করিতেন যে দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এই এক মাত্র ন্যায়দর্শনই মনুষ্য-জীবনের যাহা প্রকৃত শ্রেয়ঃ তাহাকে লাভ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। তিনি ভক্ত বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, অদ্বৈতবাদের উপর তাঁহার একেবারেই শ্রদ্ধা ছিল না, তিনি ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। জীবনের শেষদশায় তৎকর্ত্তৃক বিরচিত অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন ও মায়াবাদ-নিরাশ এই বিষয় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই দুইখানি গ্রন্থে তিনি তাঁহার অলৌকিক প্রতিভোদ্ভাসিত যুক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রমাণ-মূলক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইতে পারে না, জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, জীবের উপাস্যত্ব ও পরব্রহ্মের বা পরমেশ্বরের উপাস্যত্বই হিন্দুশাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য। জীব পরতন্ত্র, পরমেশ্বর স্বতন্ত্র। তাঁহার করুণা ব্যতিরেকে জীবের ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। জীবের ও ব্রহ্মের অভেদ ভাবনার বিষয় হইতে পারে কিন্তু তাহা কিছুতেই বাস্তব হইতে পারে না। মায়া বিশ্বের উপাদান নহে, চতুর্ব্বিধ পরমাণুই ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া এই জগতের উপাদান হইয়া থাকে এবং তাঁহারই ইচ্ছানুসারে প্রলয়কালে ঐ সকল পরমাণু পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া জগতের প্রলয় সাধন করে। তিনি ন্যায়দর্শনের প্রচলিত আত্মবাদের উপর দোষার্পণ করিয়া মনের আত্মত্ব ব্যবস্থাপন করিয়া একখানি গ্রন্থনির্ম্মাণ করেন। পুস্তকখানির নাম জীবতত্ত্ব। এই গ্রন্থে তিনি যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন, আমাদের মনই আত্মা এবং ঐ মন বিভু বা ব্যাপক নহে। এই সকল নূতন সিদ্ধান্ত ন্যায়-মতানুসারে স্থাপন করিতে যাইয়া তিনি যেরূপ দার্শনিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এক প্রকার অসাধারণ—অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইহাই হইল, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। যাঁহারা তাঁহার এই পবিত্র জীবনের সাধনাময় পবিত্র কার্য্যকলাপের বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা তদীয় প্রধান ছাত্র মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্কলিত ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কাশীবাস নামক প্রাসঙ্গ গ্রন্থখানি যেন পাঠ করেন। কেমন দীনতার সহিত একনিষ্ঠভাবে কাশীবাসপূর্ব্বক তিনি ভগবান্ বিশ্বনাথের সেবা নিরত হইয়াছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার রচিত শ্লোক পাঠে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

বৈকুণ্ঠাদপি বেধসোঽপি নগরাৎ পূতা মঘোনঃ পুরাৎ
কাশীয়ং তব দেবদেব বিবুধৈর্যত্র স্থিতিঃ প্রার্থ্যতে।
বৈধাবৈধমজানতোঽত্র বসতো দাসস্য দোষঃ প্রভো
ক্ষন্তব্যঃ কৃপয়া নিবেদনমিদং শম্ভো পদাম্ভোরুহে॥

অনুবাদ

বিষ্ণুপুরী ব্রহ্মপুরী ইন্দ্রপুরী কিবা
পবিত্র কাশীর মত ত্রিভুবনে কেবা?
হেন মোক্ষ ভূমি পাব অন্যত্র কোথায়
মুক্তিতরে তাই কাশী দেবতাও যায়।
তুমি গো দেবের দেব তব এই পুরে
তোমার এ দাস দাস এসে বাস করে।
কিবা বৈধ কি অবৈধ নাহি তার জ্ঞান
দাস বলে ক্ষমা কর করুণানিধান।

বালং ব্যাল কৃশানলাদি ভরতঃ স্নাতঃ শিবস্নানতে
তুষ্টং চাপি শিশুপ্রসূস্তনযুগে দৃষ্ট্বা শিবো রক্ষতি।
হস্তি শ্রীশিব এব সর্ব্বসময়ে ভক্তস্য সর্ব্বাপদং
তদ্ভো জীব শিবঃ শিবঃ শিব ইতি ধ্যানৈর্ধরা পূর্য্যতাম্॥

এই ভাবে স্বধর্ম্মাচরণ ও শাস্ত্রালোচনা দ্বারা প্রায় ৮৭বৎসর কাল পবিত্র জীবন যাপন করিয়া পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত ন্যায়রত্ন মহাশয় গত কার্ত্তিকমাসে কাশীবাসে গঙ্গাতীরে কেদারঘাটের বক্ষকণ্ডের উপর নিজের নশ্বর দেহ রক্ষা করিয়া নির্ব্বাণ-রূপ অমৃতসাগরে আত্মাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুলের সমুন্নত চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ব্রাহ্মণত্বের ও পাণ্ডিত্যের তেমন উজ্জ্বল ও মধুর আদর্শ আর এ বঙ্গদেশে কখনও উদিত হইবে কিনা তাহা ভগবানই জানেন, কিন্তু যাহা গিয়াছে, তাহা যে হিন্দুসমাজের শান্ত আকাশে একটী সমধিক সমুজ্জ্বল মাধুর্য্যময় নক্ষত্র ছিল, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

ঐতিহাসিক পরিচয়।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রাঢ়দেশে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলা বুঝাইত। সেই সময় বর্দ্ধমান বঙ্গের একটি প্রধান নগর। অনেকে অনুমান করেন, জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নাম হইতে বর্দ্ধমানের নামোৎপত্তি হইয়াছে। রাঢ়দেশের সীমানির্দ্দেশ করিতে যাইয়া দিগ্বিজয়-প্রকাশকার লিখিয়াছেন :—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্ব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

প্রাচীন রাঢ় দেশে অনেক দিন ধরিয়া অনেক কীর্ত্তি সংঘটিত হইয়াছে। ইহার অন্তর্গত বহুস্থান অনেক বিচিত্রনাটকের রঙ্গভূমি হইয়াছে। কিছু কাল ধরিয়া এই সুবিস্তীর্ণ রাঢ়প্রদেশের অন্তর্গত গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়া নামক স্থানের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া যে সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত করিতেছি। গুপ্তপল্লী হুগলি জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধগ্রাম। ভাগরথীর পুণ্যসঙ্গমে অবস্থিত থাকিয়া ইহা বহুদিন ধরিয়া বঙ্গীয় সমাজচতুষ্টয়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। গুপ্তপল্লীর উত্তরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাসভূমি, চৈতন্য-পার্ষদগণের লীলানিকেতন পবিত্র শান্তিপুর-ধাম শোভা পাইতেছে, দক্ষিণে উপকণ্ঠ-বাহিনী বেহুলাতটিনী ক্ষীণজল-ভার বক্ষে ধারণ করিয়া কুলুকুলু নিনাদে বহিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে ভাগীরথীর অপর পারে বঙ্গবাল্মীকি কৃত্তিবাস কবির জন্মভূমি ফুলিয়াগ্রাম, পশ্চিমে বর্দ্ধমানরাজ্যের শুভ্রকীর্ত্তি-সম্ভূষিত কালনা নগরী।

গুপ্তপল্লীর নামোৎপত্তি সম্বন্ধে কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে—

নামোৎপত্তি — শান্তিপণমুনের্বাসাৎ শান্তিপুরমিতি স্মৃতম্।
শান্তিপুর ও গুপ্তপল্লী — তস্য দক্ষিণাগুপ্তিত্বাৎ গুপ্তপল্লীতি যা বভৌ॥

অর্থাৎ শান্তিপণমুনির বাসহেতু শান্তিপুরের নামকরণ হইয়াছে, এবং ইহার দক্ষিণভাগে অবস্থিত হওয়ায় গুপ্তপল্লীর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু কুলপঞ্জিকাকারগণের এ কথা নিতান্ত অলীক ও ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া মনে হয়। "নদীয়া-কাহিনী" গ্রন্থে শান্তিপুরের নামোৎপত্তিপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে, "অনেকে বলিয়া থাকেন, শান্তিপুরে * * * পূর্ব্বে শান্ত নামে একজন বেদাচার্য্য

বাস করিতেন। তাঁহার চলিত নাম শান্তমুনি, এই শান্তমুনির নাম হইতেই শান্তিপুরের নামোৎপত্তি; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে শান্তমুনি হইতে শান্তিপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেন না 'শান্তিপুর' নামটি শান্তমুনির পূর্ব্ব হইতেও প্রচলিত দেখা যায়। শান্তমুনি শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সমসাময়িক। * * *" (১) শান্তিপুরের ন্যায় গুপ্তপল্লীর নামও যে অদ্বৈতাচার্য্যের বহু পূর্ব্বের তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শান্তিপুর নামের উৎপত্তি কতকাল পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে অবগত হওয়া যায় না।

ইতিহাস-পাঠে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে বঙ্গদেশের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তিব্বতের রাজা থিষ্ট্রন্-দি-ৎসনের আহ্বানে তিব্বতে গমন করেন। ইহাঁর নাম শান্তরক্ষিত। তিনি গৌড়ের অধিবাসী ছিলেন; ভাগ্যক্রমে নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত হন। শান্তরক্ষিত তিব্বতবাসিগণ কর্ত্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হন। এইস্থানে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। যে সকল পণ্ডিত তিব্বতরাজ কর্ত্তৃক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের তিব্বতী ভাষায় অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন,তন্মধ্যে বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত শান্তরক্ষিতের নাম দৃষ্ট হয়। তিনি তিব্বতবাসিগণের নিকট হইতে আচার্য্য বোধিসত্ত্ব আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (২) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালায় শান্তিপুর নামে এক নগর ছিল। তাহার তিন দিকে গড় ছিল, একদিকে একটিমাত্র রাস্তা ছিল। সেখানে প্রচণ্ডদেব নামে এক রাজা ছিলেন।' তিনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া সিদ্ধাচার্য্য হন, সিদ্ধাচার্য্য হইলে তাঁহার নাম হয় শান্তিকর। তিনি নেপালে গিয়া স্বয়ম্ভূক্ষেত্র প্রকাশ করেন।" (৩) শান্তিকর বা শান্তিদেব চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয় ও বোধিচর্য্যাবতার নামে গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই দুইখানি পুথি উদ্ধার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকালয়ে শান্তিদেবের জীবনচরিত-সংবলিত একখানি তালপত্রের পুথি আছে। ইহার আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, শান্তিদেব বাঙ্গালী, তিনি মগধাধিপের 'রাউত' অর্থাৎ সেনাপতি হয়েন। (৪) শাস্ত্রী মহাশয় শান্তিপুর শব্দে কোন্ স্থান বুঝাইতে চাহেন, জানি না, তবে আমা-

শান্তরক্ষিত বা শান্তিদেব

(১) নদীয়াকাহিনী।
(২) Indian Pandits in the Land of Snow.
(৩) সাহিত্য সম্মিলনের ১৩২০ সালের অধিবেশনে পঠিত অভিভাষণ।
(৪) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা একবিংশ ভাগ, ১ম সংখ্যা।

দের মনে হয়, ইহা নদীয়ার অন্তর্গত আলোচ্য শান্তিপুর। নগরের তিন দিকে গড় থাকার কথা তিনি যে বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বহু প্রাচীনকালে শান্তিপুরের তিন দিক্ দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা ছিলেন। অদ্বৈতমঙ্গলগ্রন্থে আছে, শান্তিপুরে দ্রবময়ী বহে তিন দিকে।" ইহার খাত এখনও বর্ত্তমান আছে। নগরের তিন দিকে বহমানা গঙ্গানদীই বোধ হয় গড় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শান্তিদেবের জীবনচরিতে লিখিত আছে যে, শান্তিদেব মগধাধিপের রাউত অর্থাৎ সেনাপতি হয়েন। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী রাউতপুর গ্রাম তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে কি না, সুধীবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। ইহা সত্য হইলে শান্তিপুর অষ্টম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে। গুপ্ত-পল্লীও এই সময় বর্ত্তমান ছিল · তাহার কথা বলিতেছি।

আদিশূর ও গৌর ব্রাহ্মণ

কুলগ্রন্থাদির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদিশূরের আহ্বানে কনৌজ হইতে দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ ভট্টনারায়ণ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আগমন করেন। তাঁহাদের প্রার্থনানুসারে কালীঘাট, অগ্রদ্বীপ, বটগ্রাম, গুপ্তপল্লী ও ত্রিবেণী এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদত্ত হয়। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ কালীঘাটে, শ্রীহর্ষ অগ্রদ্বীপে, দক্ষ বটগ্রামে, বেদগর্ভ গুপ্তপল্লীতে এবং ছান্দড় ত্রিবেণীতে চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করেন। (৫) উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড়ে আগমন করেন, সুতরাং তখনও গুপ্তপল্লীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। উক্তস্থান সে সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চয় ব্রাহ্মণাধ্যুষিত ছিল; নতুবা বেদগর্ভ তথায় কখনও চতুষ্পাঠী-স্থাপন করিয়া অধ্যাপনার সূচনা করিতেন না।

রাঢ়ে গুপ্তরাজত্ব

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, কর্ণসেনের বংশধরগণের নিকট হইতে গুপ্তরাজগণ রাঢ়প্রদেশ কাড়িয়া লয়েন। (৬) গুপ্তরাজগণের কেহ কেহ এতদঞ্চলে বৌদ্ধবিহার ও মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কাটোয়া, পাঁচথুপী, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে এই সময় বা ইহার কিছু পূর্ব্বে বিহার নির্ম্মিত করান। গুপ্তরাজগণের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রসূত তান্ত্রিক মত রাঢ়দেশে প্রবল হইয়া উঠে এবং রাঢ়ে কালিকা,চামুণ্ডা প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবতামূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। রাঢ়ের তান্ত্রিকবহুল এবং তন্ত্রমতপ্রধান গ্রাম-সমূহের মধ্যে গুপ্তপল্লী অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। এখানেও বহুপ্রাচীনকাল

---

(৫) বাঙ্গালার, পুরাবৃত্ত শূরকঃ।

(৬) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত।

হইতে এক কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই সময় গুপ্তবংশীয়গণের বাস হেতু গুপ্তপল্লীর নামকরণ হইয়াছিল কি না, তাহাও বিচার্য্য। প্রাচ্যবিদ্যামহা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "গুপ্তিপাড়ার প্রকৃত নাম গুপ্তপ অর্থাৎ গুপ্ত-উপাধি-ধারী বৈদ্যগণের বাসস্থান।" (৭) শ্রীখণ্ড, সাতচৌকা, এবং সং গ্রাম—প্রাচীনকালে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের এই তিনটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। সপ্তগ্রা বলিতে ত্রিবেণী; গুপ্তিপাড়া,কাঁচড়াপাড়া, বলাগড়,সোমড়া প্রভৃতি স্থান বুঝাইত (৮) মুসলমান আমলেও গুপ্তপল্লী সরকার সাতগাঁয়ের অন্তর্গত ছিল।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়া ছেন, "ত্রিশবিঘা হইতে পূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়া এবং উত্তরে মগরাগঞ্জ ও ত্রিবে হইতে পশ্চিমে মগরা ও দক্ষিণে বাঁশবেড়িয় পর্য্যন্ত যদি একটি চতুরস্র ভূমির কল্পন করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রটিই প্রাচীন সপ্তগ্রামের ধ্বংসাব শেষে পূর্ণ।" (৯) দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ঐতিহাসিক প্লিনি ত্রিবেণীর উল্লে করিয়াছেন। সে সময় বাণিজ্যপোতসমূহ ত্রিবেণী হইতে পাটনা অভিমুখে যাইত। (১০) সরস্বতীবক্ষে রোমক সাম্রাজ্যের অর্ণবপোত সকল বিচরণ করিত বৌদ্ধযুগেও সপ্তগ্রামের শোভাসমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত রাখাল বাবু সপ্তগ্রামে বুদ্ধমূর্ত্তিসংযুক্ত স্তুপাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন। শূরবংশীয়, পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় রাজগণের সমসময়ে যে সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মিনহাজের তবকাত্‌-নাসিরির পুরাতন পুঁথিতে সাতগাঁর উল্লেখ আছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১১) সপ্তগ্রাম সম্বন্ধে একজন লেখক লিখিয়াছেন "Satgong was known to the Romans, by the name of Ganges Regia. It is a famous place of worship, and was formerly the residence of the kings of the country, and said to have been of immense size" (১২) খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে পালবংশের আধিপত্যকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তটে কুলপাল এবং দেশপাল নামে দুই জন বৈদ্য নরপতি রাজত্ব করিতেন। কুলপালের প্রপৌত্র কৃতধ্বজ সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন এবং বৈদ্য-জাতির অধিনায়ক

প্রাচীন সপ্তগ্রাম

(৭) বিশ্বকোষ—'গুপ্তিপাড়া শব্দ। (৮) সম্বন্ধনির্ণয়—২৩১ পৃষ্ঠা—
(৯) সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা—১৫শ ভাগ ১ম সংখ্যা।
(১০) Bengal Past and Present.
(১১) Roverty's Tabquati-Nasiri.
(১২) Asiatic Researches Vol. V. P. 278

ছিলেন। দিগ্বিজয়প্রকাশকার তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। কুলপালপুত্র হরিপাল হরিপাল গ্রামে এবং অহিপাল ত্রিবেণীর সন্নিধানে রাজ্য স্থাপন করেন। মুসলমান-আমলে বঙ্গদেশে চারি সমাজের সৃষ্টি হয়। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয় গুপ্তপল্লীকে ইহাদের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই চারি সমাজের নাম :—সপ্তগ্রাম, নদীয়া, শান্তিপুর ও গুপ্তপল্লী—(১৩) অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই সমাজ-চতুষ্টয়ের অধিপতি হইয়াছিলেন—

চারিসমাজ

"চারি সমাজের পতি কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
ভূমিপতি ভূমিসুর পতি।
তাঁর রাজ্য শ্রেষ্ঠ ধাম, সমাজ-পূজিত গ্রাম
বজরাপুরেতে নিবসতি॥

—জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের বিল্বমঙ্গলের বঙ্গানুবাদ

মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে গুপ্তপল্লীর উল্লেখ দেখিতে পাই। মুকুন্দরাম কৃত্তিবাস ওঝার সমসাময়িক। কৃত্তিবাস শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবুর মতে ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবুর মতে ১৪৪০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন; সুতরাং মুকুন্দরাম পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। মুকুন্দরামের সময় গঙ্গানদী গুপ্তপল্লীর তটদেশ চুম্বন করিয়া বহিয়া যাইত। কবিকঙ্কণ শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহলযাত্রাপ্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

গঙ্গার গতিপরিবর্ত্তন

বাহ বাহ বলিয়া সঘনে দেয় সাড়া।
ডাহিনে শান্তিপুর রহে বামে গুপ্তিপাড়া।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তপল্লী গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, তাহা না হইলে কবি তাহার উল্লেখ করিতেন না। তখন উক্ত স্থান গঙ্গার তীর-ভূমির উপরই অধিষ্ঠিত ছিল। (১৪) ইহার পর হইতে গঙ্গার পশ্চিমতীরে 'চর' পড়িয়া আসিতে থাকে। শত বর্ষ পূর্ব্বেও ভাগীরথী ইহার উপকণ্ঠ দিয়াই বহিয়া যাইতেন; অল্প পূর্ব্বের কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আছে—

(১৩) Joarnal of the Asiatic Society of Bengal Vol. Vi.

(১৪) ইহার কিছু পরে কুলাচার্য্য নুলো পঞ্চানন লিখিতেছেন—

বটগ্রাম বর্দ্ধমানে গঙ্গাত প্রদীপ।
গঙ্গাবাসে গুপ্তপল্লী অম্বিকাসমীপ॥
গোষ্ঠীকথা। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত বচন)

অম্বিকা পশ্চিমপারে শান্তিপুর পূর্ব্বধারে
রাখিয়া দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উজান গতি বটমূলে ভগবতী
চণ্ডিকা নহেন তথা ছাড়া॥

(গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী।)

তিন বৎসর হইল, হাওড়া-কাটোয়া রেললাইন খোলায় গুপ্তপল্লী যাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। গঙ্গা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বলিয়া পূর্ব্বে যাতায়াতের বড় অসুবিধা ছিল; এই জন্যই কৌতুক করিয়া পরিহাসরসিক রূপচাঁদ-পক্ষী গাহিয়াছিলেন,—

"গুপ্তিপাড়া কি বেয়াড়া
গঙ্গা ছাড়া ঠিক দুটি ক্রোশ।

সংস্কৃতচর্চ্চা

অতীতযুগে এই স্থান সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই স্থান সংস্কৃতশাস্ত্র চর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল। (১৫) স্বর্গীয় ভোলানাথ চন্দ্রও ইহাই লিখিয়াছেন, সে সকল কথা পরে আলোচিত হইবে। "বেঙ্গল পাস্‌ট ও প্রেসেন্‌ট" পত্রে এক জন লেখক লিখিয়াছেন যে, এক সময় বঙ্গদেশে গুপ্তপল্লী, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও ত্রিবেণী বিদ্যাচর্চ্চায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

প্রথম বারোয়ারি।
উলা, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া,
কৃষ্ণনগর।

ইংরাজী ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় প্রথম বারোয়ারি উৎসব হয়।* তাহার পর বৎসর শান্তিপুরে মহাড়ম্বরসহকারে বারোয়ারি হইল। কিন্তু গুপ্তিপাড়ার দুষ্টলোকেরা গঙ্গা পার হইয়া শান্তিপুরে যাইয়া বারোয়ারির জন্য গঠিত সুদৃশ্য দেবমূর্ত্তিগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিবর্গের উৎসব বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতে উৎসব বাধা পায় নাই। উভয়পক্ষে লাঠালাঠিও বহুদিন চলিয়াছিল। শান্তিপুরের লোকরা গুপ্তপল্লীর লোকদিগকে—"বাঁদর" বলিয়া ক্ষেপাইত। সে সময় উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর এবং হালিসহরের ভেঁদড় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে এক জন লেখক বলেন, "As Guptipara is noted for

---

(১৫) Hunter's Statistical Account of Hugly.

* The Calcutta Review 1846.

its monkey, * Halisahar for its drunkards, so is Ulla for fools, as one man is said to become a fool every year at the mela" (১৬) তখন লোকের মনে আনন্দ ছিল, অন্নচিন্তা ছাড়া এ সকল ভাবিবার ও আমোদ করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইত। কোনও এক স্থানের সামান্য স্বাতন্ত্র্য দেখিয়া কত সময় ছড়া গাঁথিয়া লোকদিগকে ক্ষেপাইয়া পাগল করিয়া তুলিত। এইরূপ ভাবে আর একটি প্রবাদ লোকমুখে প্রচলিত ছিল—

উলার মেয়ে কুল কুচুটী।
নদের মেয়ের খোঁপা॥
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়।
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

সে সময় এই কয়টি স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ইহাদের গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত হয়, তাঁহার লোপের পর হইতে 'কৃষ্ণচন্দ্রী যুগে'র অবসান হয়, লোকের মনে আনন্দ, স্বাদেশিকতা, বিদ্যাচর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসে। প্রকৃতপক্ষে ইহাই বঙ্গদেশের ও বঙ্গবাসীর শেষ গৌরবের দিন।

শ্রীননীগোপাল মজুমদার।

---

* এক সময় গুপ্তপল্লীগ্রামে বানরের বিশেষ প্রভাব ছিল। কথিত আছে, এখান হইতে বানর ধরিয়া কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিপুল ব্যয়-সহকারে বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে উলা, গুপ্তিপাড়া ও শান্তিপুরের পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ষ্টাভোরিনাস্ (Stavorinus) ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ার বনে এক দল বানর দেখার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এখন আর একটিও বানর দেখিতে পাওয়া যায় না।—On the Banks of the Bhagirathi—The Calcutta Review 1846.

(১৬) The Calcutta Review vol VI, 1846.

কিশোরীচাঁদ মিত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মুক্তি।

সুখ্যাতির সহিত রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, দেশে শিল্প, শিক্ষা এবং সমাজের উন্নতিকল্পে অবিশ্রান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটী, ডিষ্টীক্ট চ্যারিটেবল্ সোসাইটী প্রভৃতি বহু সভার একজন প্রধান সভ্যরূপে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করিয়াই যে কিশোরীচাঁদ নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি এই সময়ে রাজনীতিরও বিলক্ষণ চর্চ্চা করিয়াছিলেন এবং দেশের রাজনীতিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিশোরীচাঁদের বাটীতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা একত্র হইয়া নানা প্রকার দেশহিতকর বিষয়ের আলোচনা করিতেন। মহাত্মা জর্জ টমসনের প্রথম ভারতবর্ষে আগমন এবং এতদ্দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বার এ দেশে আগমন করেন। ইনি কিছু দিন কিশোরীচাঁদের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নব্যবঙ্গকে পুনরায় উত্তেজনাময়ী রাজনৈতিক বক্তৃতায় উত্তেজিত করিয়া তুলেন। এই সময়ে “মফঃস্বলস্থ ফৌজদারী বিচারালয়ে শ্বেতাঙ্গ অপরাধীর বিচার হওয়া উচিত কি না,” এ বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত এই সকল স্বাধীন ব্রিটনবাসীর ফৌজদারী মোকদ্দমা সমূহের বিচার নিষ্পাত্তর ক্ষমতা কেবল সুপ্রীমকোর্টেরই ছিল। সুদূর মফঃস্বলে ইংরাজ প্ল্যাণ্টার এবং দেশীয় প্রজার মোকদ্দমা বাধিলে দরিদ্র প্রজাকে প্রভূত সময় এবং অর্থ নাশ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া নালিশ রুজু করিতে হইত। তখন যাতায়াতেরও এত সুবিধা ছিল না। আইন কমিশনের তদানীন্তন সভাপতি মাননীয় মিঃ পিকক নূতন ফৌজদারী বিধির খসড়া পেশ করিবার সময় এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। শিক্ষিত ভারতবাসীরা এই বিষয়ে যে বিরাট আন্দোলন * উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের দেশে

---

* যাঁহারা এই আন্দোলনের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাঁহাদিগকে ৺ভোলানাথ চন্দ্রের প্রণীত রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবনচরিতের ৮ম পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। পরে, বোধ হয়, ইলবার্ট বিলের আলোচনাকালে এবং গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় মাত্র দেশবাসী এইরূপ উত্তেজিত হইয়াছিলেন। কিশোরীচাঁদের ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এই আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টা—

26th February 1857—Brother gave a dinner party at nine this evening Messers May, Hickford, Bell, Agabeg, George Tompson, Ramgopal, Dr. Chuckerburtty and Hurish. The conversation before dinner turned on the anti-Black Act meeting. I urged on Ramgopaul and others the necessity and importance of getting up a pro Black Act movement. Both Ramgopaul and Tompson agreed with me that an expression of public opinion on the amenability of Europeans to Mofussil Criminal Jurisdiction should be soon elicited The evening passed off very pleasantly.

কিশোরীচাঁদের প্রস্তাবানুসারে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই এপ্রিল তারিখে টাউন-হলে এক বিরাট সভা আহূত হয়। ইহাতে দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মেসার্স জেম্‌স্‌ হিউম, জর্জ্জ টমসন, রেভারেণ্ড জে লঙ প্রভৃতি কয়েক জন অকৃত্রিম ভারত-বন্ধুও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এই সভায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন :—

"এই সভায় সতর্ক বিচারে, ন্যায় এবং বিশুদ্ধ নীতি অনুসারে, তথা দেশের পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ইহা বাঞ্ছনীয় যে, মহারাণীর ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যে মহা-রাণীর সর্ব্বজাতীয় প্রজা ফৌজদারী মোকদ্দমায় যে কোনও দোষের জন্য অভি-যুক্ত হউন না, একই বিধি দ্বারা, একই বিচারকগণ কর্ত্তৃক বিচারিত হইবেন এবং কোনও সম্প্রদায়ের ব্যক্তি, জন্মস্থান, ধর্ম্ম অথবা লৌকিক অবস্থার নিমিত্ত অন্যান্য প্রজাবৃন্দ হইতে বিশেষ সর্ত্ত বা অপ্রকাশ্য সুবিধা দ্বারা রাজবিধির নিকট ভিন্নভাবে দৃষ্ট হইবেন না। অতএব এই সভা আন্তরিক আশা করেন যে, মহা-রাণীর কোনও শ্রেণীর প্রজা মফঃস্বলস্থ বিচারালয়ের অধিকার-বহির্ভূত হইবেন না—এই নীতি ব্যবস্থাপক-সভার আলোচনাধীন ফৌজদারী বিধির মধ্যে সম্পূর্ণ-ভাবে সন্নিবিষ্ট হইবে।"

কিশোরীচাঁদ এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া যে সুদীর্ঘ অথচ অতীব চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন, ভারতবর্ষনিবাসী ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় প্রজাগণের মধ্যে অন্যায় ও অস্বাস্থ্যকর পার্থক্য দূরীকরণার্থ যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন এবং যে অসীম সাহস ও তেজস্বিতার সহিত ন্যায়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়া রাজবিধির

অসঙ্গত নীতি আক্রমণ করেন, তাহা তাঁহার বক্তৃতাটি পাঠ না করিলে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি হইবে না। দুঃখের বিষয়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতার সারাংশ প্রদান করাও সম্ভবপর নহে। 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক কবহারী লিখিয়াছিলেন যে, চারি জন মিত্র "উক্ত সভার দিনটি জয় করিয়াছেন" (Four Mitras have won the day) কিশোরীচাঁদ, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার কার্য্যে বিশেষ ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায় প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে কিশোরীচাঁদের বক্তৃতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ৯ই এপ্রিল তারিখের 'হিন্দুপেট্রিয়ট' লিখিয়াছিলেন "Roy Kissory Chand Mitra particularly distinguished himself in a well-reasoned and very fluent speech utterly free from the vulgar claptraps lately cheered to the echo in the same hall."ভোলানাথ চন্দ্র লিখিয়াছেন,"Babu Kissory Chand Mitra certainly made the greatest forensic display by an elaborate and eloquent speech.

এই সভার কার্য্যবিবরণী ইংরাজী সংবাদপত্রসমূহে অতি তীব্রভাবে সমালোচিত হইয়াছিল। কিন্তু কিশোরীচাঁদ জানিতেন যে, ইহাতে সুফল ফলিবে। ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। তিনি ডায়েরীতে লিখিয়াছেন :—

The meeting was very largely and respectably attended and went off very well, though I am not quite sure that the press which is against us will not misrepresent the whole affair But in spite of the misrepresentation of the press the demonstration will, I have no doubt, tell in England powerfully in our cause.

ঘটিলও তাহাই। সিপাহী-বিদ্রোহের গোলমালে এই সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত আবেদন ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হয় নাই; কিন্তু কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্ তাহাদিগের এক পত্রে উহার বিষয় উল্লেখ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর তারিখে উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য আংশিকভাবে সফল হইয়াছিল। নূতন আইনে বিধিবদ্ধ হইল যে, মফঃস্বলস্থ বিচারালয় সমূহে এতদ্দেশীয় ব্রিটনবাসীদিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে পারিবে। তবে ইচ্ছা করিলে, ব্রিটিশগণ বলিতে পারিবেন যে, "কালা আদমীর নিকট আমাদিগের বিচার-নিষ্পত্তি হইবে না"।

বলা বাহুল্য, কিশোরীচাঁদ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ও অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বার্থের জন্য ন্যায় ও সত্যানুমোদিত দেশহিতকর কর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিবার

লোক ছিলেন না। এই সময়েই তিনি আরও একটি কার্য্যের দ্বারা বহু ক্ষমতা-শালী ইংরাজগণের (গবর্ণমেণ্টের নহে) অপ্রিয় হইয়াছিলেন। তাহার বিষয় পরে বলিতেছি।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজগণ ভারতবাসীর উপর নিতান্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠেন। চতুর্দ্দিকে কেবল "প্রতিহিংসা" "প্রতিহিংসা" রব উত্থিত হইল। কয়েক জন নির্ম্মম ও মূর্খ সিপাহী কর্তৃক অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য শান্তিপ্রিয় ঈশার শিষ্যগণ নির্দ্দোষ লক্ষ লক্ষ প্রজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সদাশয় লর্ড ক্যানিং দৃঢ়তার সহিত প্রতিবিধিৎসাপরায়ণ ইংরাজগণের মন্ত্রণা পরিত্যাগ করিয়া করুণার উৎস উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সকল ইংরাজগণ মহাত্মা ক্যানিংএর মহৎ ভাব উপলব্ধি করা দূরে থাকুক,তাঁহার প্রতি নিতান্ত নীচজনোচিত বিদ্রূপবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন এবং কার্য্যে ও বাক্যে এই অসভ্যজনোচিত প্রতিবিধিৎসার সমর্থন করিতে লাগিলেন। এই সময় কেবলমাত্র কতিপয় শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের যথার্থ অবস্থাবর্ণন ও লর্ড ক্যানিংএর সমীচীন নীতি সমর্থন করিয়া রাজ্যশাসনে ক্যানিংকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে 'হিন্দুপেট্রিয়টের তৎকালীন সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ 'হিন্দুপেট্রিয়টে'র জন্মদাতা ও উহার প্রথম সম্পাদক,সুপণ্ডিত ও সুলেখক গিরিশ-চন্দ্র ঘোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত মহাত্মা অসামান্য নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত 'হিন্দুপেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় মন্তব্যে তাঁহার অভ্যস্ত জলন্ত ও শ্লেষবর্ষী ভাষায় "জাতিবৈরিতা ও জাতিবিদ্বেষ" বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করেন সে সকল সম্বন্ধে মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দুপেট্রিয়টে' উক্ত মহাত্মার মৃত্যু-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন। সেগুলি provoked vengeance of those mighty sons of Mars upon the devoted head of the Editor."দেশপ্রাণ কিশোরীচাঁদও এই সময় তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃদ্ হরিশ্চন্দ্রের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে "The Mutiny, the Government and the people" By a Hindu নামক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া তিনি অকাট্য যুক্তি-দ্বারা প্রমাণ করেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ সৈন্যসংক্রান্ত বিপ্লবমাত্র, ইহাতে সমগ্র দেশের জনসাধারণের কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। দেশবাসী রাজভক্তই আছেন। কয়েকজন মূঢ় সিপাহীর জন্য নির্দ্দোষ দেশবাসীর উপর প্রতিহিংসাগ্রহণ নিতান্ত অসঙ্গত। ক্যানিংএর গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সাধারণ ইংরাজগণ কর্তৃক দুইটি অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল। যথা—

(১) বিদ্রোহিগণের সহিত অত্যন্ত ক্ষমাশীল ব্যবহার।

(২) গবর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতার, এবং বিদ্রোহের প্রকৃতি ও আকৃতি সম্বন্ধে বিচারক্ষমতার অভাব অথবা বিদ্রোহদমনে অবহেলা বা শিথিলতা।

কিশোরীচাঁদ তাঁহার প্রবন্ধে যুক্তি দ্বারা এই অভিমতগুলির খণ্ডন করিয়া গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের সমর্থন করেন। শুনিয়াছি, মহামতি লর্ড ক্যানিং বাহাদুর এই পুস্তক পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি হয়েন এবং গ্রন্থকারকে একখানি প্রশংসা-পূর্ণ পত্র লিখেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রখানি আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হিন্দু পেট্রিয়ট' উক্ত পুস্তিকার সুদীর্ঘ প্রশংসা-পূর্ণ সমালোচনার উপসংহারে বলেন যে, সিপাহীবিদ্রোহ-সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে ইহা যে একটি অতিশয় চিন্তাশীল ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই পুস্তক প্রকাশের পূর্ব্বেই কিশোরীচাঁদ এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ক্যানিং বাহাদুরকে সিপাহীবিদ্রোহে ন্যায়সঙ্গত এবং বিচক্ষণ নীতি অবলম্বনের জন্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। আমরা এই সভার কার্য্যবিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে তাঁহার ডায়েরীতে লিখিত আছে—

"Presented this morning a petition to Lord Canning expressive of the confidence of the native community in their administration of Lord Canning, the administration of justice and wisdom of his measures for the suppression of the rebellion and their grave diapprobation of the indecent attacks of certain European merchants and lawyers his government. I have been at it for the last two months and met with the strongest opposition from Prosonas Coomar Tagore and his party It is cheering to know that our address is highly approved all my European friends [December, 1857

ইহা ব্যতীত প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি এই সকল মত প্রচার করিতেন। এই বৎসর শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর স্কুলের পারিতোষিক বিতরণকালে সভাপতিরূপে কিশোরীচাঁদ একটি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং সাধারণ ইংরাজগণের বিদ্রোহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশে শিক্ষাবিস্তারকার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। * কিশোরীচাঁদ বলেন, শিক্ষার অভাবই এই বিদ্রোহের কারণ এবং সর্ব্বত্র শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত।

* The Mutiny and the atrocities committed at Delhi and Meerut by the sepoy have aliated Europens from the Natives there is a feeling of universal mistrust of the natives. But people seriously talk of the abolition of the Colleges schools and severing the policy of elevting natiaes to high and Important public situations [Diary June 21, 1857.

এই সময়ের সকল রাজনীতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়া কিশোরীচাঁদ কেবল কয়েকজন ইংরেজের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন, তাহাই নহে; ঈর্ষ্যা প্রণোদিত কতিপয় ভারতীয় কর্ম্মচারীও তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার এই সকল শত্রুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান তদানীন্তন পুলিস-কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ (Mr. Waccope,) কয়েকবার তাঁহার নামে গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট করেন। কিন্তু এই রিপোর্টের কোনও ফল হয় নাই। পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট তখন বিচার-বিভাগের প্রধান ছিলেন, পুলিশ-কমিশনরের মতে না চলিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন। কিশোরীচাঁদের সহযোগী দক্ষিণবিভাগের পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেঃ হিউম কিশোরীচাঁদের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এবং উভয়েই ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারকালে অপক্ষপাতিত্বপ্রদর্শন দ্বারা সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপে কার্য্য করিতে হইলে সময় সময় পুলিসের দোষ প্রদর্শন করিতেও হয়। সুতরাং পুলিস-কমিশনার উভয়েরই উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রে প্রায়ই এই দুই জন লোকরঞ্জক ম্যাজিষ্ট্রেটকে আক্রমণ করিয়া পত্রাদি লিখিত হইত। কিন্তু ওয়াকোপের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না। হিউম এবং কিশোরীচাঁদ কেহই স্থানান্তরিত হইলেন না।

বাস্তবিক কিশোরীচাঁদ অতিশয় সুখ্যাতির সহিত তাঁহার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি দেশবাসীর মধ্যে প্রথম জাষ্টিস্ অব্ দি পিসের (Justice of the Peace) ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বিচারকালে অপক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়া জাতীয় পার্থক্য দূরীকরণে চেষ্টা করেন। ইংরেজ ফরিয়াদী ও দেশীয় আসামী হইলেই যে আসামীকে কঠিন শাস্তি প্রদান করিতে হইবে এবং বিপরিত অবস্থায় ইংরাজ আসামীকে নিষ্কৃতি দিতে হইবে, সাম্যবাদী কিশোরীচাঁদ এই দুর্নীতিতেই সমর্থন করিতেন না। কিন্তু এরূপ কার্য্য করা ব্রিটিশজাতির অপমান এবং "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ" করার সহিত একার্থবাচক সিপাহীবিদ্রোহের পর বিকৃত মস্তিষ্ক অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছিল!

কমিশনার মিঃ ওয়াকোপ বহু চেষ্টার পর অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার শেষ রিপোর্টের ফলে গবর্ণমেণ্ট কিশোরীচাঁদের নিকট হইতে কৈফিয়ত তলব করিলেন। কিন্তু মিঃ ওয়াকোপ কি অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং কেন কিশোরীচাঁদের কৈফিয়ত তলব হইয়াছিল, তাহা জানিতে হইলে দুইটি মোকদ্দমার বিবরণ জানা আবশ্যক। ম্যাজিষ্ট্রেটের কেস্ বুকে এই দুইটি মোকদ্দমার বিষয় যাহা লিখিত ছিল, তাহা নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল। একটি মোকদ্দমায় ইংরাজ ফরিয়াদী এবং একটি মুসলমান বালক চৌর্য্য অপরাধে অভি-

যুক্ত হয়। বালকটি অব্যাহতি লাভ করে। অপরটিতে একটি পুলিস চৌকী-দারের সাক্ষ্যে কিশোরীচাঁদ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং অর্দ্ধ আনা মূল্যের কাষ্ঠ খণ্ড চুরীর একটি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

841. Wm, J.L. Milligan
Lieut. H.M. 73rd Regt
Versus
1. Abdool Raheem
&
2. Ram Charn
in custody
Winesses
1. Dhurraj
2. Jummabux
3. Chotookhan
4. Inspr. Richard York.
5. Baboo Gowallah.

12th June 1858,
Saturday

Inspector Richard York—Prosecutor charge 1st prisoner with stealing on the 10th instant, one Bank of Bengal note no 32028 for Co's Rs 25 and Rs 25 in silver his property and money, and 2nd prisoner with afterwards receiving Rs 20 being part of the above money so as aforesaid stolen, with a guilty knowledge, Received the Bank Note, Rs 21 in silver and 17 annas and ½ in Copper 12th June 1858.

William J. L. Milligan on oath says—I am an officer attached to H. M. 73rd Regiment and live at the Fort. I know the prisoners now here present On Wednesday last I gave a Bank of Bengal note No 32028 for Rs 25 and Rs 25 in cash to Abdool to keep. On that day I found the first prisoner running down in an excited state of mind. My suspicions being aroused I sent my bearer to stop him. I then followed him myself and found, in the kitchen this handkerchief and a Rupee tied therein. *I asked him for my money. He said he had spent the silver. He said this without a moment's hesitation. I then made himt over to the Police.*

Richard Work on oath says—I am Inspector of Police Yesterday I received the charge. It was one of stealing. It was preferred by William J. L. Milligan. The first prisoner was made over to me by the Prosecutor. I explained the charge to him. He at first denied the theft; but subsequently confessed to having taken the money (deposited with him) and gambled it away He said he had played with Ram Charn and had lost a portion of the money, He took me to Ram Charan the second prisoner now here present. I asked Ram Charan if he had recived any money from Abdul Raheem, He said—"Yes—I have won from Abdool some money." He produced 20 Rs. Abdool then took me to a place where he said he had kept the Bank note. He produced the note himself.

Abdool Raheem says—I am in the employ of the prosecutor, He gave me the money to keep and I arpropriated it. I am sorry for what I have done, *I am very young and did not know what I was about.*

Ram Charan says—I admit gambling with Abdool and winning 20 Rs but I did not receive the money with guilty knowledge. *Warned* and acquitted.

(Sd.) K. C. Mitra
J. Peace.

852. Sumbhoonath Dhur
Hindoo
Shaik Dodarbux
[in Custody]
Witnesses
1. Chundernath Dhur
2. Shaik Khodabux

14th June
Monday

Inspector William Ferres—Prosecutor charged prisoner with stealing last night 8 pieces of firewood worth ½ anna, his property.

Recovered 14th June 1858.

Sumboo Nath Dhar on solerum affirmation says—I keep a moodee shop and live at Misreegunge in Calcutta. Last night at 11 o'clock while I was seated at the door of my shop, one Chandernath Dhur called my attention to something in my shop. I went in and saw the prisoner and recovered the property from his house,

Shaik Khodabux on solemn affirmation says—I am a Constable of Police, Last night I recived the charge. I arrested the prisoner at his house, He was seated on these pieces of firewood,

The prisoner says—I deny the charge, I am a Mahomedan and Prosecutor is a Hindu, He often quarrels with me whenever I cook any food which is forbiden by his religion. Our cook-rooms are adjoining each other

Lallmohan, on solemn affirmation says—I am a shop-keeper. I know prosecutor and defendent. They are at loggerheads. Prosecutor often quarrels with defendant for cooking beef. Their cook-rooms are adjoining, *Prosecutor in fact once threatened to drive him out of his homestead.*

Case dismissed defendant, discharged and complainant ordered to pay Rs 10 amends to defendant.

[Sd] K, C. Mittra
J. Peace

সংগ্রহ।

নেপালের কথা।

সম্প্রতি বিলাতে শিল্পসভার অধিবেশনে লেডি জন এলওয়েস্ নেপাল-ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে—নিম্নে তাহার সার সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

"নেপালের মহারাজ চন্দ্রসমসেরজঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা গোরক্ষপুরে পৌছিলাম। কাঠমণ্ডুর রাজকীয় প্রতিনিধি ম্যানার্স স্মিথ মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাদিগকে নেপালসীমান্তস্থিত ভিথলা থোরী নামক স্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তথায় শীঘ্রই হস্তী ধরা হইবে, এইরূপ শুনিলাম। সম্রাট পঞ্চম-জর্জ্জ ভারতে আসিয়া নেপালের অন্তর্গত এই সকল বনপ্রদেশে ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন। নেপাল তরাই পর্য্যন্ত অনেক রেলপথে গমন করিলাম। তথা হইতে অশ্বে আরোহণ করিয়া বস্ত্রাবাসে চলিলাম। দিগন্ত বিস্তৃত সমতলক্ষেত্র তাহার স্থানে স্থানে জঙ্গলময় ভূমি এবং চতুর্দ্দিকে নীলশৈলশ্রেণী—এইস্থানে আমাদের পট্টবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমরা যখন তথায় গিয়াছিলাম, তখন সেস্থান অতিশয় সুন্দর—শীতল ও স্বাস্থ্যপ্রদ। আমরা যেদিন পট্টাবাসে উপস্থিত হইলাম তাহার পরদিন আমরা অশ্বারোহণে একটি পার্ব্বত্যনদীর তীরে নির্ম্মিত বৃহত্তর পট্টাবাসে গিয়া আশ্রয় লইলাম। তথায় পূর্ব্ব হইতেই হস্তী ধরিবার ব্যবস্থা করা হইতেছিল। দেখিলাম প্রায় দুইক্রোশ পরিধিবিশিষ্ট একটি বনের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক বন্য হস্তী ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে উচ্চ গিরিশ্রেণী এবং পশ্চিমে একটি অর্দ্ধবিশুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত গিরিসরিৎ। হস্তিযূথ পরিবেষ্টনের জন্য দুইদল নেপালী সৈন্য নিযুক্ত ছিল। প্রায় ত্রিশটি হস্তী পরিবেষ্টিত হইবামাত্র পনের কুড়ি গজ অন্তর বনের চতুর্দ্দিকে সৈন্য দাঁড়াইয়া গেল। প্রত্যেক স্থানে তিনজন করিয়া সৈন্য পাহারা দিতে লাগিল। তাহারা শুষ্কতৃণ দিয়া এক একটি কুটির নির্ম্মিত করিল এবং যাহাতে বন্যহস্তী-

মৃগ ছুটিয়া পলায়ন করিতে না পারে, তজ্জন্য সমস্ত রাত্রি অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া রাখিল। প্রহরিগণের শ্রেণীর পশ্চাতে একটি নদীর কূলে আমাদের বস্ত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল। হস্তীগুলিকে একটি চতুর্বেষ্টিত স্থানের মধ্যে চালিত করিতে হইবে—কোথায় এই স্থান নির্ব্বাচিত হইবে, এই বিষয়ে ঢাকা হইতে আগত একজন বিশেষজ্ঞ জমাদার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। এই লোকটির বয়স প্রায় সপ্ততিবৎসর হইবে, তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল এই কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানে তিন দিবসের মধ্যে হস্তী রক্ষিত হইবার স্থান প্রস্তুত হইল। ইহার চতুর্দ্দিকে পনের ফিট দীর্ঘ এবং দশ ইঞ্চ কাষ্ঠখণ্ডসকল প্রোথিত করা হইল। এই স্থানটি প্রায় পনের গজ প্রস্থে এবং দৈর্ঘ্যে বিশগজ পরিমিত। ইহার একদিকে একটি দ্বার প্রস্তুত হইল। এমন কৌশলে ইহা প্রস্তুত হইল যে, রজ্জু কাটিয়া দিলেই আবশ্যকমত দ্বারটি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং হস্তিগণ পুনঃ প্রত্যাগমনের পথ পাইবে না। কাষ্ঠের বেড়া লতা, বৃক্ষশাখা তৃণ প্রভৃতি দ্বারা আবৃত করিয়া দেওয়া হইল। এরূপ উপায় অবলম্বনের কারণ, ইহাতে হস্তি কোনও বিপদের আশঙ্কা করিতে পারিবে না। রাত্রিতে প্রায়ই তাহাদের গর্জ্জন শুনা যাইত, তাহারা নদী হইতে জল পান করিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে প্রহরীদিগের অভিমুখে ছুটিয়া আসিত—তখন সকলে ভীত হইয়া উঠিত। দ্বিতীয় দিবস রাত্রিতে একটা বিপুলাকার দন্তবিশিষ্ট-হস্তী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। সেস্থানে যেসকল লোক ছিল তাহারা দলবদ্ধ হইয়া ছুটন্ত গজের প্রতি ফাঁকা আওয়াজ করিতে লাগিল, বন্দুকের শব্দে হস্তীটি ভীত হইয়া প্রস্থান করিলে বনভূমি পুনরায় শান্তভাব ধারণ করিল।

১৪ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে হস্তী ধরা হইবে, ঘোষণা করা হইল। হস্তিগণের অবরোধের উপরিভাগে দুইটি চত্বর রচনা করা হইয়াছিল। আমরা দেখিবার জন্য ইহার উপরে উঠিলাম। পুলিস-বিভাগের মিষ্টার আর্ম্মষ্ট্রাঙ্গ এবং জমাদার নেতা হইলেন। হস্তিসমূহকে তাড়াইবার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেল, এখন কার্য্য আরম্ভ হইতে যে বিলম্ব। যাহাতে কোনও প্রকার শব্দ না হয়, তাহার আদেশ দেওয়া হইল এবং সকলে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল। কিয়ৎ দূর বনমধ্যে চলিবার পর একটা ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রহরিগণের চীৎকার উত্থিত হইল। ইহা হইতে বুঝা গেল, হস্তিগণ অগ্রসর হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের গর্জ্জন ৭৯.

নিকটে শুনা গেল যে, মনে হইল যেন তাহারা অবরোধের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শব্দ আর শুনা গেল না। ইহার পরেই আর্ম্মষ্ট্রঙ্গ দ্রুতবেগে অবরোধের নিকটে আসিলেন। তাঁহার নিকটে শুনা গেল, নেপালীরা এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না। তাহাদের সম্মিলিত শব্দে ভয় পাইয়া হস্তিগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ৫টার সময় হস্তীগুলি অবরোধের মধ্যে প্রবেশ করিল। আর্ম্মষ্ট্রঙ্গের আদেশে তাহাদের পশ্চাতে শুষ্কতৃণে অগ্নিযোগ করা হইল। ইহাতে ভয় পাইয়া তাহারা একযোগে দ্রুতবেগে অবরোধের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, হস্তিযূথ নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে—জনসমূহের আনন্দের আর সীমা নাই। নেপালীরা হস্তী ধৃত করিতে বিশেষ দক্ষ,—সে দিনের ব্যাপারে তাহাদের দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাইলাম।

দশদিন পরে আমরা রক্সল নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। ইহাও নেপালের সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত। এখানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির একটি সুন্দর বাংলো আছে। তথায় তিনি আমাদের জন্য কাঠমণ্ড যাইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রথম ত্রিশ মাইল আমরা ডুলিতে আরোহণ করিয়া অতিবাহিত করিলাম। প্রাতঃকালে আমাদের ডুলি আসিয়া একটি শালবনের নিকট পৌছিল। এইস্থান হইতে চড়াইয়ের আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এইস্থানে আহার সমাপ্ত করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলাম, কিয়ৎ দূর যাইবার পর আমাদের পথ একটি পার্ব্বত্য নদীর পার্শ্ব দিয়া চলিল। মধ্যে একস্থানে আমার জন্য একদল লোক ডুলি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া ডুলিতে আরোহণ করিলাম। এইবার আমাদিগকে দুই সহস্র ফিট উপরে উঠিতে হইবে। উপরে আমাদের জন্য শিশাগি নামক স্থানে আহারাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। তথায় রাত্রিযাপন-করিয়া পরদিন প্রভাতে পুনরায় চলিতে লাগিলাম। পাহাড়ের নীচে আমাদের জন্য ঘোড়া আসিয়াছিল। অশ্বে আরোহণ করিয়া, আমরা গোধূমক্ষেত্রের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম। পথে একদল তীর্থযাত্রীর সহিত দেখা হইল, তাহারা ভারতবর্ষ হইতে কাঠমণ্ডুতে তীর্থদর্শনে যাইতেছে। আমরা আর এক বনাচ্ছাদিত পাহাড় বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। এ স্থানে কাঠমণ্ডুর পুরোবর্ত্তী উপত্যকার মহিমময়দৃশ্যপট আমাদের নয়নসমক্ষে সহসা খুলিয়া গেল—সে দৃশ্য অতি সুন্দর, প্রকৃতি যেন এই স্থানটাকে সযত্নে রচনা করিয়াছেন। পর্ব্বতের পাদদেশে আমরা

একটি সুন্দর রাজপথের উপর আসিয়া পড়িলাম। এখানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি স্মিথ মহোদয় আমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন।” শ্রীযুক্ত এলওয়েন নেপালরাজ্য দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন, তিনি নেপাল-বাসিগণের শান্ত প্রীতিপ্রফুল্ল আকৃতি দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি নেপালগবর্ণমেণ্টের রাজ্যতন্ত্র শিক্ষাস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। নেপালের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মৈত্রভাব সংস্থাপিত হওয়ায় যে ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছে, তাহা লেখক স্বীকার করেন।

নেপাল তরাইয়ে মহিষ পাওয়া যায়, তাহাদের দুগ্ধ বিশেষ বলকারক। নেপালবাসীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই খুব কষ্টসহিষ্ণু, তাহারা গুরুভার দ্রব্য-বহনে বিশেষ সমর্থ। লেখক নেপালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

নেপালমহারাজের প্রাসাদ একটি দ্রষ্টব্য স্থান। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। প্রাসাদের দেওয়াল একপ্রকার কারুকার্য্যবহুল কাষ্ঠে নির্ম্মিত। লেখক নেপালের হর্ম্ম্যাদির এবং তত্রত্য প্রাচীন স্থাপত্য সমূহের একটি বিবরণ দিয়াছেন।

কাঠমণ্ড এবং ভাটার্গা এই দুইটি স্থান স্থাপত্য-শিল্পের জন্য বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, এরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। ফার্গুসন বলেন, সমগ্র ভারতের স্থাপত্য শিল্পের সারভূত সৌন্দর্য্য এই ক্ষুদ্র নেপালকে আশ্রয় করিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম এক সঙ্গে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, নেপালে সে সময়ও স্থাপত্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল। নেওয়ার জাতির উন্নতির যুগ নেপালের স্থাপত্যে-তিহাসের গৌরবময় যুগ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। নেওয়ার জাতির ধর্ম্ম-ভাব তাহাদের স্থাপত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গুর্খাজাতি কর্ত্তৃক নেওয়ারগণ পরাজিত হয়, তাহাদের শান্তিপূর্ণ শিল্পজীবনের গতি হ্রাস হইয়া আসে। তাহাদের স্থাপত্যের অধঃপতনের এই সময় হইতেই সূচনা হয়। নেওয়ারজাতির কাষ্ঠের উপর যে শিল্পচাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছে, তাহা অতুলনীয়, যদি তাহার নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ চেষ্টা না অবলম্বন করা হয়, তবে সে সকল চিহ্ন অচিরকাল মধ্যে লয় প্রাপ্ত হইবে।

বাঁশী।

[পেড্রো আণ্টনিও ডি আলারকন স্পেনের অন্তর্গত গ্রানাদা প্রদেশে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, তিনি ধর্ম্মযাজনায় মনোনিবেশ করেন, পরে সাহিত্যিকরূপে জীবনাতিপাত করিতে থাকেন। স্পেনে রাজ-বিদ্রোহকালে তিনি সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করেন। কিয়দ্দিবস পরে, আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, তিনি তথায় গমন করিয়া যুদ্ধের বৃত্তান্ত স্বয়ং দেখিয়া লিপিবদ্ধ করেন। আলারকন স্বদেশে ছোট গল্পের জন্য যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করেন এবং তাঁহার অনেকগুলি গল্প ইংরাজী ও ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছে। এই গল্পটি তাঁহার শেষ গল্প। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে তিনি দেহত্যাগ করেন]

"অ দাদামহাশয়! এই বাঁশীটি কিনেছি—একটু বাজান না!, "অ ঠাকুর দাদা! বাঁশীটি একবার বাজান, আমরা তালে তালে নেচে লই।"

একদল ক্রীড়ারত বালক-বালিকা তাহাদের ঠাকুরদাদাকে ঘিরিয়া অল্প-ক্রীত একটী বাঁশী বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল। কিন্তু ঠাকুরদাদা ছেলেদের সকল আব্দার রক্ষা করিতে সকল সময়ে প্রস্তুত হইলেও, এক্ষেত্রে কিছুতেই রাজী হইতে ছিলেন না। অনুরোধ, উপরোধ, কান্নাকাটি কিছুতেই বৃদ্ধ সম্মত হইতে ছিলেন না। বৃদ্ধের এরূপ ব্যবহার তাঁহার পৌত্র-পৌত্রীগুলি ক্ষুণ্ণ হইতেছিল এবং এই সামান্য অনুরোধ কি কেন রক্ষা করিতেছেন না, কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

"দাদা মশায়! বাঁশীটা একবারটি বাজাও না।"

"না। দিদিমণি! আমি বাঁশী একবারও বাজাব না।"

"কেন! তুমি কি বাজাতে জান না!"

"না! দাদামণি! আমি বাঁশী বাজাতে জানি না।"

"হাঃ দাদা মশায়! বুড়োবয়সে তুমি মিথ্যাকথা বলছ! তুমি না সিপাহিদের বাজনদারের দলের কর্ত্তা ছিলে! তুমি কেমন করে কর্ত্তালী কর্‌তে!"

"সত্যই ভাই। আমি কর্ত্তাই ছিলাম, সে দলে আমি বাঁশীই বাজাতাম।

আমার বাজনায় সকলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেত। কিন্তু এও সত্যি যে বারো বৎসর পূর্ব্বে একজনকে বাঁশীটা দিয়ে দিয়েছি! তার পরে আর আমি বাঁশী ছুঁই নাই। বাঁশী বাজান দূরে থাকুক, আমি আর বাঁশী ছোঁব না। লক্ষ্মীরা আমাকে বাঁশী বাজাতে বলো না! আর যা বল্‌বে সব আমি করব।" "আচ্ছা! কেন তুমি বাঁশী বাজাবে না; বাঁশী ছোবে না পর্য্যন্ত, কি হয়েছে, আমাদের একবার তাই বল না।"

"সে অনেক দিনের কথা! আমি বার বৎসর আগে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আর বাঁশী বাজাব না, বাঁশী ছোঁব না! যাঁদের জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তারা আর আজ নাই! আর কি কষ্টে যে আমি বাঁশী বাজান শিখেছিলাম, আর কি গম্ভীর কষ্টে আমি বাঁশী বাজান ছেড়েছি, তা শুনলে তোমরাও আর আমাকে বাঁশী বাজাতে অনুরোধ কর্ব্বে না। তাই তোমাদের কথা রাখিতে পাচ্ছি না। এতে তোমাদের কষ্ট হচ্ছে। আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু, সে কথায় যে কত গভীর কষ্ট হয়, তা তোমরা মনেও কর্ত্তে পার না!

"আচ্ছা দাদা মহাশয়! তোমাকে বাঁশী বাজাতে হবে না! তুমি সেই গল্পটাই বল।"

"বেশ! তোমরাও লক্ষ্মীর মত সকলে শুন।"—

সে আজ অনেক দিনের কথা—বার বৎসরেরও বেশী। তখন আমাদের দেশে সেই সর্ব্বনেশী অন্তর্বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। আমিও আমার একজন পরম বন্ধু একই দলে যুদ্ধ করিতেছিলাম। সে কি যুদ্ধ! এক সঙ্গেই আমরা কালেজে ছিলাম! এক সঙ্গে পাশ করিয়া এবং এক সঙ্গেই পাশাপাশি দুইজনে যুদ্ধ করিতাম—উভয়েই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতাম।

কিন্তু, একদিন হঠাৎ তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তাঁকে বিনা দোষে সকল সৈন্যের সম্মুখে ভয়ানক অপমানিত করিল। শুধু বিনা দোষে নহে—সেই কর্ম্মচারীরই দোষ সবটুকু—তাঁ'র কোন দোষ ছিল না। এ অপমান তাহার বুকে শেলসম লাগিল। সে আমাদের দল পরিত্যাগ করিল। অযথা অপমানিত—তাও আবার সকল সৈন্যদের সম্মুখে—তাই সে প্রতিজ্ঞা করিল যে, সেই কর্ম্মচারীকে প্রতিশোধ দিতে হইবে। কিন্তু তাঁ'র বীরের অন্তঃকরণ, গুপ্ত-হত্যা সে আদৌ পসন্দ করিত না—তাই সে স্থির করিল যে, সে অপর দলে যোগদান করিয়া যুদ্ধে সেই কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবে, নিবারণের জন্য আমার সহস্র চেষ্টা বিফল হইল।

রাত্রির অন্ধকারে সে বিপক্ষ দলে যোগ দিলে। শিবির-পরিত্যাগের আগে তাহাতে আর আমাতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

"কাল যদি যুদ্ধ হয়, যুদ্ধ হওয়া খুব সম্ভব, তা হলে আমাদের অবশ্যই যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হইবে।"

"তা হোক। তোমাতে আমাতে বন্ধুত্বের যে বন্ধন, তা অভেদ্য, মরণেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবে না।"

ভাল উত্তম। দেখা হ'লে আমরা একে অপরকে নমস্কার করিব। এই স্থির থাকিল। দেখ, কাল আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কারণ, কর্ম্মচারীকে হত্যা না করিয়া আমি কিছুতেই যুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তোমাকে একটা উপদেশ দেই! অত্যন্ত অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় যুদ্ধ করিও না। মনে রাখিও যশ ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

আমিও উত্তর দিলাম,—"জীবনও ত তাহাই।"

"সত্য। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি সেনাপতি হও।"

"ধন্যবাদ। আচ্ছা। যদি দুজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করি।"

"তবে আমাদের একস্থানেই একত্র হইতে হইবে? বেশ।

"কাল রাত্রি একটার সময় গির্জ্জায় একত্র হইব। একজন অনুপস্থিত হইলে অপর জন যেন মনে করে যে, সে এ পৃথিবীতে নাই। এখন বিদায়!"

আমরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলাম। তাহার পর রাত্রির অন্ধকারে সে শিবির পরিত্যাগ করিল।

পর দিন প্রাতেই বিপক্ষের সহিত ঘোর যুদ্ধ ঘটিল। সে তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। কর্ম্মচারীকে সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছিল। যুদ্ধে বিপক্ষের জয়লাভ এবং আমাদের পরাজয় ঘটে। আমি ও আমার সঙ্গীরা বন্দী হইয়া বিপক্ষের কারাগারে স্থান পাইলাম।

আমি একজন কারারক্ষীকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রহরী উত্তর করিল যে, "যুদ্ধজয়ের পরে আর তাহার দেখা পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ সে বীরেরই ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

আমার অবস্থা তোমরা অনুমান করিতে পার। একে যুদ্ধে পরাজয়, তাহাতে বন্দী, আবার প্রাণাধিক বন্ধুর নিহত হইবার সম্ভাবনায় দুশ্চিন্তা। একটি ক্ষীণ আশার জ্যোতিঃ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয়ে দেখা দিতেছিল। সে হয় ত গির্জ্জায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে এবং হয় ত সেই জন্যই সে শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে পারে নাই। যদি তাহাই হয়, তবে সে মনে করিতেছে যে, আমি আর নাই। তাহার সঙ্গে আমার আর দেখা হইবে কি না কে জানে? শত্রুরা ত

কালই আমাদিগকে হত্যা করিবে। ততক্ষণ কি সে ফিরিবে? আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে?

রাত্রিতে আমার নয়নে এতটুকু ঘুমও আসিল না। অতি প্রত্যুষে একজন পাদরী আমাদের কক্ষে আসিলেন। তাঁহার চক্ষু দেখিয়া আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, তিন ঘণ্টা পরে একজন ব্যতীত আমাদের সকলকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে। যে একজনকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে, সে বাদ্যকর ছিল—এদিকে বিপক্ষসৈন্যের বাদ্যকরের অভাব, তাই তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে। তদ্ব্যতীত আর সকলকেই হত্যা করা হইবে।

"ঠাক্‌রদা! তবে তুমিও বাজাতে জান্‌তে! নতুবা তুমি অব্যাহতি পাইলে কেমন করিয়া?"

"না! লক্ষ্মী! আমি বাজনার টুঁও জানিতাম না।"

বিপক্ষপক্ষের একটী চতুষ্কোণ সৈন্যদলের মধ্যে আমাদের উনিশজন বন্দীকে স্থাপিত করা হইল—আমি আর আঠার জন। অর্থাৎ একজনবাদে—সেই বাদ্যকর বাদে—আর সকলকেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। একজন একজন করিয়া সকলকেই নিহত করা হইবে। নয়জনের পরে আমার পালা। আমাদের সকলেরই চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বন্দুক ছুঁড়িবার শব্দ শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু কয়েকবার শুনিয়াই সব গোল হইয়া গেল। এইবার! এইবারই! আমার শেষ! না! এবারও নহে! তবে এইবার ঠিক! পরক্ষণেই কে একজন যেন আমাকে জড়াইয়া ধরিল! আমার কর্ণে কি একটা শব্দ প্রবেশ করিল। আমি মনে করিলাম, আমার গায়ে গুলি লাগিয়াছে। আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, আমি কারাগারে শয্যাশায়ী। কে যেন অতি সন্তর্পণে আমার শুশ্রূষা করিতেছে। আমি মনে করিলাম, আমি প্রেতভূমিতে আসিয়াছি। কিন্তু আমার পার্শ্বে কে? একজনের নাম মুখে আসিল। পার্শ্বস্থ ব্যক্তি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাহ।" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ কে?—সেই! সে-ও কি তবে প্রেতভূমিতে! জীবনে মরণে আমরা কি একই পথের পথিক?

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কোথায়?" সে উত্তর করিল, "তুমি বন্দী।" আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি প্রেতভূমিতে—না—আমি স্বপ্ন দেখিতেছি।" সে উত্তর করিল, "তুমি প্রেতভূমিতেও নও, স্বপ্নও দেখিতেছ না।"

তাহার পর সে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ম্মচারীকে হত্যা

করিয়াও আমার মনের সাধ মিটিল না। আমি ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে ও হত্যা করিতে লাগিলাম। যুদ্ধ শেষ হইল; কিন্তু, তবু যেন আমার তৃপ্তি হইল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তখন আমার তোমার সহিত সাক্ষাতের কথা মনে পড়িল। ক্লান্ত শরীরে ধীরে ধীরে আমি গৃহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যখন সেথায় পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি দশটা। এদিকে রাত্রি একটার সময় আমাদের মিলনের কথা। পূর্ব্বরাত্রিতে আমি এতটুকুও নিদ্রা যাই নাই, সুতরাং অল্পক্ষণ পরেই আমি একটী স্তম্ভে হেলান দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

'গৃহের ঘড়ীতে যখন ঢং করিয়া একটা বাজিল, তখন যেন সেই শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছ। চতুর্দ্দিকে চাহিলাম—শূন্য! ঘড়ীতে সাড়ে বাজিল। কিন্তু তবুও তুমি আসিলে না। তখন আমার নিশ্চিন্ত ধারণা হইল, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়াছ।

"আমি নিরাশা-সাগরে ভাসিলাম। প্রাতঃকালে ধীরে ধীরে আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাকে দেখিয়া আমার নূতন সঙ্গিগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহারা আমাকে না দেখিয়া মনে করিয়াছিল, আমার মৃত্যু হইয়াছে, তাই তাহারা আমার আগমনে অত্যধিক আনন্দিত হইল। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহারা বিপক্ষপক্ষীয় বন্দীদিগের যে হত্যা হইতেছে, তাহাও আমাকে জ্ঞাত করাইল।

'অকস্মাৎ আমার মনে হইল যে, তুমি হয় ত বন্দীদের মধ্যে রহিয়াছ। আমি বধ্যভূমিতে উপনীত হইলাম। তখন হত্যা আরম্ভ হইয়াছিল। সে স্থান আক্রম। আমি প্রথমে তোমাকে চিনিয়া উঠিতে পারি নাই। একে ধূম, তাহাতে তোমাদের সকলের চক্ষু বাঁধা। তাহার পর যখন চিনিতে পারিলাম, তখন দেখিলাম যে, দুইজনের পরেই তোমার পালা। আমি যাইয়া তোমাকে জড়াইয়া ধরিলাম, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম, 'সেনাপতি! ইহাকে হত্যা করিবেন না। ইহাকে রক্ষা করুন।' সেনাপতি উত্তর করিলেন, 'কেন? এ কি বাদ্যকর?'

"আমার তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। এরূপ প্রশ্নের কি উত্তর করিতে হইবে, তাহাও আমার বুঝিবার শক্তি ছিল না। কিন্তু আমি বলিয়া উঠিলাম, 'হাঁ, সেনাপতি, এ বাদ্যকর—খুব বড় বাদ্যকর।' তখন তুমি জ্ঞানশূন্য। সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কি বাজাইতে পারে? আমাদের একজন বংশীবাদকের অভাব ছিল। দেখি অভাব পূরণ হইয়াছে কি না!' এই বলিয়া তিনি বাদকদলের

কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরের পাঁচ সেকেণ্ড যেন আমার পাঁচ যুগ বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে, সেই পাঁচ সেকেণ্ড অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। 'হাঁ আমাদের একজন বংশীবাদকের অভাব আছে বটে। ইহাকে স্থানান্তরিত কর। অপর সকলের হত্যা চলুক।

'তাই আমি তোমাকে এস্থানে আনিয়াছি।"

আমি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া একবার হাসিতে লাগিলাম—একবার কাঁদিতে লাগিলাম। তাহাকে বলিলাম, "এ যাত্রা ত বাঁচিলাম।" সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বাঁশী বাজাইতে জান?" আমি উত্তর করিলাম, "জন্মে বাঁশী স্পর্শও করি নাই।" "তবে উপায়? যদি তুমি এক পক্ষের মধ্যে বাদ্যকরের দলে যোগদান করিয়া বাঁশী বাজাইতে না পার, তবে তোমার ও আমার উভয়ের প্রাণ যাইবে। ঠিক দুই সপ্তাহ। ইহারই মধ্যে।"

"দুই সপ্তাহ! নতুবা তোমাকেও ইহারা হত্যা করিবে? না। তাহা কখনই হইতে দিব না। দুই সপ্তাহের মধ্যেই আমি বাঁশী বাজাইতে শিখিব।"

তাহার পর ঠিক দুই সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আমার আহার ছিল না—নিদ্রা ছিল না—সময় ছিল না—অসময় ছিল না—রাত্রি ছিল না—দিন ছিল না। আমরা শিবিরের বহির্দ্দেশে যাইতাম এবং আমি অষ্টপ্রহর বাঁশী বাজাইতাম, নিকটবর্ত্তী সহর হইতে একজন আসিয়া আমাকে সুরতাল শিক্ষা দিতেন।

কি মত্ততা আমাকে অধিকার করিয়াছিল! আমার এক ধ্যান ছিল, এক জ্ঞান ছিল—আর কিছুই ছিল না কেবল বাঁশী—বাঁশী—বাঁশী। আমার মনে হইত যে, আমি যদি অন্ধ হইতাম, তাহা হইলে এরূপ উদ্যমে দৃষ্টিশক্তি লাভ করিতাম। আমি যদি পঙ্গু হইতাম, তবে এরূপ চেষ্টায় আমি হাঁটিবার শক্তি লাভ করিতাম। ইচ্ছা থাকিলে যে সব হয়, আমি তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিলাম।

দুই সপ্তাহ পরে আমি সমগ্র সেনাদলের সম্মুখে বাঁশী বাজাইলাম। আমাদের মুক্তি হইল। কিন্তু দুইবৎসর আমি আর কিছু জানিতাম না কেবল সা—ঋ—গ মা—পা—কেবল বাঁশী—কেবল বাঁশী, রাতদিন বাঁশী মুখে করিয়া থাকিতাম। আর সে কি বাঁশী বাজাইতাম। সুপ্রসিদ্ধ বংশীবাদকগণ দূর দেশদেশান্তর হইতে আমার বাঁশী শুনিতে আসিতেন! বাঁশী শুধু বাজিত না—বাঁশী কাঁদিত, কাঁদাইত, হাসিত হাসাইত; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাইত।

এই রকম করিয়া আমার দুইবৎসর অতিবাহিত হইল। সে কদাচ আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিত না। দিবারাত্রি বাঁশীর ন্যায় সেও আমার সঙ্গের সাথী অন্ধের যষ্টির ন্যায় ছিল। তাহার পর হঠাৎ সে একদিন ফাঁকি দিয়া আমাকে সে

মৃত্যুর দেশ হইতে সে আনিয়াছিল—সেই স্থানে, আমাকে শুধু আমার বাঁশীর কাছে রাখিয়া, চলিয়া গেল। আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিল, আর আমি বাঁশী বাজাইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলাম না—যাহার জন্ত বাঁশী বাজিয়াছিল, তাহার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঁশীও বেসুরা বাজিতে লাগিল।

দাদা দিদিরা, তাই আর আমি বাঁশী বাজাই না। তাই তোমাদের এ কথাটি বলিতে পারিতেছি না। বাঁশীর বেসুরা হইয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর! আমি বাঁশী বাজাইতে জানি না।

শ্রী—

দাশরথী রায়।

পাঁচালীদলের সূত্রপাত।

দাশরথী কবির দল ত্যাগ করিলেন বা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। একটা কথা—আকা দাশু গঙ্গাস্নান করিয়া সঞ্চিত পাপরাশি পূত সলিলে ঢালিয়া দিয়া, পবিত্র মনে কোন্ স্থানে কি কি কথাবার্ত্তা কহিয়া চিরতরে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কেহই দেখেন নাই, সুতরাং তাহার উল্লেখ হইতে পারে না। তবে ইহা বলা যায়, আকা নীচ বংশোদ্ভবা চরিত্রহীনা হইলেও তাহার হৃদয় হীন ছিল না। গঙ্গাস্নানের পর উভয়ে স্বগৃহে গমন করিয়াছিলেন। লোকলজ্জারূপ বিজয়া দশমীর অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মের অধীন হইয়াই যেন, স্ব স্ব হৃদয় চণ্ডীমণ্ডপে অনুরাগ-রাগে রঞ্জিত সাধ আহ্লাদরূপ ডাকসাজে সজ্জিত, বাসনা-প্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়া উভয়ে গৃহে গমন করিলেন। এখন নৈরাশ্য, দাশরথিকে উদ্যমহীন করিয়া ফেলিল। দুই চারি মাস তিনি মৌন হইয়াই রহিলেন, তবে তাঁহার কবির গান ও ছড়া রচনার বিশেষ পরিচয় ও যশ দেশ-মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং যদিও তিনি কবির গাওনায় ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু দূর-দূরান্তর হইতে কবিদারগণ আসিয়া তাঁহার কাছে কবির গান ও ছড়া রচনা করাইয়া লইয়া যাইত। এই সময়ের একটি ছড়া নিম্নে প্রদত্ত হইল। রসভাবে সুচতুর দাশরথির এই সময়ে মনের ভাব কেমন হইয়াছিল, ভাবগ্রাহী পাঠক তাহা অবশ্যই বুঝিতেছেন। দাশরথি রায় মহাশয় তাৎকালিক তাঁহার মনোবৃত্তিসুলভ, শান্তি-ভক্তি-রসাত্মক অন্তিম প্রার্থনা নাম্নী একটী ছড়া রচনা করিয়া কোন কবিদারকে দিয়াছিলেন। সে ছড়া এই—

"প্রণমামি রাধাকান্ত, দিন তো গেল একান্ত,
শেষের দিন প্রায় হইল আগত।
আমার কবে এ দিন হবে, গুণিতেছি দিন ভেবে ভেবে,
গুণ্‌তির দিন আর গুণিব বা কত॥
বার তিথি মাস সব, বৎসর মধ্যে সব উৎসব,
কিছুই যাবে না সব রবে।

এই ধন ধান্য বাটী, অট্টালিকা পরিপাটী,
স্ত্রীপুত্র আদি পরিবার সবে ॥
এসব আপন জন, আর—যা করিলাম উপার্জ্জন,
কোন প্রয়োজনে বা লাগিল ।
নিলে সব প্রিয়জনে, কিন্তু নিজ প্রয়োজনে,
কিছুই না প্রয়োজন হলো ॥
আজ কিম্বা দুদিন পরে, বাঁটিয়ে নেবে পরস্পরে,
তার পরে মোর নাম কি কেউ আর লবে !
নাম ডুবিবে দিন দিন, বৎসরান্তে মৃত্যুর দিন,
যদি হয় এক দিন নাম হবে ॥
কত আশা কত মায়া, কষ্টে কৃষ্ণ করি কায়া,
কালী কৃষ্ণ ভুলে এই বৈভব ।
অন্তিমের এই শেষ দিনে, এই বৈভব হেরি নয়নে,
স্বপনের সমান হ'ল সব ॥
এই ঘর এই বাড়ী, সরোবর পূর্ণ বারি,
সবারি মমতা হয় যাতে ।
প্রিয় বন্ধু যত আপন, তারা কি করিয়ে পণ,
রাখ্‌তে পারে শমনের হাত হতে ॥
কেহ নয় কাহারও ভাই, নিদানের দিন পর সবাই,
কেবল, পরাৎপর সেই হরি হল না পর ।
আসছে ঐ শমন ভক্ষিতে, কে পারে এ দিনে রক্ষিতে,
বিনে লক্ষীকান্ত দামোদর ॥
ঐ যমদূতের করে পাশ, এল বুঝি আমার পাশ,
এ পাশ ও পাশ করা মাত্র বিলম্ব ।
এ দিনে কে রাখতে পারে, পারে কি রাম সিং পাঁড়ে,
ঘাড়ে লাঠী যার অবলম্ব ॥
ভূস্বামী যিনি জমিদার, দ্বারবান্ জমাদার,
খবরদার সদাই শাসন যার ।
কিন্তু ভাই এই অন্তিম কালে, ঐ যে নিতে আসছে কালে,
সকালে বিকালে ভেদ নাই যার ॥"—

ইত্যাদি আরও অনেক রহিয়া গেল।

এই সময় বা ইহার পূর্ব্ব হইতে সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী নামা একব্যক্তি—বর্ণের ব্রাহ্মণ সুমধুর গায়ক এবং প্রসিদ্ধ বাদক পাঁচালীর গাওনা করিতেন। এদেশে পাঁচালী গানের সূত্রপাত কখন হয়, তাহার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় না। কোন একটী পৌরাণিক বা সামাজিক বিষয় অবলম্বন করিয়া ছড়া বা ও মাঝে মাঝে গীত রচনা করিয়া গাওনা করা হয়—ইহার নাম পাঁচালী, এ রীতি অনেকদিন হইতেই আছে। "ছড়া" বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ছন্দ বা যতি প্রভৃতির বশবর্ত্তী না হইয়া এবং বর্ণ-বিন্যাসের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল ভাব মাধুর্য্য বিষয়ে মুন্সীয়ানা করিয়া পয়ার, ত্রিপদী, চৌপদী আকারে মিত্রাক্ষরী কবিতা রচনা। প্রাচীন কবিতা সকল প্রায় এই আকারেই রচিত হইয়াছে।—

"কি জানি তপের ফলে হর, পায়্যাছি বর,
পাট-পড়সী নাহি আইসে দেখি দিগম্বর॥"

(মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—কবিকঙ্কণ গৌরীর খেদ) কবির পুস্তকে শিবের গৃহত্যাগ—

"আমি ছাড়িব ঘর, যাব দেশান্তর,
দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধার অন্ন নাহি মিলে"—

ইত্যাদি স্থলে—বর্ণবিন্যাস ঠিক হয় নাই, বৃদ্ধি হইয়াছে। এ প্রকার বৃদ্ধি বা ক্বচিৎ হ্রাস কীর্ত্তিবাসী-রামায়ণে ও কাশীদাসী মহাভারতেও আছে, ফলতঃ কবিকঙ্কণ মহাশয় তাঁহার সকল রচনাকে পাঁচালী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"পাঁচালী প্রবন্ধ গাইল মুকুন্দ, অম্বিকা মঙ্গল গাথা"

"রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিলা বন্ধ চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে" (কবিকঙ্কণ)

অতএব এই সব কবিতাকে পাঁচালী বলা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা ঐ সব ছড়া বা কবিতাকে "গীতি কবিতা" বলিয়া সাধুভাষায় নাম দিতেছি বা দিয়াছি। পাঁচালী কাহাকে বলে, তাহার বিচার আরো কেহ করিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। কবির দলেও পাঁচালী ছড়া বলা পদ্ধতি আছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

প্রাগুক্ত সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী মহাশয় সামান্যাকারে একটি পাঁচালীর দল করেন। তিনি নিজেই তাহার ছড়া ও গানগুলি রচনা করিয়া লইয়াছিলেন। প্রতীত হইতেছে যে, সন্ন্যাসী গায়ক, বাদক এবং রচয়িতাও ছিলেন। সন্ন্যাসীর পাঁচালী মুদ্রিতও হইয়াছিল, তবে এক্ষণে আর তাহা দেখা যায় না। ৺রসিকচন্দ্রের পাঁচালীও এতদ্দৃষ্টে রচিত হইয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ইহার মূল। অবশ্য রসিকরায়ের পাঁচালী, সন্ন্যাসীর পাঁচালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল; সুতরাং

সন্ন্যাসীর কার্য্যক্ষেত্র সংকীর্ণ হইল, রসিকের পাঁচালীর দল পেশাদারী অবলম্বন করিল,— সন্ন্যাসীর মনোদুঃখের সীমা রহিল না।

কিছু দিন পরে দাশরথির রচিত ইতিপূর্ব্বোক্ত অন্তিম-প্রার্থনার ছড়াটি স্থানে স্থানে প্রচারিত হওয়ায় সন্ন্যাসীর চিত্ত ঐ ছড়াতে আকৃষ্ট হয়, এজন্য তিনি ঐ ছড়াটি সংগ্রহ করিয়া মুগ্ধ ও কৃতার্থ হইলেন এবং অবিলম্বে দাশরথির তদানীন্তন বাসভবন বান্ধমুড়া গ্রামে উপস্থিত হইলেন। দাশরথি ঈদৃশ ভাবুক এবং ছড়া-পাঁচালীর অনুরাগী সন্ন্যাসীকে পাইয়া অতি মাত্র আহ্লাদিত হইলেন। এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁর হৃদয়স্থ নৈরাশ্য যেন অতর্কিতে অন্তর্হিত হইল। দাশুর হৃদয় মরুতে, সন্ন্যাসীর শীতলোৎসাহ বারি-ধারা যেন, সকল উত্তাপ সন্তাপ বিনাশ করিল। সন্ন্যাসী দাশুকে পাঁচালী রচনায় প্ররোচিত করিলেন—দাশু হৃষ্টচিত্তে সোৎসাহে রচনা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

ভালবাসি সন্ন্যাসীরে, তাই প্রণাম করি নত শিরে,
সন্ন্যাসীর শিরোমণি যিনি।
আদর করে স্ব শিরে, স্থান দিয়েছেন শশীরে
প্রণাম গ্রহণ করিবেন কি তিনি ?"

এই কবিতা তদ্দণ্ডেই রচিত ও পঠিত হইয়াছিল ; পাঠ করিয়া বিনয় সহকারে দাশরথি বলেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! আমার মনে হইতেছে, সন্ন্যাসীশ্বর সাক্ষাৎ মহাদেব আপনি,—আজ আমি মহাদেবের আদেশ উপদেশ পাইলাম ; আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" এই বলিয়া দাশরথি সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণে উদ্যত হইলেন, কিন্তু চক্রবর্ত্তী তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণের দাস। কদাচ এমন কার্য্য করিবেন না।" সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী নীচবর্ণের· ব্রাহ্মণ দাশরথি তাহা ক্রমে বুঝিলেন। সন্ন্যাসী সামান্য মত ছড়া গীতাদি রচনা করিয়া পাঁচালী গাহিতেন, সে সব দাশরথিকে দেখাইলেন এবং রসিকচন্দ্রের রচিত পাঁচালী তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, সে দুঃখও বেশ করিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তিনি স্বরচিত পাঁচালীর গীতগুলি গাইলেন। সে সব দাশুরায় ও তিনুরায় উভয় ভ্রাতায় মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া বড়ই উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেন। সন্ন্যাসী বাজথাই সুরে গান করিতেন। উদারাগ্রাম বা মূলাধার হইতে বায়ু আশ্রয় করিয়া ঝিঁ ঝিঁ পোকার ন্যায় তীব্র স্বরের নাম "বাজথাঁই আওয়াজ। এই সুরে গান করা বড় কষ্টকর, তবে এই সুর তাম্বুর-যন্ত্রের সঙ্গে সহজেই পরিপাটী মিল হইয়া সুমধুর হয়। সন্ন্যাসী স্বরচিত আগমনীর পালাটী সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহা দাশুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "তুমি ইহাকে রসিক হইতে রসিকতম করিয়া দাও।"

দাশরথী তাহাতেই মনোনিবেশ করিলেন এবং বড়ই কৌতুকাবিষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসীর কেমন ছিল,দাশরথি তাহার কি বা কেমন পরিবর্ত্তন করিলেন, তদ্দৃষ্টান্ত অতি বাহুল্য হইয়া পড়িবে, এ জন্য ক্ষান্ত থাকিলাম। এই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী আমার অপেক্ষা বয়োধিক ব্যক্তি এখানে এখনও জীবিত রহিয়াছেন— বান্ধমুড়া গ্রামেই রহিয়াছেন। আমি সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তীর মুখে তাঁহার রচিত--

"বল দেখি মা, কেমনে মা, উমাধনে বেঁধেছ গো
পাষাণি, পাষাণ রাণী বুঝি পাষাণে বুক বেঁধেছ গো।"

—এই গানটী প্রাগুপ্ত বাজখাঁই সুরে শুনিয়াছি। ফলতঃ সন্ন্যাসীর সঙ্গে দাশরথির বেশ মনের এবং গান বাজনার মিল হইয়া গেল। আগমনীর পালাটী দাশুর মনের মত হইল—তাহা এবং দাশরথির প্রথম পাঁচালীর পালা—প্রভাস-যজ্ঞ বা কুরুক্ষেত্র-মিলন রচিত হইল এবং কাটোয়ার অন্তর্গত কালিকাপুরনিবাসী ৺দীননাথ মদক, পোঁবাগ্রামনিবাসী ৺দশরথ ঘোষ গোপ, স্বয়ং তিনকড়ি রায় প্রভৃতি সুকণ্ঠ কয়জন গায়ক লইয়া পাঁচালীর একটি দল গঠিত হইল। ঐ দশরথ গোয়ালাকে দাশরথি আমোদ করিয়া "বাবা" বলিতেন, এ কথাও প্রচার আছে। এ সময় যে, প্রভাস-যজ্ঞ বামন-ভিক্ষা, কলঙ্ক-ভঞ্জন প্রভৃতি পালা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে রাগিণী সিন্ধুখাম্বাজ, তাল জৎ এই তান লয়ের গানই অত্যধিক থাকায়,—প্রথম প্রথম দাশুরায়ের নাম হইয়াছিল "জাতা দাশুরায়" অর্থাৎ জৎ নামক তালেরই বেশী ব্যবহার। পরে এই সকল ও আর আর পালা রচনা ও সংস্কারকালে বিবিধপ্রকার সুরের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ছড়া কবিতা বা পাঁচালী রচনা অনেকেই করিয়াছেন ও করিতেছেন, কিন্তু মহানুভব ক্ষণজন্মা দাশরথির মতন সুরের সৃষ্টি বোধ হয়, কেহ পারেনও নাই, পারিবেনও না। দাশরথি নিজে সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না—অল্প মাত্র গাইতে পারিতেন . কিন্তু দাশরথির পাঁচালীতে যে সব সুর ব্যবহৃত হইয়াছে, তত্তাবৎ অতি মধুর এবং অন্তস্থলস্পর্শী,—কারুণ্যাদি যথোপযুক্ত রসোদ্দীপক। যিনি বঙ্গসঙ্গীত বুঝেন, তিনি অবশ্যই বুঝিবেন যে, ঐ সব সুরের তুলনা নাই। অবশ্যই অধিকাংশ সুরই বঙ্গ সঙ্গীতের আদি-খনি কীর্ত্তন হইতে গঠিত। কিন্তু দাশরথির কোন কোন গীতে সপ্রমাণ হয় যে, দলস্থ কেহ না কেহ আর্য্য-সঙ্গীতেরও অধিকারী ছিলেন। এ সকল তত্ত্বের যাথার্থ্য নিরূপণ যথাসময়ে অবশ্যই করা হইবে। বঙ্গসাহিত্যিকগণ দাশরথির রচনার আলোচনা করেন বা এক্ষণে করিতেছেন—কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, দাশুরায়ের সুরের কথা বড় কেহ বলেন না। বঙ্গদেশে কি বঙ্গসঙ্গীতপ্রাণ কেহ আর নাই। ৺নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, ৺মতিলাল রায়

বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া গিয়াছেন,—আর কি কেহই দাশুরায়ের সুরের মাধুর্য্য বুঝেন না? দাশুরায়ের পাঁচালীতে কতকগুলি সুরের সৃষ্টি হইয়া বঙ্গসঙ্গীত-ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি রক্ষিত হইয়া গিয়াছে। এ রত্নসকল হইতে যে কত রত্ন উৎপন্ন হইবে, তাহা কালে কেহ না কেহ অবশ্যই বুঝিবেন।

শ্রীরমানাথ মুখোপাধ্যায়।



নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, অলোকা-প্রেসে—শ্রীশশীভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।